প্রথম কল্লোল সংস্করণ
আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী শোভা রায়
কল্লোল প্রকাশনী,
এ ১৩৪, কলেজ ষ্ট্রীট মারকেট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীরমেন রায়
প্রিণ্টস্মিথ,
১১৬, বিবেকানন্দ রোড,
লিকাতা-৬

ভূমিকা

শ্রীমান্ ক্ষীরোদ কুমার দত্ত এম. এ. "শরৎ-সাহিত্যে নারী" লিখিয়াছেন এবং তাহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি আনন্দের সহিত তাঁহার অনুরোধ পালন করিতে স্বীকৃত হইয়াছি এইজন্য যে, ক্ষীরোদ কুমার শুধু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র তাহাই নহে, তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সেবক। তাঁহার বহু প্রবন্ধে নিবন্ধে তিনি তাঁহার চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের একজন প্রকৃত সমঝদার পাঠক তিনি। এইজন্য আমার বিশ্বাস যে এরূপ একজন নিষ্ঠাবান মেধাবী ও সহানুভূতিসম্পন্ন লেখকের হস্তে শরৎচন্দ্রের কলানৈপুণ্য ক্ষুণ্ণ হইবে না। তিনি এই গ্রন্থে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন সে বিচার আমি করিব না। সে বিচারের ভার পাঠকদিগের হস্তে। আমি কেবল পরিচয় হিসাবে দুই চারিটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই।

সাহিত্যসৃষ্টি যে মানুষের পরিবর্তনশীল মানসলোকের উপর নির্ভর করে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মানব-মনের এই ব্যাপক পরিবর্তন কখনও ধীর মন্থর গতিতে, কখনও দ্রুত উন্মত্ত গতিতে ঘটে। যখন সমাজ-মনের গতি ধীরে ধীরে কোনও এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিণতি লাভ করে, তখন মানবসমাজের অবচেতনা তাহাকে কোনও রূপে মানাইয়া লয়; আর যখন এই পরিবর্তন দ্রুত সংঘটিত হয়, তখন সমাজ তাহাকে 'বিপ্লব' আখ্যা দিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। সমাজে রক্ষণশীলতা একটি স্বাভাবিক আত্মরক্ষার উপায়। যে সমাজে রক্ষণশীলতা যত বেশী সে সমাজে বিপ্লবী সংস্কার তত বেগলাভ করে। ইহাই নিয়ম।

সাহিত্যে এই নিয়ম সর্বত্র প্রতিফলিত দেখা যায়। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে যখন রোহিণী কুন্দনন্দিনীর আবির্ভাব হইল, তখন বঙ্গদেশের সমাজজীবন অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে, মহাশ্বেতার যুগ বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, হীরামালিনীর নির্লজ্জ চাতুরীও অচল হইয়া পড়িয়াছে। তারপরে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালির' 'বিনোদিনী' আমাদের বুঝাইয়া দিল যে 'ভ্রমর'ও এখন অচল হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ, যে ভ্রমর-চরিত্রের সমালোচনায় রক্ষণশীল সমাজ

একদিন শতমুখ হইয়া উঠিয়াছিল, আধুনিক তরুণ সমালোচকের দল দেখিলেন, সে-ভ্রমরের যুগ বহুদিন অতীত হইয়াছে, এখন সে চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে সত্যের স্পন্দন আর তেমন অনুভূত হয় না।

শরৎ-সাহিত্যে নারী-চরিত্র সৃষ্টি যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বর্তমান জগতের আবহাওয়ায় যে নারী-চরিত্র আমাদের চতুষ্পার্শ্বে আবির্ভূত হইতেছে, তাহারই প্রতিচ্ছবি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে বলিয়াই তাঁহার কাব্যপ্রতিভা বাঙ্গালীর মনকে এমনভাবে মুগ্ধ করিতে পারিয়াছে। সত্যের আলোক সহিতে না পারিলে চলিবে কেন? কল্পনার শিল্পোদ্যান (Hot-house) হইতে তিনি তাহার পুষ্পসম্ভার সংগ্রহ করেন নাই। বাঙ্গালীর ঘরের পাশে কেতকী বেতসের কুঞ্জে যে সকল চারুচিত্র ফুল নিত্য ফুটিয়া থাকে, তাহারই দুই-চারিটি তিনি আমাদের জন্য সযত্নে আহরণ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, রমা, পার্বতী, কিরণময়ী, অচলা প্রভৃতি সেই শ্রেণীর চরিত্র, যাহারা বর্তমান সমাজের আবহাওয়ায় প্রাণের স্পর্শলাভ করিয়া সত্য হইয়া উঠিয়াছে, এই সকল চরিত্রসৃষ্টির মূলে যে সত্যকার অনুভূতি বেদনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই ইহাদের জীবনকে পরম রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমান সমাজের জটিল সমস্যাগুলি কিরূপে এই নারী চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া দেখা দিয়াছে তাহাই ক্ষীরোদ কুমার নিপুণভাবে একান্ত সহানুভূতির সহিত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

যাঁহারা সমাজের রক্ষণশীল দলের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা এখনও সংখ্যায় বিরল নহেন। তাঁহাদের মতে বাস্তবের নগ্ন সত্যতা সর্বতোভাবে বর্জনীয়। তাহারা বরং কৃত্রিম আদর্শবাদকে সহ্য করিতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু সে আদর্শ-চ্যুত যে চরিত্র সৃষ্টি, তাহাকে প্রশ্রয় দিতে কোনমতেই তাঁহারা ইচ্ছা করেন না। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, শরৎচন্দ্র নারীচরিত্রের যে চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার মধ্যেও যথেষ্ট আদর্শবাদ রহিয়াছে। নারীর স্বভাবকোমল হৃদয়, আজন্মপালিত সংস্কারের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও চিরসহিষ্ণুতা, আত্মবলিদান প্রভৃতি বিষয়ে শরৎ-চন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টি এক নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শ্রীমান্ ক্ষীরোদকুমার মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া সেই আদর্শবাদ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। আমার মনে হয়, কৌতূহলী পাঠক এই বিশ্লেষণ অনুসরণ করিয়া অনেক সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সন্ধান লাভ করিতে পারিবেন।

যাঁহারা শরৎচন্দ্রের আদর্শবাদ সম্বন্ধে আমার উক্তি মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করিবেন, তাঁহাদিগকে আমি বর্তমান উপন্যাস সাহিত্য অনুশীলন করিতে অনুরোধ করি। বিলাতের উপন্যাস সাহিত্যে যে চরিত্রের ব্যাখ্যান আছে, তাহাতে অনেক স্থলে বাস্তবতার নগ্নরূপ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। বিলাতের সমাজ আমাদের সমাজ অপেক্ষা আরও জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেখানে পুরাতন আদর্শ জীর্ণ ছত্রের মত কিরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা আনাতোল ফ্রান্সের বা প্লাকভের উপন্যাস পড়িলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এমন কি, আমাদের দেশেও বর্তমানে যে উপন্যাসের আবির্ভাব হইতেছে তাহাতেও বাস্তবের নগ্নতা ক্রমশই আদর্শকে আচ্ছন্ন করিতেছে। এই সকল দেখিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রের মহিমা কোথায়। তিনি সুন্দরের উপাসনার জন্য ফুলই কুড়াইয়া ছিলেন, কাঁটা তুলেন নাই।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

আমার কথা

অনতিক্রান্ত কৈশোর থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘকাল কাটাতে হয়েছে বন্দী-শিবিরে। এর মধ্যে বেশীর ভাগই কেটেছে সুদূর রাজপুতনায় নির্বাসনে। মরুভূমির দুঃসহ উত্তাপে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠতাম, মন চাইত বাংলা মায়ের শ্যামল স্নিগ্ধ ছায়া, চাইত তার স্নেহকোমল স্পর্শ। কিন্তু সীমাবদ্ধ দৃষ্টি সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত সুসজ্জিত প্রাচীরের ওপারে যেতে পারত না, আঘাত খেয়ে ফিরে আসত সেখান থেকেই। বাংলার মাঠ, বাংলার ঘাট, বাংলার পথ, বাংলার জল, বাংলার শিশু, বাংলার মা—মন আমার স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তুলত এদের ছবি, কল্পনার তুলি দিয়ে রূপ দিত এদের সবাইকে। বারবার ব্যর্থ হ'ত এ চেষ্টা আমার, চিত্তের সমস্ত দৃঢ়তা সত্ত্বেও ডুবে যেত মন গভীর বিষাদের মধ্যে। তবুও মনের ইচ্ছা আমার পূর্ণ হয়েছে, সেই মেবার পাহাড়ের পাশে বসেও বাংলার স্পর্শ আমি লাভ করেছি। কিন্তু এ কাজে আমি যার সাহায্য পেয়েছি, হাত ধরে যিনি আমাকে বাংলার ঘর হতে ঘরে, বন হতে বনে, পথ হতে পথে নিয়ে বেড়িয়েছেন তিনি শরৎচন্দ্র।

মরুভূমির নিদারুণ গ্রীষ্মে দ্বিপ্রহরে যখন ছটফট করতাম, মন তখন ছুটে আসত তালসোনাপুরে গোবিন্দ পণ্ডিতের পাঠশালায়। দেখতাম, সর্দার পোড়ো ভুলো এক কোণে হাত-পা ভাঙ্গা একখণ্ড বেঞ্চের উপর ছোটখাটো পণ্ডিত সেজে বসে আছে, আর পার্বতী নিরতিশয় ধৈর্যের সঙ্গে সুপ্ত পণ্ডিতের প্রতিকৃতি বোধোদয়ের শেষ পাতাটির উপর কালি দিয়ে আঁকছে। জমিদারের আম বাগানে দেখতাম, আঁচলে মুড়ি বেঁধে পার্বতী ঢুকছে সেখানে, বাঁশ ঝোপের মধ্যে দেবদাস যেখানে বসে আছে ছোট একটা হুঁকো হাতে। দেখতাম পূর্ববঙ্গের জমিদার ব্রজরাজবাবুর কলকাতার বাড়ীতে সুরেন্দ্রনাথকে, দেখতাম বড়দিদিরূপ কল্পবৃক্ষে তার জন্য ফলছে স্নেহের কম্পাস, ফলেছে স্নেহের চশমা। শীতলাতলার পাঠশালায় দেখতাম রমা ও রমেশকে, শুনতাম মাতৃহারা রমেশকে সান্ত্বনা দিচ্ছে রমা—"রমেশ দা, তুমি কেঁদো না, আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ করে নেব।" দেখতাম জ্যাঠাইমার কোলে মাথা রেখে রমা তাকে জিজ্ঞাসা করচে—"আচ্ছা জ্যাঠাইমা, মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে নিরপরাধকে দণ্ডভোগ করানোর শাস্তি কি?" দেখতাম হুগলী জেলার দিঘড়া গ্রামে বাঁধের পাড়ে

পূর্ণবাবুর বাগানে নরেন্দ্রনাথ বসে মাছ ধরছে বড়শি দিয়ে, ম্লান সূর্য পশ্চিমকাশে ঢলে পড়েছে, বাঁধের পার ধরে ধীরে ধীরে আসছে বিজয়া। তারপরে নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, পূর্ণবাবু সম্বন্ধে, ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা শেষ করে বিজয়া সেই পথেই ফিরে চলেছে, সঙ্গে হিন্দুস্থানী দারোয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করছে, "মাজী, এ বাবুটী কে?" দেখতাম নিতান্ত অকারণেই বিজয়ার চোখমুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। দেখতাম নরনারীর হৃদয়ের টানা পোড়েনের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত বিজয়া, সরল হৃদয় বালক পরেশ তার কোন খোঁজই রাখে না। মোড়ের দোকানে পাঁচগণ্ডা করে বাতাসা বিক্রি হয় পয়সায় কিন্তু সে ছ'গণ্ডা নিয়ে এসেছে মাজীকে অবাক করতে কিন্তু তবুও কেন সে পারে না তাকে সন্তুষ্ট করতে? ক্ষুণ্ণ মনে বালক ফিরে যাচ্ছে দেখতাম আমি—আরও কত কি দেখতাম এর সঙ্গে।

দেখতে দেখতে ভুলে যেতাম সব কিছু, ভুলে যেতাম বন্দীজীবনের কথা। মনে হ'ত স্নেহকোমল বাংলার বুকেরই স্পর্শ পাচ্ছি আমি, সেখানেই আমি ফিরছি। আর ধন্য হচ্ছি—বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার আকাশ—এদের ভালবেসে এবং ভালবাসা পেয়ে। তাই শরৎচন্দ্রকে সেদিন ভালবেসেছিলুম অমন করে।

তারপর বন্দীজীবনের মায়া তখনও কাটেনি, হঠাৎ একদিন শুনলাম শরৎচন্দ্র আর নাই। ব্যথা পেলাম শুনে, ইচ্ছা হল আমার ভালবাসার একটা অর্ঘ্য সাজিয়ে সেই তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে। এতদিন পরে আজ আমার এ চেষ্টা তারই ফল। জানি না কতটা সফল হয়েছি সেদিক দিয়ে। তবে অন্তরের শ্রদ্ধা ভালবাসা সর্বত্র মিলে আছে এর সঙ্গে, এ যেন কেউ ভুল না করেন।

কেহ কেহ বলছেন আজ—শরতের যুগ শেষ হয়েছে, শরৎ-সাহিত্য তার কাজ সমাপ্ত করেছে। তাদের কাছে শরৎ-সাহিত্য আজ মৃত। তাই মৃতকে নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করে এ থেকে পূতিগন্ধ বা'র করতে তারা নারাজ। কিন্তু মনে হয়, এ তাঁদের ভুল। সাহিত্য যদি সত্যিই সাহিত্য হয়, তবে মরে না সে কোন দিনই। সাহিত্য চিরকালের, চিরদিনের, চিরযুগের, সাহিত্য অমর। রবীন্দ্রনাথও সাহিত্য বলতে একেই বুঝেছেন। সুতরাং অন্যান্য সাহিত্যের মত শরৎ-সাহিত্যও কোনকালে মরবে না, মলিন হবে না কোন দিনই। দীর্ঘকালের বিপ্লব, ঝড়ঝঞ্ঝাকে ব্যর্থ করে অতীতের সাক্ষ্য হয়ে ভবিষ্যতের জন্যই বেঁচে থাকবে এ, তাই একে সাহিত্য বলছি আমরা। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে

সাহিত্য নূতন গতিভঙ্গি নেয়, কিন্তু তার ভিত্তি থাকে পুরাতনের উপরেই, পুরাতনকে ঝেড়ে ফেলে দিতে সে পারে না কখনই। তাই সাহিত্য পুরাতন হ'লেও ব্যর্থ হয় না কোন কালে। তাছাড়া, যতদিন আমরা ভাইবোন মা বাপ আত্মীয় স্বজন এদের স্নেহ পাব, শরৎ সাহিত্যের আদর কমবে না।

বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, শরৎ সাহিত্যে আসল বস্তু কম, passionএর ভাগ বড় বেশী। কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন তাঁরা শিল্পকলার যে কোন কাজের মূলেই passion। বিখ্যাত আইরিশ কবি W. B. Yeats বলেন—The subject of all art is passion, and a passion can only be contemplated when separate by itself, purified of all but itself, aroused into a perfect intensity of opposition with some other passion. সুতরাং বিচারে এ দিকেও বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি টিকবে না। তাছাড়া, এই গ্রন্থে আমি শরৎচন্দ্রকে বিচার করিনি, তাকে নিয়ে আলোচনা করেছি মাত্র।

"শরৎ সাহিত্যে নারী" সমাপ্ত হল। সাধারণভাবে শরৎচন্দ্রের সমস্ত নারীচরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করে বেছে বেছে কয়েকটি চরিত্রকেই স্থান দেওয়া হ'ল এতে। এই চয়নে বিশেষ কোন নিয়ম অবলম্বন করা হয়নি, যার কথা যখন মনে পড়েছে তাকেই নিয়ে লিখে ফেলেছি তখন। যদি কোন প্রধান চরিত্র বাদ পড়ে থাকে এবং কোন অপ্রধান চরিত্র স্থান পেয়ে থাকে তবে সে আমার ইচ্ছাকৃত নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র আমাকে চিরদিনই স্নেহ করে আসছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে তিনি আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন।

শ্রীক্ষীরোদ কুমার দত্ত

সাহিত্যিক তাঁহার রচিত সাহিত্যে নরনারীর চিত্র অঙ্কন করেন, পাঠক-পাঠিকার মুখ চাহিয়া। উপন্যাসের সকল নরনারীকেই ঔপন্যাসিকের হুকুম তামিল করিতে হয়। ইহাদের অস্তিত্ব এবং গতিবিধি সমস্তই উপন্যাসের ঘটনাস্রোতের উপর নির্ভর করে। ঘটনার বিকাশে চরিত্রের বিকাশ, আবার চরিত্রের বিকাশেই ঘটনার বিকাশ। সুতরাং শরৎ-সাহিত্যই হউক, বঙ্কিম-সাহিত্যই হউক অথবা রবীন্দ্র-সাহিত্যই হউক, কাহারও রচনায় নারীর বিশেষ একটা স্থানের কথা বলিলে এবং এ সম্পর্কে একটু বিবেচনা করিলে তাহার কোন অর্থ হয় না। যে সাহিত্যে আমরা সীতাকে দেখি, তাহার পাশেই দেখি মন্থরাকে, দেখি শূর্পনখাকে। যে কবি কৌশল্যা এবং সুমিত্রার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহারই হাতে আঁকা আমরা কৈকেয়ী ও মন্থরাকেও দেখিতে পাই। সাহিত্যে যেমন ডেসডেমনা আছে, তেমনি লেডী ম্যাকবেথও আছে; যেমন ভ্রমর আছে, তেমনি রোহিণীও আছে; যেখানে সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীর স্থান, তাহার পাশেই হীরার স্থান। এই দুই শ্রেণীর বিপরীতমুখী চিত্র আপন-আপন চলার পথে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তাহারই বিকাশে সাহিত্যের বিকাশ। সুতরাং সাহিত্যক্ষেত্রে এই দুই বিপরীত শ্রেণীর চিত্র অতীতে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে এবং ভবিষ্যতেও ইহাদের প্রয়োজন এইরূপই থাকিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্য সর্বত্র যে পক্ষপাতশূন্য তাহাও নয়। সাহিত্য আদর্শ নারী চরিত্র সৃষ্টি করিল সীতা কিন্তু তাহার উপর চাপাইয়া দিল এক জীবনব্যাপী দুর্বহ দুঃখভার। সমগ্র জীবনে একমাত্র অশ্রু ভিন্ন আর কোন সম্বলই সে খুঁজিয়া পাইল না। সমস্ত জানিয়া শুনিয়া পুরুষ অসহায় নারীত্বের স্কন্ধে-অপবাদের বোঝা চাপাইয়া দিয়া নিজে আদর্শ রাজা সাজিল এবং নারী বিনা

প্রতিবাদে সেই মিথ্যা অপবাদ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল। কারণ, পুরুষের রাজত্বে ইহাই তাহার গৌরব। পুরুষের সাহিত্য তাহাকে করিল আদর্শ নারী। ইহাই নারীর জন্য সাহিত্যেব বিচার। নারীর গুণ —সে সহনশীল। সকলই সে সহ্য করিতে পারে, তাই সকলই তাহাকে সহ্য করিতে হইবে।

অথবা ইহাই হয়ত নারীর প্রাপ্য। জগতে নূতন উষার নব উদ্বোধনের সঙ্গে নারীর হাত ধরিয়াই প্রবেশ করিয়াছিল অভিশাপ। নারীই প্রথম বহন করিয়া আনিল সর্বনাশ এই মর জগতে। তাই নারীর জন্য ব্যবস্থা সর্বত্রই যে একটু ভিন্ন হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? প্রাচ্য পাশ্চাত্য, একাল বা সেকাল কোথাও ইহার ব্যতিক্রম নাই।

বৌদ্ধ-সাহিত্যে নারী

বুদ্ধদেব জাতিভেদ মানিতেন না। সকলেই ছিলেন তাহার নিকট সমান। কিন্তু নারীর জন্য তাঁহার রাজ্যেও ভিন্ন ব্যবস্থা। বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত সাহিত্যে আমরা নারীর চিত্র দেখি—

স্বজনঃ স্বজনেন ভিদ্যতে
সুহৃদশ্চাপি সুহৃজ্জনেন যৎ।
পরদোষবিচক্ষণাঃ শঠা
স্তদনর্যাঃ প্রচরন্তি যোষিতঃ।

নারী পরদোষ দর্শনে তৎপর, নারী শঠ। নারীই স্বজন হইতে স্বজনকে দূরে রাখে, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর বিচ্ছেদ ঘটায়।

কেবল ইহাই নয়—

বচনেন হরন্তি বল্গুনা
নিশিতেন প্রহরন্তি চেতসা।
মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাং
হৃদি হলাহল মহদ্বিষম্।

নারী মধুর কথায় চিত্ত হরণ করে। নারীর মুখে মধু, হৃদয়ে বিষ।

সংস্কৃত যুগে নারী

সংস্কৃত যুগে নারীর আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। দুঃখের ভিতর দিয়াই ইহারা আমাদের হৃদয়ে আসন পাতিয়াছে। জীবনের অশ্রুর বান ডাকিয়াছে, ভাগ্য ইহাদের কপালে দুঃখের চরম চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে। তাহাই পরিয়া ইহারা সাহিত্যে এবং কাব্য আসরে আমাদের সম্মুখে আসিয়াছে। এই দুঃখসম্ভার বহন করিয়াই সাহিত্যে এবং কাব্যে ইঁহারা অমর। ইহারই ফলে সংস্কৃত সাহিত্যে নারী—গৃহিণী সচিবঃ সখি প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। কিন্তু সেদিনের সামাজিক জীবনে এই চিত্রের প্রতিফলন আমরা দেখিনা।

নারীর প্রথম সৃষ্টির ইতিহাস শুধু দেশবিশেষেই কালিমাবৃত নয়। গ্রীক পুরাণে আমরা দেখি, গ্রীক-ভগবান যেদিন সৃষ্টির প্রথম সূচনা করিলেন, কেবলমাত্র পুরুষের জগতই তিনি সৃষ্টি করিলেন। পুরুষের সঙ্গে নারী সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজনই তিনি অনুভব করিলেন না। আপন সৃষ্টির উপর ক্রুদ্ধ হইয়াই তিনি জগতের বুকে ডাকিয়া আনিলেন প্রথম অভিশাপ নারী, যাহার ফলে জগত হইতে একমাত্র আশা ভিন্ন স্বর্গের অন্য সমস্ত দানই অন্তর্হিত হইল।

ইংরাজী-সাহিত্যে নারী

নারী জাতি সম্বন্ধে সর্বত্রই আমরা দেখি, বিচার এই একই ধারায় প্রবাহিত। তবুও কবি বা ঔপন্যাসিক তাহাকে নিজ নিজ প্রয়োজনে মর্যাদাশীল নারী চিত্র যে অঙ্কন করেন নাই তাহা নয়।

আমরা দেখি—

The woman's cause is man's ; they rise and sink
Together, dwarfed or Godlike, bond or free ;
For she that out of lethe scales with man
The shining steps of Nature, shares with man
His nights, his days, moves with him towards goal,

Stays all the fair young planets in her hands
If she be small, slight-natured, miserable
How shall man grow ?

—Tennyson.

ইংরাজী-সাহিত্যে উপরের উদ্ধৃতি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, এখানে হয় ত নারীর প্রতি পক্ষপাতমূলক বিচার হয় নাই। কিন্তু "Frailty thy name is Woman" ইংরাজী সাহিত্যে এই উক্তি কে না জানে ? নারী জাতি সম্বন্ধে সকল সাহিত্যেরই ইহাই হয়ত সাধারণ কথা। শুধু ইহাই নয়, Shakespeare-এর কাব্যে আমরা নারীর চিত্রে আরও দেখি—

The man who hath a tongue, I say, is no man
If with his tongue he cannot win a woman !

—Two gentlemen of Verona.

If that the earth could team with woman's tears,
Each drop she falls would prove a crocodile.

—Othelo, Act IV

হিন্দী-সাহিত্যে নারী

হিন্দী সাহিত্যে তুলসীদাস রামনাম প্রচার করিয়া সমস্ত জগতকে পাপ-সমুদ্র পার করাইয়াছেন। কিন্তু তাহার তরণীতে তিনিও নারীর জন্য একটু সঙ্কীর্ণ স্থানও রাখেন নাই। হিন্দী কবির মতে—

ঢোল গঁওয়ার শূদ্র পশুনারী।
ইয়ে সব তাড়নকে অধিকারী।

কবি নারীস্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন—

নারী স্বভাব সত্য কবি কহহি।
অবগুন আট সদা উর রহহি॥
অজ্ঞান অনৃত চপলতা মায়া।
ভয় অবিবেক অশোচ অদায়া॥

বিধি হু ন নারী হৃদয় ভাতি জানি।
সকল কপট অঘ অবগুন খানি॥

আধুনিক বিশ্বসমাজে নারী কতকটা মর্যাদার আসন পাইয়াছে। আইনের দৃষ্টিতে, ন্যায়ের দৃষ্টিতে তাহার অধিকার পুরুষের সমান একথা সত্য। তবু আজও সে সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে নাই।

শরৎ—পূর্ব বাংলা সাহিত্যে নারী

বাংলা-সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়াও নারী তাহার স্বকীয় মর্যাদা পায় নাই। বঙ্কিম-সাহিত্যে আমরা দেখি, স্ত্রী ধর্মপথে স্বামীর বিঘ্ন, দেশসেবার পথে কণ্টক। আনন্দমঠে স্বপ্নাগতা দেবী কল্যাণীকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"ইহারই জন্য মহেন্দ্র আমার কোলে আইসে না।" পুস্তকের মুখবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র এই আভাসই আমাদের দিয়াছেন—"বাঙ্গালী স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়, অনেক অবস্থায় নয়।"

সত্য বটে, ঋষি বঙ্কিমের মুখেই আবার আমরা শুনি—

"রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী। রমণী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া। পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া।" —কৃষ্ণকান্তের উইল

কিন্তু ভবানন্দের সঙ্গে কল্যাণীর কথোপকথনও এই বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের শুনাইয়াছেন।

"কল্যাণী—আমি প্রাণত্যাগ না করিলে কি এত হইত? যার বুকে কাদাপোরা কলসী-বাঁধা, সে কি ভবসমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে? যার পায়ে লোহার শিকল, সে কি দৌড়ায়? কেন সন্ন্যাসি, তুমি এ ছার জীবন রাখিয়াছিলে?

ভবানন্দ—স্ত্রী সহধর্মিনী, ধর্মের সহায়।

কল্যাণী—ছোট ছোট ধর্মে, বড় বড় ধর্মে কণ্টক।

ঔপন্যাসিকের যুক্তি কার অনুকূলে তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয়না।

মীমাংসা করিলেন একজন নারীই এবং কথাগুলিও একজন নারীর মুখ হইতেই আমরা শুনি। কিন্তু যে ঔপন্যাসিক কথাগুলি তার মুখে দিয়াছেন তিনি একজন পুরুষ।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে তো নারী "অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা।" এই জন্যই রবীন্দ্র উপন্যাসের সুচরিতা, ললিতা, লাবণ্য, বিমলা প্রভৃতিকে আমরা কোন সমাজের আওতায়ই যেন খুঁজিয়া পাইনা। পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণ এবং অ-গুণ উভয়ই ইহাদের সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে। কিন্তু না পারিয়াছে ইহারা নিজেরা কোন সমাজ গড়িতে, না পারিয়াছে সমাজের বুকে আশ্রয় নিতে। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারী কতকটা কল্পনাকেই আশ্রয় করিয়া বাঁচিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আনন্দময়ী, বিমলা, সুচরিতা প্রভৃতি গতিশীল চরিত্র আমাদের আকর্ষণ করে সত্য কিন্তু কেটী, সিসি, লিসি প্রভৃতিকে মোড়কে মোড়া প্যাকেট করিয়াই রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করিয়াছেন।

শরৎ-সাহিত্যে নারী

সাহিত্যে নারী তাহার এই চিরন্তন ভাগ্যরেখাকে অতিক্রম করিয়াছে শরৎ-সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া। শরৎচন্দ্রই দেখাইয়াছেন, চিরাচরিত পথে নারীর বিচার না করিলেও সাহিত্যে নারী চরিত্র সৃষ্টি করা চলে। তাই আমরা দেখি, শরৎ-সাহিত্যে নারী দেবী নয়, আলোকবর্তিকা হস্তে সে মর্ত্যের সাধারণ মানুষকে স্বর্গের পথ দেখায় না। আবার, জগতটাকে টানিয়া লইয়া সে নরকের দ্বারেও পৌঁছাইয়া দেয় না।

তাই বলিয়া শরৎ-সাহিত্য সর্বত্র যে বাস্তব তাহাও নয়। কল্পনা যে এ সাহিত্যে নাই তাহা নয়। কিন্তু নারীচরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্র শুধুমাত্র কল্পনার উপরই নির্ভর করেন নাই। কল্পনার সাহায্যে তিনি বাস্তবকে আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছেন। নারীর যে চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে স্থানে স্থানে কল্পনার

অবকাশ আছে, ইহা আমাদের অস্বীকার করিবার উপায় নাই। (তবু শরৎ-সাহিত্যে সমস্ত রকম কল্পনার মধ্য হইতে সামাজিক নারীর চিরন্তন রূপটিকে চিনিয়া লইতে আমাদের কষ্ট হয় না। আমরা দেখি শরৎ-সাহিত্যে নারীর সুখদুঃখ আছে, আশা আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহার হৃদয়ে ব্যথাবেদনা আছে। শরৎ-সাহিত্যে নারীর হৃদয় আছে, সে হৃদয়ে অনুভূতি আছে এবং ঐ অনুভূতির তীব্রতা পুরুষের অপেক্ষা কম নয়)

(বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম গতিশীল শক্তিশালী নারী-চরিত্র অঙ্কন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা সুচরিতা, ললিতা, আনন্দময়ী এবং বিনোদিনীকে দেখি। তাহাদের প্রাণ আছে, গতি আছে, উপন্যাসের ঘটনা কতকটা তাহাদের কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে। আবার সকলেই ইহারা সর্বত্র পুরুষের ছায়া অনুসরণ করে না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুরুষের উপর সময় সময় প্রভুত্বও করে। আমরা দেখি, তাহাতে উপন্যাসের মর্যাদা লঙ্ঘিত হয় না,) নারীহৃদয় পাঠকের সহানুভূতি সমান ভাবেই আকর্ষণ করিতে পারে। কিন্তু তবুও ইহাদের কাহারও কর্মক্ষেত্রই ব্যাপক নহে, সমাজের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী নয়। রবীন্দ্র-নাথের উপন্যাস-সাহিত্যে নারীর একটা বিশিষ্ট স্থান আমরা খুঁজিয়া পাই না। (রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারীকে পুরুষ হইতে আলাদা করা যায় না। সেখানে সকল নারীই উপন্যাসের ছবি, ঘটনাসন্নিপাতের সঙ্গেসঙ্গে ইহারা এক একজন উপন্যাসের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং আপন কর্তব্য শেষে বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়। পাঠকের হৃদয়ে সে কোন রেখাপাত করে না তা নয়, কিন্তু তবুও রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারীর একটি বিশিষ্ট স্থান না থাকার জন্য সে-রেখা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।) কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে আমরা দেখি, নারীর জীবন কেবলমাত্র তাহার আপন সুখদুঃখ অথবা কতকগুলি ঘটনা সংঘাতের পরিচয় নয়। (শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, সমাজে নারীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। নারীর গৃহ সংসার, নারীর মাতৃত্ব, নারীর

গৃহিণীপনার ভিতর দিয়াই নারী তাহার এই স্থানটি অধিকার করিয়া আছে'। কিন্তু তবুও তাহার এই স্থান নির্বিরোধ নয়। অপরিসীম দুঃখ, অনন্ত বেদনা তাহার জন্য এখানে সঞ্চিত আছে।

শরৎচন্দ্র হিন্দুসমাজের নারীর চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, এই সমাজের সঙ্গে নারীহৃদয়ের কি বিরাট এবং বিপুল দ্বন্দ্ব চলিতেছে। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, নানা কারণে সমাজ যতই জীর্ণ এবং পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে, নারীহৃদয়ের বিরুদ্ধে তাহার শক্তি যেন ততই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। নারীহৃদয়কে পেষণ করিতেই যেন তাহার সর্বদা আনন্দ। এই সমাজশক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই ঘটিতেছে নারীর আত্মবিকাশ। শরৎচন্দ্র ইহাই দেখাইয়াছেন এবং ইহাই শরৎ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনীকে দেখিয়াছি, কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়াছি, রোহিণীকে দেখিয়াছি। ইহাদের জীবনও দ্বন্দ্ব বিহীন নয়। কিন্তু আমরা দেখি, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, রোহিণী এবং শৈবলিনীর দ্বন্দ্ব সমাজের সঙ্গে নয়। কতকগুলি ঘটনা সংঘাতের ফলেই জীবনে ইহাদের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইয়াছে। বিশেষ কোন ঘটনা না ঘটিলেই বঙ্কিম-সাহিত্যে হৃদয়ের এই দ্বন্দ্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিত। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে নারীহৃদয়ের এই দ্বন্দ্ব চিরন্তন; বিশেষ কোন ঘটনার উপর ইহা নির্ভর করে না।

সমাজের সঙ্গে নারী হৃদয়ের দ্বন্দ্ব

সমাজের সঙ্গে নারী হৃদয়ের এই দ্বন্দ্বের চরম বিকাশ হইয়াছে রাজলক্ষ্মী চরিত্রে। শৈশবে নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে এবং আপন খেয়াল বশে এক ছড়া বৈঁচির মালা রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে পরাইয়া দিয়াছিল। সেই মালার সঙ্গে আপন শুভ ইচ্ছা, হৃদয়ের মঙ্গল কামনা সে জড়াইয়া দিয়াছিল কিনা আমরা জানিনা কিন্তু নারী-হৃদয় যে তাহার মধ্যে ছিলনা—তা থাকিতে পারে না তাহা আমরা বুঝি। কিন্তু এই সঙ্গে আমরা ইহাও জানি যে, মালা

সেদিন নারী হৃদয়ের নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া শ্রীকান্তের নিকটে না পৌঁছিলেও রাজলক্ষ্মীর নারী হৃদয় এই মালাকেই অনুসরণ করিতে চাহিয়া ছিল। একদিন হঠাৎ পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল সমাজ। সমাজের জন্যই রাজলক্ষ্মীর বৈঁচিমালা সত্য হইতে পারিল না। রাজলক্ষ্মীর শ্রীকান্তরূপী আদুরে রাক্ষস সে-ই মালা নাকি সেদিন খাইয়াই ফেলিয়াছিল। ইহা আমরা শরৎচন্দ্রের মুখেই শুনি। কিন্তু তবুও বালকবালিকার এক ছড়া বৈঁচির মালাকে দুইজনে সমস্ত জীবন ধরিয়া ভুলিতে পারিল না। কিন্তু মাঝখানে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করিল সমাজ। শাসনদণ্ড হাতে সমাজ অতি পরিষ্কার ভাবেই জানাইয়া দিল, বিধান তাহার নিয়তির মতোই দুর্বার; বালক বালিকার হৃদয়মালা বদল করিতে পারে কিন্তু সে মালার উপর নারী হৃদয়ের কোন অধিকার নাই। সমাজ নরনারীর চরম দুঃখের পরীক্ষা কেন্দ্র, ইহা বালকবালিকার খেলাঘর নহে। শ্রীকান্তের মনে মালার স্মৃতিমাত্র রহিয়া গেল; রাজলক্ষ্মী নিজেও সেই স্মৃতি অবলম্বন করিয়া বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিয়া গেল। রাজলক্ষ্মীর নিরুদ্দেশ জীবনাকাশে পূর্ণচন্দ্ররূপে শ্রীকান্তের পুনরুদ্ধারের আর কোন সম্ভাবনাই রহিল না। কিন্তু তবু দেখা একদিন মিলিল। দীর্ঘ ভাঙাগড়া, আবর্তন বিবর্তনের পর শ্রীকান্ত একদিন জানিল, রাজলক্ষ্মী মরে নাই; রাজলক্ষ্মী বুঝিতে পারিল, এক ছড়া বৈঁচি মালা জগতের নিকট যত তুচ্ছ, যত অবহেলার বস্তুই হউক না কেন, তাহার নিজের দিক হইতে ইহার মূল্য একবিন্দু কমে নাই এবং কখনই কমিবে না।

তার পরে আমরা দেখি, রাজলক্ষ্মীর কঠোর তপস্যা, কত পূজা-পার্বণ—জগতের সম্মুখে সে-ই একছড়া বৈঁচিমালাকে কি করিয়া সত্য করিয়া তুলিবে তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। কিন্তু সমাজ নিষ্ঠুর এবং বধির। নারী হৃদয়ের সমস্ত আকুল আবেদনই তাহার নিকট নিষ্ফল হইল। বিন্দুমাত্র সহানুভূতির অশ্রু সমাজের চক্ষে আমরা দেখিতে পাই না। আমরা দেখি রাজলক্ষ্মীর নিকট শ্রীকান্তর মূল্য কতখানি।

দীর্ঘদিন 'বাইউলী' জীবন যাপনের পর আপন জন্মভূমিতে আপনার একান্ত পরিচিতের মধ্যে পদার্পণ করিবার চিন্তা সাধারণভাবে রাজলক্ষ্মী করিতে পারিত না। কিন্তু শ্রীকান্তের জন্য রাজলক্ষ্মীকে তাহাই করিতে হইয়াছিল। আপনার সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত লজ্জা, সমস্ত সম্ভ্রম তুচ্ছ পদদলিত করিয়া রাজলক্ষ্মী ব্যাধিগ্রস্ত শ্রীকান্তের নিকট ছুটিয়া গিয়াছিল। রাজলক্ষ্মীকে এই আত্মনিবেদনের প্রেরণা যোগাইয়া ছিল তাহার নারীহৃদয়। এই নারীহৃদয়ই তাহাকে নির্দেশ দিয়াছিল সমাজের নিকট সর্বস্ব সমর্পণ করিতে। আপনার মানসম্মান রাজলক্ষ্মী সেদিন শ্রীকান্তের কল্যাণের জন্যই সমাজের পায়ে বলি দিয়াছিল। কিন্তু তবুও সমাজের হৃদয় বিগলিত হইল না। রাজলক্ষ্মী ইহার পর সমস্ত জীবন ধরিয়া শ্রীকান্তের সঙ্গ পাইল সত্য, কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলিবার সুযোগ হইল না।

এক সময় শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"কি করলে তোমার বাকী জীবন সুখে কাটে, আমাকে বলতে পারো?" রাজলক্ষ্মী উত্তর করিয়াছিল—"সে আমি ভেবে দেখেছি, আমার সমস্ত টাকাকড়ি যদি কোন রকমে চলে যায়, কিছু না থাকে, একেবারে নিরাশ্রয় হই, তাহ'লেই।" শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, শুনিয়া শ্রীকান্ত অনেকক্ষণ নীরব হইয়াছিল, পরে বলিয়াছিল,—"লক্ষ্মী, তোমার জন্য আমি সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারি কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করি কি করে?" এই খানেই নারীহৃদয়ের সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব, এই খানেই নারী জীবনের সমস্ত আশাআকাঙ্ক্ষা, সমস্ত কামনা বাসনা, সমস্ত চাওয়া এবং পাওয়ার বিরুদ্ধে সমাজের কঠোর বিধান। সমাজের নিকট সম্ভ্রম আসিয়া নারীর সমস্ত সহজ গতিপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়।

সমাজের সহিত এই দ্বন্দ্ব দেখি রমার জীবনেও। শীতলাতলার পাঠশালায় বসিয়াই সে রমেশের সহিত শৈশবহৃদয় বিনিময় করিয়াছিল কিন্তু সমাজ তখন দূরে থাকিয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিল। রাণী যেদিন মাতৃবিয়োগশোকাচ্ছন্ন রমেশকে সান্ত্বনা

দিয়া বলিয়াছিল, "কেঁদোনা রমেশদা, আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ করে নেবো," ভবিষ্যত সেদিন সমাজের নিষ্ঠুর রোষদৃষ্টির দিকে তাকাইয়া বোধহয় বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছিল। তাই নারীহৃদয়ের নীরব আকুল আবেদন আমরা দেখি রমার প্রতি দীর্ঘনিশ্বাসে। আপন ব্যর্থ জীবনের জন্য রমা সমাজের এককোণে একটু সঙ্কীর্ণ স্থান চাহিয়াছিল। হৃদয়ের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত শুভকামনা, আপনার সমস্ত মঙ্গলকে সে সমাজের জন্যই দলন করিতেছিল। সমাজের প্রতিটি আদেশ এবং অনুজ্ঞা বিশ্বস্ত এবং অনুরক্ত ভৃত্যের মতোই সে পালন করিতেছিল। সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা অন্তরে তাহার কোনদিনই স্থান পায় নাই। সমাজের নিকট এই একান্ত আত্ম-বিসর্জনে রমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতেছিল, তাহা আমরা বুঝি। তবুও পাপপুণ্য, ন্যায়অন্যায় উপেক্ষা করিয়া রমার নারী-হৃদয় সমাজের আশ্রয়ে, সমাজেরই ছায়ায় দাঁড়াইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দ গাঙ্গুলী, বেণী ঘোষালের পরিচালিত পল্লীসমাজ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইল না। নিতান্ত অকারণে, বোধ হয় অসহায় নারীহৃদয় বলিয়াই তাহাকে দারুণ আঘাত করিয়া সমাজের ছায়া হইতেও বাহির করিয়া দিল। বিশ্বেশ্বরীর হাত ধরিয়া ভগ্নহৃদয়ে রমা সমাজের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার একান্ত নিঃস্ব, সর্বহারা, অসহায় মুখশ্রীর দিকে চাহিয়া সমাজে কাহারও দৃষ্টি অশ্রুসজল হইয়া উঠিল না, কেহ তাহার দিকে চাহিয়াও দেখিল না। সমাজ বুঝিল না, বুঝিতে চাহিল না—নারীহৃদয় আপনার কতখানি বিসর্জন করিয়াছে একমাত্র সমাজের মুখ চাহিয়াই। বিশ্বেশ্বরীর নিকট রমা একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— "আচ্ছা জ্যাঠাইমা মিথ্যে সাক্ষী দিয়া নিরপরাধকে দণ্ডভোগ করানোর শাস্তি কি?" শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, বিশ্বেশ্বরী জানালার বাহিরে চাহিয়া রমার বিপর্যস্ত চুলের রাশির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন, তাহার নিমীলিত দুই চোখের

প্রান্ত বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। সস্নেহে মুছাইয়া দিয়া কহিলেন,—কিন্তু তোমার তো হাত ছিলনা মা! মেয়েমানুষের এতবড় কলঙ্কের ভয় দেখিয়ে যে কাপুরুষরা তোমার ওপর অত্যাচার করেছে, এর সমস্ত গুরুদণ্ডই তাদের। তোমাকে তো এর একটি কিছুই বইতে হবেনা মা।" কিন্তু জ্যাঠাইমার সমস্ত সান্ত্বনা, সহানুভূতি এবং আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও আমরা দেখি গুরুদণ্ড সমাজকে বহন করিতে হয় নাই। সমাজ অনায়াসেই সমস্ত শাস্তির ভার এক নিরপরাধ নারীর স্কন্ধে তুলিয়া দিয়া আপনি বিচারকের আসনে গিয়া বসিয়াছিল। আর বিশ্বেশ্বরীও যে ইহা বুঝিতে পারেন নাই তাহা নয়। সেই জন্যই রমাকে সঙ্গে করিয়াই তিনি কাশীবাসের উদ্যোগ করিতেছিলেন। বিদায়ের দিনে রমেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"রমা কেন যাচ্চে, জ্যাঠাইমা?" শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, বিশ্বেশ্বরী এক প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস যেন দমন করিয়া লইলেন। তারপরে গলা খাটো করিয়া কহিলেন,—"সংসারে তার যে স্থান নেই, তাই তাকে ভগবানের পায়ের নীচেই নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে গিয়েও সে বাঁচবে কিনা জানিনে। কিন্তু যদি বাঁচে, সারাজীবন ধরে এই কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে অনুরোধ করব, কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ এবং এতবড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন। একি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা?"

সমাজের খেয়ালের আর এক খেলা দেখি আমরা পার্বতীর জীবনে। কিন্তু রমা আর পার্বতীর হৃদয় এক বস্তু দিয়া গড়া নয়। রমার ন্যায় পার্বতীর জীবনেরও সমস্ত কামনা বাসনা, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল সমাজ। তালসোনাপুরের জমিদার নারায়ণ মুখুজ্যের পুত্র দেবদাস ও নীলকণ্ঠ চক্রবর্তীর কন্যা পারু বা পার্বতীর হৃদয়ের সঙ্গে সমাজকে হয় ত তীব্র যুদ্ধে অবতীর্ণ

হইতে হয় নাই কিন্তু সমাজই দেবদাসের পিতা নারায়ণ মুখুজ্যেকে কুল হাসাইতে নিষেধ করিয়াছিল এবং পার্বতী যে কেনাবেচা চক্রবর্তী ঘরের মেয়ে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। দেবদাস ও পারুর শৈশব জীবনক্ষেত্র হইতে তার পরে সে অন্তর্হিত হইল সত্য, কিন্তু এই অন্তর্ধানের পূর্বেই সে তালসোনাপুর ও হাতীপোতা গ্রামে আপনার কতকটা পরিচয় রাখিয়া গেল। তাই আঘাত ইহার পার্বতীকেও সহ্য করিতে হইল। তবে রমা অপেক্ষা পার্বতী শক্তিশালিনী। সেইজন্য সে হাতীপোতা গ্রামের জমিদার গৃহিণী, মহেন্দ্রের মা এবং যশোদা তাহার কন্যা। আবার তাল-সোনাপুরে আসিয়া সে মনোদিদিকে জানাইয়া যায়—স্বামী কাহাকে বলে। পার্বতী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চৌধুরীর প্রতি তাহার কর্তব্য ভুলে নাই, দেবদাসকেও সে ভুলিতে পারে নাই, জগতে ছোট বড় সকলের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সে সচেতন ছিল। কিন্তু তবুও অন্তরে অন্তরে তাহার একটা বিরাট আগ্নেয়গিরিই আমরা দেখি। ভূমিকম্পে ফাটিয়া চৌচির হইয়া গলিত উত্তাপ বিপুল বেগে বাহিরে আসিয়া কোন বিরাট ধ্বংস সৃষ্টি করে নাই সত্য কিন্তু কম্পন তাহার বাহির হইতেই আমরা অনুভব করিতে পারি। পার্বতীর গোপন অশ্রুবিন্দু জমিদার গৃহের কোশাকুশির জল বৃদ্ধি করিয়াছে। বাহির হইতে তাহা কেহ দেখে নাই কিন্তু বিগলিত অশ্রুধারার মধ্যে এক দুর্দম বন্যার বেগ যে নিহিত আছে তাহা আমাদের অজানা নাই।

এই নিরুদ্ধ অশ্রু কেবলমাত্র রমা বা পার্বতীর জীবনেরই সম্পদ নয়। শরৎ-সাহিত্যের সকল নারীহৃদয়েই এই গোপন অশ্রুর ফল্গুধারা আমরা দেখি। এই অশ্রুধারাসিক্ত জীবনই তাহাকে পাঠকের নিকট প্রিয় ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে, আর সকল-ক্ষেত্রেই সমাজের সঙ্গে নারীহৃদয়ের দ্বন্দ্ব ইহার মূলে।

এই দ্বন্দ্বের আর এক অভিব্যক্তি আমরা দেখি সাবিত্রীর জীবনেও। সাবিত্রী সতীশকে ভালবাসিয়াছিল, সতীশও সাবিত্রীকেই

চাহিয়াছিল। তাহাদের পরস্পর মিলনে সতীশ এবং সাবিত্রীর জীবন ব্যর্থতা হইতে রক্ষা পাইত এবং দুইটি সার্থক আনন্দময় জীবন হয়ত সমাজের কল্যাণের কারণই হইত। কিন্তু সতীশ সম্পূর্ণ না বুঝিলেও সাবিত্রী বুঝিয়াছিল—সমাজ তাহাদের এই মিলনকে অনুমোদন করিতে পারে না। সাবিত্রী জানিত সমাজের নিকট এ মিলন অবৈধ, সুতরাং সমাজের সম্মতি লইয়া জীবনে মিলন তাহাদের অসম্ভব। সমাজকে উপেক্ষা করিয়া সতীশ তাহাকে বিবাহ করিতে পারে এবং এই উপেক্ষা করিবার শক্তি সতীশের আছে ইহাও সে জানিত। সাবিত্রীর সামান্য ইঙ্গিত পাইলেই হৃদয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষা সমাজের সমস্ত শক্তিকে উপহাস করিতে পারিত আমরাও ইহা বুঝি। কিন্তু সাবিত্রী ইহাও জানিত যে সমাজ সতীশের এই অবহেলাকে, এই ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা করিবে না, জীবনে তাহাকে প্রতিষ্ঠা দিবে না, শান্তি দিবে না। ✓

সতীশের একদিকে ছিল সমাজ আর একদিকে সাবিত্রী। হয় সমাজকে ঘৃণা করিয়া সাবিত্রীর ভালবাসাকে শ্রদ্ধা জানাইতে হইবে নতুবা সাবিত্রীকে ঘৃণা করিয়া সমাজের প্রতি মর্যাদা তাহার অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সতীশ ইহা না বুঝিলেও সাবিত্রী বুঝিয়াছিল। জীবনে সার্থকতার জন্য ইহাই তাহার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আপনার মঙ্গলের পরিবর্তে সাবিত্রী সতীশের মঙ্গলই চাহিয়াছিল। তাই আত্মবিসর্জনের মধ্যদিয়া সে সমাজের নিকট সতীশের জন্য শ্রদ্ধার আসনই প্রার্থনা করিল। ভালবাসার পরিবর্তে সাবিত্রী সতীশের নিকট ঘৃণাই একান্তভাবে কামনা করিল। এই পথে সে অনেকটা কৃতকার্যও হইয়াছিল। কিন্তু এই চাওয়ারই নিষ্ঠুর আঘাত নারীহৃদয়কে কি নির্মমভাবে আহত করিতেছিল, কি নিদারুণ যন্ত্রণা অন্তরে তাহার অনুভব করিতেছিল. একমাত্র সাবিত্রী স্বয়ং ভিন্ন জগতে আর কেহ তাহা সেদিন বুঝিতে পারে নাই। যাহার এক মুহূর্তের দর্শন তাহার আজীবনের আকাঙ্ক্ষা, যাহার নিমেষের সঙ্গ তাহার নিকট স্বর্গসুখ, কতবার নির্মম আঘাত

করিয়া তাহাকেই দূরে সরাইয়া দিতে হইয়াছে। এক কণা স্নেহ পাইবার আশায় সতীশ তাহার নিকট আসিয়াছে, কিন্তু সাবিত্রী তাহার হৃদয়ের সমস্ত চাওয়াকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। রমার জ্যাঠাইমা ছিল, রমাকে তিনি সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, ব্যথিত হৃদয়ের দুঃখের অংশ লইয়াছিলেন। জ্যাঠাইমাকে রমা বলিয়াছিল—"আমি যখন আর থাকবো না, এই কথা কয়টি আমার হয়ে তাকে বোলো জ্যাঠাইমা, যত মন্দ বলে আমাকে তিনি জানতেন, তত মন্দ আমি ছিলাম না। আর যত দুঃখ তাকে দিয়েছি, তার অনেক বেশী দুঃখ যে আমিও পেয়েছি—তোমার মুখের এই কথাটি হয়ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।" রমা হৃদয়ের ব্যথা রাখিবার স্থান পাইয়াছিল, আপন দুঃখের ভার সে লাঘব করিয়াছিল। বিশ্বেশ্বরী সেইদিন রমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু সাবিত্রীর জীবনে বিশ্বেশ্বরী ছিলনা। তাই কেহই তাহাকে বুকে রাখিয়া করুণ সান্ত্বনায় তাহার বুকের বেদনা প্রশমিত করে নাই। সাবিত্রী সর্বংসহা ধরণীর বক্ষেই একমাত্র সান্ত্বনার স্থান পাইয়াছিল। ধরিত্রীর বুকে বুক দিয়া উবুড় হইয়া কতবার সে সতীশকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছে, "ওগো, কেন তুমি আমাকে ঘৃণা কর না, কেন আমি তোমার ঘৃণা পেতে পারি না?" সতীশের সুখের অংশ সাবিত্রী কোনদিন নেয় নাই। সুখের সময় সে আপনাকে সরাইয়া লইয়াছে। কিন্তু দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে সাবিত্রী নিজেকে দূরে রাখিতে পারে নাই। আপন সমস্ত মঙ্গল অমঙ্গল, সকল ভালমন্দ উপেক্ষা করিয়া সে সতীশের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার দুঃখের অংশ লইয়াছে, হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়া সতীশের সমস্ত অমঙ্গল দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সাবিত্রীকে এখানে আমরা রাজলক্ষ্মীর আসনে দেখি। রাজলক্ষ্মীর স্নেহ শ্রীকান্ত-হৃদয়ের সহিত মিলিতে পারে নাই কিন্তু শ্রীকান্তের সমস্ত মঙ্গল অমঙ্গলকে সে আপন হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। শ্রীকান্ত নিজেই তাহাকে এই

অধিকার দিয়াছিল। সমাজের সম্মতি ইহাতে ছিল কিনা শরৎচন্দ্র ইহা আমাদিগকে জানান নাই। সমাজের নিকট শ্রীকান্তের সম্ভ্রম ইহাতে পূর্ণ মাত্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল কিনা তাহাও আমরা জানিনা কিন্তু তবুও দেখি অন্তত এই অধিকারটুকু রাজলক্ষ্মীর ছিল। এইখানেই রাজলক্ষ্মীর ভাগ্যের সঙ্গে রমা, পার্বতী কিংবা সাবিত্রীর ভাগ্যের তুলনা হয় না। সাবিত্রীর ভাগ্যে এই অধিকার মিলে নাই। উপেন্দ্রের হাত ধরিয়া সরোজিনী আসিয়া তাহাকে বঞ্চিত করিয়া এই অধিকারটুকুও তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। সাবিত্রীও একবার সমাজের মুখের দিকে চাহিয়া, একবার সতীশের দিকে চাহিয়া আপনার সমস্ত আশাআকাঙ্ক্ষা, সমস্ত কামনাসাধনা, নির্বাক, নিবিকার নিস্পন্দ ভাবেই আর একজনের হাতে তুলিয়া দিল। এই আত্মত্যাগ যে কত বড়, ইহার মূল্য কি, সমাজ তাহার কোন সন্ধান রাখিল না, শক্তিগর্বে স্ফীত সমাজ একবার চাহিয়াও দেখিল না—তাহারই নিষ্ঠুর বিধানে নীরব আত্মদানে উজ্জ্বল একটি নারীহৃদয় কি ভাবে বিস্মৃতির অতলতলে মিলাইয়া গেল।

বড়দিদির হৃদয়ের দ্বন্দ্বে প্রত্যক্ষভাবে সমাজের কোন হাত ছিলনা, যেমন সাবিত্রী, রমা কিংবা রাজলক্ষ্মীর জীবনে ছিল। বড়দিদিকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে আপন হৃদয়ের সঙ্গে। বাহির হইতে কোন বিরুদ্ধ শক্তি আসিয়া হৃদয়ের স্বাভাবিক গতিকে প্রতিরোধ করে নাই। এই আঘাত এবং প্রতিঘাত বড়দিদির হৃদয়ও অনুভব করিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের আগমন এবং আকস্মিক তিরোধান সেখানে অশ্রুর বন্যাই বহাইয়াছিল। এর দায়িত্ব হইতে সমাজকে হয়ত অনেকেই নিষ্কৃতি দিবে। কিন্তু তবুও দেখি নিরপেক্ষ বিচারে সমাজ এখানেও অব্যাহতি পাইতে পারে না। বড়দিদির গোপন হৃদয় সমাজের হিন্দুবিধবার বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছিল। বাহির হইতে সমাজের প্রতাপ সেখানে অক্ষুণ্ণ রহিলেও বড়দিদির সামাজিক বিধবার হৃদয় সেখানে এক গোপন ষড়যন্ত্রের আভাষ পাইয়াছিল। এই সামাজিক বিধবারই

কঠোর শাসনে সুরেন্দ্রনাথ বড়দিদি কাছ হইতে অন্তর্হিত, "কল্পবৃক্ষ" তাহার আপন স্বভাব হইতে বঞ্চিত। নির্মম আঘাতে নারীহৃদয় ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে আর সে আঘাত প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে সমাজের নিকট হইতেই আসিয়াছে। বড়দিদির ভিতরে আমরা রবীন্দ্রনাথের নিষ্কৃতির মঞ্জুলিকাকে দেখি—

ভয়ে মরে বিরহিণী
শুনতে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তার বাজে রিণি রিণি।
পদ্মপাতার শিশির যেন মনখানি তার বুকে,
দিবারাত্রি টলছে কেন এমনতর ধরা পড়ার মুখে।

বড়দিদির হৃদয়ে আমরা মঞ্জুলিকার এই দ্বন্দ্বেরই যেন আভাস পাই, কিন্তু তবুও পরিণতি ইহাদের এক নয়। রবীন্দ্রনাথের মঞ্জুলিকা ফরাক্কাবাদ আশ্রয় করিয়া কঠোর সমাজ শাসনকে ফাঁকি দিয়াছিল কিন্তু বড়দিদির ভাগ্যে এই 'নিষ্কৃতির' সৌভাগ্য জোটে নাই; সামাজিক বিধানের নিকট আপন নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক শ্রেয়কে বলি দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পথই তাহার নিকট উন্মুক্ত ছিলনা। সমাজেরই নিকট সে আত্মবলি দিয়াছে, আত্মবিসর্জনে সমাজেরই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

(শরৎ-সাহিত্যে একশ্রেণীর নারী আছে, তাহারা সমাজের প্রত্যেকটি নিয়ম মানিয়া লইয়া সমাজের পায়েই আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, সমাজের প্রতি কোন কর্তব্য সম্পাদনেই ইহাদিগকে বিন্দুমাত্র পরাঙ্মুখ আমরা দেখিনা, কিন্তু তবুও সমাজের কোলে ইহাদের স্থান হয় নাই, রিক্ত হস্তেই ইহারা সকলে সমাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। আপন ভাগ্যকে ইহারা কোনদিন দোষ দেয় নাই। ব্যথা বেদনাই সমাজের নিকট আপনাদের একমাত্র প্রাপ্য বলিয়া ইহারা জানিয়া লইয়াছিল। শরৎ-সাহিত্যে এই শ্রেণীর নারীর কথা মনে হইলে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে অন্নদাদিদিকে।) নারীর একমাত্র গতি স্বামী—সমাজই একদিন তাহাকে ইহা শিখাইয়াছিল এবং দুঃসহ

দুঃখের ভিতরে অন্নদাদিদি এই শিক্ষাকেই তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়াছিল। কিন্তু ইহাই আজ সমাজের নিকট তাহার অপরাধ।

অন্নদাদিদিকে আমরা দেখি, সমাজের দেওয়া সমস্ত অত্যাচারই সে নীরবে নত মুখে সহ্য করিল। একদিন সমাজ যাহার আজীবন সঙ্গ তাহার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল, আমরা দেখি সমাজের বাহিরে আসিয়াও অন্নদাদিদি তাহারই হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তবুও সমাজের দৃষ্টিতে অন্নদাদিদি অপরাধী। চিরদিন অপরাধীর জীবনযাপন, ইহাই সমাজের নিকট হইতে তাহার প্রতি একমাত্র ব্যবস্থা হইল। দীর্ঘ দুঃসহ জীবনে একদিনের তরেও কেহ তাহাকে সান্ত্বনার বাণী শুনায় নাই, অন্নদাদিদি একবারও জানিতে চাহে নাই তাহার সত্যিকার অপরাধ কোথায়। কিন্তু আমরা জানি, কিছুই না জানিয়া এবং দোষগুণের কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই তাহার জাতি, ধর্ম, সংসার, সম্ভ্রম কাড়িয়া লইয়া এক অজানার পথে তাহাকে যে ঠেলিয়া দিয়াছিল সে সমাজ।

সমাজ সেদিন চাহিয়া দেখে নাই, দেখিবার প্রয়োজন মনে করে নাই, এই নিরাশ্রয় রমণীর পথের শেষ কোথায় এবং সেই পথে চলিতে তাহার পাথেয় কি। অন্নদাদিদি বুঝিয়াছিল, দুঃখ, দৈন্যই তাহার চির-জীবনের অধিকার, তাই বিপুল দ্বন্দ্বের ভিতরে থাকিয়াও সমাজের বিচারের বিরুদ্ধে কোন নালিশই তাহার নাই। ইহার ভালমন্দ বিচার করিবার কথা একবারও তাহার মনে উদয় হয় নাই, একবারও সে ইহা চিন্তা করে নাই। আপন ভবিষ্যতকে সে সমস্ত অন্ধকারের সঙ্গেই মিলাইয়া দিয়াছিল। এরূপই আমরা দেখি মৃণালের জীবনে, অন্নদাদিদির ন্যায় মৃণালকে সমাজের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হয় নাই। কিন্তু সমাজের গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়াই যে বিধিনির্দেশ মৃণালকে সমস্ত জীবন ভরিয়া মানিতে হইয়াছিল তাহার প্রত্যেকটি ধারাই ছিল অত্যন্ত কঠিন ও নির্মম। কিন্তু অন্নদাদিদির মত মৃণালের জীবনও ছিল এই হৃদয়হীন সমাজেরই অঙ্গ। নারীজীবনের অতীত ভাগ্যই ছিল চলার পথে ইহাদের লক্ষ্য। তাই দুঃখদৈন্যকেই ইহারা একমাত্র সম্বল মনে করিয়াছিল।

কোনক্রমেই যে ইহার ব্যতিক্রম কখনো হইতে পারে এ ভাবনাও ইহাদের মনে উদয় হয় নাই।

(কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে সকল নারীই সমাজের সকল বিধি ব্যবস্থা সকল বাধা নিষেধ নির্বিরোধে মানিয়া লইয়া আপনাকে সমাজের পায়ে উৎসর্গ করিয়া দেয় নাই। সকল নারীই অন্নদাদিদি বা মৃণালের হৃদয় লইয়া জন্মায় নাই। 'অন্নদাদিদি বা মৃণাল উভয়েরই দৃষ্টি ছিল নারীর অতীত গতিপথের দিকে। তাই সম্মুখের দিকেও সেই পথেরই অগ্রগতি দেখিয়া জীবনপথের প্রতি তাহাদের সন্দেহ হয় নাই, ভবিষ্যতে ভিন্ন পথের অবতারণা করার কথাও ইহাদের মনে হয় নাই।) অদৃষ্টকে কোনদিন ইহারা ধিক্কার দেয় নাই। কিন্তু নীলকণ্ঠ চক্রবর্তীর কন্যা পার্বতীকে আমরা দেখিয়াছি।) পার্বতী নারীর চিরনির্দিষ্ট পথেই চলিয়াছিল, সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সে করে নাই। (আপন হৃদয়ের বিপ্লবের মধ্যেই সে ডুবিয়াছিল ইহা সত্য, তবুও তাহার অন্তরের বিদ্রোহী নারীকে আমরা যে একেবারেই দেখিতে পাইনা তাহা নহে।) এই বিদ্রোহী নারীহৃদয়ই তাহাকে হাতীপোতা গ্রাম হইতে দেবদাসের সন্ধানে তালসোনাপুরে নিয়া গিয়াছিল। (পার্বতী জানিত, সমাজ দেবদাসের অধঃপতনে কোন আপত্তি করিবে না, তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য সমাজের কোন মাথাব্যাথাই নাই। পার্বতী জানিত দেবদাসের পতনে সমাজ নীরব থাকিবে কিন্তু জমিদার ভুবনবাবুর পত্নী পার্বতীর দ্বারা তাহার উদ্ধারের প্রচেষ্টায় সে নীরব সম্মতি দিবে না। মনোরমা তাহাকে মনে করাইয়া দিয়াছিল, সমাজের কঠিন নিয়মে—দেবদাসের একা কণা সাহায্য করিবার উপায় তাহার আর নাই। একথা পার্বতীও যে জানিত না তাহা নহে, কিন্তু তবুও আমরা দেখি পার্বতী সেদিন সমাজের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করিয়াছিল, সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই আপন কর্তব্য স্থির করিয়াছিল, (কিন্তু শরৎচন্দ্র পার্বতীহৃদয়ের বিদ্রোহী নারীকে বিকাশের সুযোগ দেন নাই। তাই দেবদাসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না। বর্ষার প্রভাতের অরুণোদয়ের মতই একবার মাত্র এই বিদ্রোহী নারীর প্রকাশ দেখি, তার পরেই এক নিবিড় মেঘ আসিয়া

তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। পার্বতীর বিদ্রোহী নারীহৃদয় পুনরায় হাতীপোতা গ্রামের জমিদার গৃহিণীর মধ্যেই ডুবিয়া গেল।

যে সুযোগ পার্বতী পায় নাই তাহা অভয়া পাইয়াছিল, পার্বতী যাহা পারে নাই তাহা পারিয়াছিল অভয়া। শরৎ-সাহিত্যের সকল নারীহৃদয়ই সমাজের পেষণে চূর্ণ হইয়াছে, অসহায় নারীহৃদয় আকুল-ক্রন্দনে আপন অন্তরেই নীরব অশ্রুর প্লাবন বহাইয়াছে কিন্তু উত্তাল তরঙ্গ তাহার বাহিরে কখনও প্রকাশ পায় নাই। এই হৃদয়হীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তাহার নাই, কোন প্রশ্নই সে করেনা। সমস্ত প্রশ্নেরই সন্ধান করিতে হয় আমাদিগকে পাঠকের হৃদয়ের সহানুভূতির মধ্যে। পাঠকের এই সহানুভূতিকে যাহারা বাহিরে টানিয়া আনিয়া ইহাকে প্রশ্নে সাজাইয়া সমাজের সম্মুখে ধরিয়াছে, অভয়া তাহাদের মধ্যে একজন। তাই সমাজের এই বিধিনিষেধ, এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে সে প্রথম প্রশ্ন করিয়াছিল নারীজন্মের সার্থকতা কোন পথে। আপন পতিপ্রেমের, আপন একনিষ্ঠতার এবং সতীধর্মের পুরস্কার সে পাইয়াছিল। সেই অমোঘ পুরস্কার চিহ্ন লইয়াই সে স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়াছিল। সে জানিত, রোহিণীদা তাহাকে ভাল বাসিয়াছিল। কিন্তু চিরদিনই সে সমাজের মুখে সতীধর্মের উচ্চ প্রশংসাই শুনিয়া আসিয়াছে। তাই একমাত্র সতীধর্মেরই আকর্ষণে সমস্ত আশাআকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়া, সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও অভয়া জীবনে অবহেলাকেই বরণ করিয়াছিল। এই সতীধর্মের গৌরবেই রোহিণীদার ভালবাসার প্রতিদানের কথা সে কখনও মনেও করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন সে বুঝিতে পারিল, তাহার আপন জীবনে এই সতীত্ব গৌরবের প্রকৃত স্বরূপ কি, সে স্পষ্টই দেখিতে পাইল অন্যের জীবনে যাহাই হউক না কেন তাহার নিজের নিকট ইহা একান্ত ফাঁকা, ইহা সতীর নীচতা ও নির্লজ্জতা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, তখনই সে সমাজের বিধিবদ্ধ নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসিল। সে রোহিণীদার সঙ্গে একত্র বাস করিতেছে জানিতে পারিয়া শ্রীকান্ত তাহাকে বলিয়াছিল "চলে আসাটা অন্যায় বলতে পারিনে কিন্তু—"

শ্রীকান্তের মুখে এই কিন্তুর অর্থ আমরা জানি। শ্রীকান্ত দেখিয়াছিল নারীর চিরদিনের গতি কোনদিকে এবং একমাত্র সেই ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য ব্যবস্থার সঙ্গে কোন নারীকে সে মিলাইয়া দেখিতে পারে নাই। সেই পথের রেখার বাহিরে কাহারও পদচিহ্ন পড়িতে পারে ইহা সে কল্পনা করিতেও পারে নাই। তাই তাহার মনে পড়িতেছিল অন্নদাদিদিকে, মনে পড়িতেছিল রাজলক্ষ্মীকে। ইহাদের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া সে অভয়ার বিচার করিতে চলিয়াছিল: কিন্তু আমরা দেখি এই বিচারের জন্য অভয়ার হৃদয় প্রস্তুত হইয়াই ছিল। বাহিরের অবস্থা ও আবেষ্টনী তাহাকে এই বিদ্রোহের পথে টানিয়া আনিয়াছিল. সত্যি কিন্তু এ পথের প্রত্যেক রেখাটিকেই সে যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ করিয়া নিয়াছিল, পথের পরিণতির সম্বন্ধেও সে সচেতন ছিল না তাহা নয়। তাই শ্রীকান্তের কথা শুনিয়াও অভয়া সঙ্কুচিত হয় নাই। সে উত্তর করিয়াছিল—"এই কিন্তুটার উত্তরই তো আপনার নিকট চাইচি শ্রীকান্তবাবু। তিনি তার ধর্মস্ত্রী নিয়ে সুখে থাকুন আমি নালিশ কচ্ছিনে; কিন্তু যখন শুধুমাত্র একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার করে দেন তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কিনা, আমি সেই কথাইতো আপনার কাছে জানতে চাইচি। তিনিও আমার সঙ্গে সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করেছিলেন। অর্থহীন আবৃত্তি তাঁর মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল, কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল শুধু মেয়েমানুষ বলে আমারি উপরে?" অভয়ার এ প্রশ্ন শুধু শ্রীকান্তের নিকট নহে, সমাজের নিকটও। আমরা দেখি সে শুধু প্রশ্নই করে নাই, বিচারও চাহিয়াছিল। সামাজিক নিয়মকে উপেক্ষা করিয়াও সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। কারণ সমাজে তাহার প্রয়োজন ছিল, জীবনে অভয়া সার্থকতা চাহিয়াছিল। সামাজিক বিধি নিয়মের নিষ্ফলতার বিরুদ্ধেই ছিল তাহার বিদ্রোহ, তাই বিদ্রোহী জীবনে তাহার হিংসার তীব্রতা আমরা দেখিনা। শ্রীকান্তের নিকট অভয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,"তা হলে শ্রীকান্তবাবু আমাকে সমাজ থেকে বার করে দিলে

কি হিন্দুসমাজ বেশী পবিত্র হয়ে উঠবে? তাতে কি কোনদিক দিয়েই সমাজে ক্ষতি পৌঁছুবেনা?" আমরা দেখি বিদ্রোহী নারীহৃদয় শেষ মীমাংসায় পৌঁছিয়াছিল অতি শান্ত সংযত ভাবেই, বিদ্রোহী জীবনের দুঃখ দৈন্যকেই আপনার একমাত্র সম্পদ বলিয়া অভয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল। শ্রীকান্তের ভিতর দিয়া সমাজকে সে জানাইয়াছিল "আমি কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে যাবোনা। সমস্ত অপযশ, সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত দুর্ভাগ্য মাথায় নিয়েই আমি চিরদিন আপনাদের হয়েই থাকব।"

শরৎ-সাহিত্যে একটিমাত্র রমণী আমরা দেখি সমাজের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র বিদ্রোহ করে নাই, সমাজকে শুধু উপেক্ষা করে নাই, ইহাকে উপহাসও করিয়াছিল। তাহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বিদ্যার সমস্তটুকু যেন আমরা সহ্য করিতে পারিনা। তাহার সমাজ নাই, সংসার নাই, জীবনে অতীত তাহার কোনদিন ছিল তাহার বিদ্রোহী মনের কোণে এ ধারণা স্থান পায়না। বর্তমানের গতির সঙ্গেও তাহার আপন গতির মিল সে খোঁজেনা, ভবিষ্যতের জন্যও তাহার কোন চিন্তা নাই। লক্ষ্যহারা পথভ্রষ্ট উল্কার মতই সৃষ্টির একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত আপন চলার পথ যেন আপনিই সৃষ্টি করিতে চায়। শরৎ-সাহিত্যে অন্যান্য রমণীর সঙ্গে কিরণময়ীর মিল নাই।

ইহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দুঃসহ তেজ শরৎ-সাহিত্যে অন্য কোন নারীর নাই। কিন্তু যে নারীহৃদয় শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত সমস্ত নারীরই বৈশিষ্ট্য, যেখানে শরৎ-সাহিত্যের প্রায় সমস্ত নারীরই শক্তির কেন্দ্র সেই হৃদয়ের পরিচয় কিরণময়ীর ভিতরে আমরা অল্পই দেখি। প্রথম হইতেই তাহার সমস্ত কার্য আত্মকেন্দ্রিক, তাহার চিন্তাধারায়ও আপনার সুখ-দুঃখ ছাড়া কিছুই স্থান পায় না। আমরা দেখি অন্য কাহারও প্রতি কোন বিবেচনাই তাহার চলার পথের গতি কিছুমাত্র ব্যাহত করিতে পারে নাই। তাই সমাজের কোন বিধি ব্যবস্থার ধার সে ধারে না। সমাজ শাসনের প্রতি তাহার তীব্র ভ্রূকুটীই আমরা দেখি। সমাজ হয়ত অন্য দশজন বিধবার পাশেই তাহার আসন পাতিবার ব্যবস্থা করিয়া দিত, আপন ভাগ্য-বিধাতার লেখা ললাটলিপি নিয়াই বিধবা জীবনের দীর্ঘ

দিন তাহাকে গাণতে বলিত। কিন্তু কিরণময়ী কোন ব্যবস্থাই মানিতে পারিল না। আপন ভাগ্য সে আপনিই সৃষ্টি করিল, আপন ললাট-লিপি সে আপন হাতেই লিখিয়া লইল। পরিশেষে সুদূর সাগরের ওপারে গিয়া বিদ্রোহী নারী জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিল।

কিরণময়ীর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি আমাদিগকে বিস্ময়াভিভূত করে, তাহার অকুণ্ঠিত তেজ আমাদিগকে স্তম্ভিত করে কিন্তু এই তেজ, এই শক্তি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না। সেই জন্যই শরৎচন্দ্র নিজেও ইহা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখিতে পারেন নাই। আমরা দেখি, কিরণময়ী আপনার শক্তি দ্বারা আপনিই আহত হইতেছিল, আপনার তেজ তাহাকে নিজেকেই ক্রমাগত দগ্ধ করিতেছিল। শরৎচন্দ্র দক্ষ শিল্পী, অনেকের মতে তাঁহার দক্ষতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় কিরণময়ীর পরিণতি। এই তেজস্বিনী রমণীকে তিনি সমাজের যূপকাষ্ঠে বলি দেন নাই। কিন্তু আমরা দেখি শরৎচন্দ্র নিজের হাতেই তাহার বলির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শরৎ-সাহিত্যে আর একটি নারীকে আমরা দেখি, সে রেঙ্গুনের নিভৃত পল্লীরমণী। পরিচয় আমাদের সঙ্গে তাহার বেশীক্ষণের জন্য নয়। শ্রীকান্তের ছন্নছাড়া জীবনে সুদীর্ঘ ইতিহাসের মাত্র একটি পাতার বেশী সে অধিকার করে নাই। কিন্তু করুণতায়, নৃশংসতায়, নির্মমতায় সে চিত্র অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, অভয়া কিংবা বড়দিদির নীচে নয়। এই রমণীর নাম আমরা জানিনা। আমরা দেখি বাঙালী হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু তবুও দেখি এই সরলপ্রাণা একান্ত নির্ভরশীলা রমণীর উপর সমস্ত অত্যাচারের মূলেই বাঙালী হিন্দু-সমাজ। বাঙালী হিন্দু সমাজই পশ্চাতে থাকিয়া নারীহৃদয় লক্ষ্য করিয়া অত্যাচার ও অবিচারের সুতীক্ষ্ণ শরগুলি নিক্ষেপ করিতেছিল। বাঙালী বাবুটির নামও শরৎচন্দ্র ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দেখি এই নিষ্ঠুরতম অত্যাচার অনুষ্ঠানের পরেও সমাজের কোলে তাহার স্থানাভাব নাই, বরং এই পথেই দশজনের একজন হইবার নির্দেশ সমাজই তাহাকে দেয়। নিঃসম্পর্ক রমণীর দুই ফোঁটা অশ্রু সমাজকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না! আমরা দেখি বাঙালীবাবু এই বর্মা রমণীর আশ্রয়ে

সুদীর্ঘকাল ধরিয়া স্বামীর অধিকার লইয়াই বাস করিতেছিল। এই সরলা রমণীর আপন বিশ্বস্ত হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত সম্পদই অকপটে কায়মনে তাহাকে সমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু একদিন সমাজ তাহাকে আকর্ষণ করিল, সুদীর্ঘ দিনের সমস্ত বন্ধন, সমস্ত স্নেহকে অস্বীকার করিতে বলিল। বাঙালীবাবু সমাজকেই মানিয়া লইল কিন্তু ফিরিবার সময় কোমলপ্রাণা নারীহৃদয়ের জন্য অপরিসীম দুঃখই রাখিয়া গেলনা, অগণিত লোকের চক্ষে তাহাকে বিদ্রূপ ও হাসির পাত্রী করিয়াই ফেলিয়া গেল। নারীহৃদয়ের সঙ্গে সমাজের এই দ্বন্দ্ব শরৎ-সাহিত্যের সর্বত্রই পরিস্ফুট। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, কোন এক অদম্য শক্তি প্রতিনিয়তই সমাজের ভিতর থাকিয়া নারীহৃদয়ের বিরুদ্ধে যেন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

সমাজ ও নারীহৃদয়ের এই দ্বন্দ্বে জয়ের মালা আমরা সর্বত্রই সমাজের কণ্ঠে দেখিতে পাই। শরৎ-সাহিত্যে কোন নারীই এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া শরৎ-সাহিত্যে যে মিলন নাই তাহা নয় বরং এখানে বিষাদান্ত পরিণতিই অপেক্ষাকৃত বিরল। আমরা দেখি বিজয়ার জীবন নরেনের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, জ্ঞানদা অতুলের আশ্রয় পাইয়াছিল, ঝড়ঝঞ্ঝার পরে কুসুমও বৃন্দাবনের গৃহেই উঠিয়াছিল কিন্তু সমাজকে উপেক্ষা করিয়া কাহারও ভাগ্যে এই মিলন ঘটে নাই। দুঃসহ নিপীড়ন সহ্য করিয়া সমাজের নিষ্ঠুর পরিচয়ের মধ্য দিয়াই একান্ত ঈপ্সিত স্থানে ইহাদিগকে পৌঁছিতে হইয়াছে। এক-মাত্র কমলকেই দেখি, যে ইহার মধ্যে শেষ প্রশ্ন তুলিয়াছিল, সমাজকে অতিক্রম করিতে চাহিয়াছিল। কমল বর্তমান সমাজের ধ্বংসের উপর ভবিষ্যত সমাজের ভিত্তি গড়িতে চাহিয়াছিল। কিন্তু কমলের জীবনের সেই পরিকল্পনা সর্বতোভাবে সফল হইয়াছে বলিতে পারি না। ধ্বংসের সেই বিরাট কল্পনার পিছনে সৃষ্টির সে বীজ লুক্কায়িত আছে, সে সন্ধান শরৎচন্দ্র নিজেও আমাদিগকে দেন নাই। কমল সমাজকে প্রশ্ন করিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তার শেষ প্রশ্নের শেষ সমাধানের উপর শরৎচন্দ্রের সম্মতি নাই।

উপন্যাসে নারী আপন সৌন্দর্যের ভিতর দিয়াই প্রথম আপনাকে প্রকাশ করে, এই বাহ্যিক আবরণ দ্বারাই সে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে। শরৎ পূর্ব বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে আমরা দেখিয়াছি, রূপেই নারী দিল সর্বপ্রথম পরিচয়। আমরা "গম্ভিরনাদী বারিধি তীরে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে" কপালকুণ্ডলার অপূর্ব রমণী মূর্তি দেখিয়াছিলাম। প্রথমেই দেখিলাম "তাহার কেশভার আবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশিকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার, তদগ্রে দেহরত্ন"। গ্রন্থকার আমাদিগকে জানাইয়াছেন যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। আমরা দেখি অলঙ্কারাদির প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতে-ছিলনা, তথাপি মেঘবিচ্ছেদ নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। রাজপথের পান্থনিবাসে ক্ষীণ দীপালোকে আমরা মতিবিবিকে দেখিয়া-ছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই তাহার পরিচয় আমাদিগকে দিলেন। আমরা তাহাকে চিনিবার পূর্বেই তাহার বাহ্যিক রূপকে দেখিয়া লইলাম। বঙ্কিমচন্দ্র জানাইলেন মতিবিবির শরীর ঈষদ্‌দীর্ঘ বটে কিন্তু হস্ত-পদ হৃদয়াদি সম্পূর্ণ সুগোল সম্পূর্ণীভূত। বর্ষাকালে বিটপিলতা যেমন আপন পত্ররাশির বাহুল্যে দলমল করে ইহার শরীর তেমনি আপন পূর্ণতায় দলমল করিতেছিল। আমরা জানিলাম মতিবিবি গৌরাঙ্গী নহে, শ্যামবর্ণা কিন্তু মুগ্ধকরী শক্তিতে ইঁহার বর্ণই ন্যূন নহে। এই বর্ণ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে মতিবিবির নবচ্যূত পল্লববিরাজী ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় উজ্জ্বল শ্যামললাট বিলম্বী অলকাবলী, সপ্তমী চন্দ্রাকৃত ললাটতলস্থ অলকস্পর্শী ভ্রূযুগ, পক্ক চূতোজ্জ্বল কপালদেশ এবং তন্মধ্যে ঘোরারক্ত অধরোষ্ঠ স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে কোন নারীই এই পথ ধরিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয় না, শরৎচন্দ্র রূপের ভিতর দিয়া নারীর পরিচয় দিবার চেষ্টা করেন নাই। পরিণীতায় ললিতার প্রথম পরিচয় আমরা গুরুচরণের মুখেই শুনি। গুরুচরণ শেখরকে বলিয়াছিলেন, "ও একটু শ্যামবর্ণ বটে কিন্তু এমন চোখ, এমন হাসি, এত দয়ামায়া পৃথিবী খুঁজে বেড়ালেও কেউ পাবে না"। আমরা দেখি, ইহার মধ্যে নারীর রূপের পরিচয় যেটুকু আছে তাহা তাহার সুপরিচয় নয়। কিন্তু

কোমলপ্রাণা নারীহৃদয়ের পরদুঃখকাতর রূপটিকে ইহার মধ্যেই আমরা দেখি। শরৎ-সাহিত্য নারীর এই রূপটির সঙ্গেই আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয়। বনমালীর একমাত্র কন্যা—বিজয়ার পরিচয় বনমালীর নিজের মুখেই আমরা শুনিতে পাই। বনমালী কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "মা আমার ছেলে নেই বলে এতটুকু দুঃখ করিনে। তুই আমার সব। এখনো তোর আঠার বছর হয়নি বটে, কিন্তু তোর মাথার উপরে আমার এতবড় বিষয়টা রেখে যেতেও আমার একবিন্দু ভয় হয় না।" মৃত্যুপথযাত্রী পিতার মুখের এই কথা কয়টি আঠার বছরের বালিকার যে পরিচয় আমাদিগকে দেয় চিত্রপটে অঙ্কিত কোন চিত্র দ্বারাই তাহা সম্ভব হইত বলিয়া মনে হয় না। অন্নদাদিদির প্রথম পরিচয় পাইলাম শ্রীকান্তের নিকট, শ্রীকান্ত বলিয়াছে—আমি ঘাড় ফিরাইয়া ইন্দ্রর দিদিকে দেখিলাম। যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি! যেন যুগযুগান্তব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। শরৎ-সাহিত্যে ইহাই নারীর পরিচয়। নারী জীবনের চিরন্তন রূপটিই সকল নারীর ভিতর দিয়া যেন প্রকাশ পাইয়াছে। তাই দেখি শরৎ-সাহিত্য পোড়াকাঠকেও আশ্রয় দেয়। অন্নদাদিদি, বড়দিদি, রাজলক্ষ্মী মৃণালের পাশেই সে আসন পাতিয়া বসে।

কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে সকল নারীই অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী বা মৃণাল নয়। পাঠকের সহানুভূতি সকলকেই আকর্ষণ করিতে পারেনা। শরৎচন্দ্র —নয়নতারা, দিগম্বরী, স্বর্ণমঞ্জরী এবং রমার মাসীকেও সাহিত্যে স্থান দিয়াছেন। রাসী বামণীকে আমরা দেখি, শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যে ইহাদের জন্য কলঙ্ক কালিমার জীবনই নির্দেশ করিয়াছেন। তাই শরৎ-সাহিত্যের এক প্রান্তে ইহারা এক সহানুভূতিহীন জীবন যাপন করে। কিন্তু এই নয়নতারা, দিগম্বরী বা রাসী বামনীই শরৎ-সাহিত্যে নারীর পরিচয় নয়। আমাদের মনে হয় অন্নদাদিদির জীবনকে উপলক্ষ্য করিয়া নারী জাতি সম্বন্ধে শ্রীকান্ত যাহা বলিয়াছিল তাহা শরৎচন্দ্রের নিজেরই কথা। শ্রীকান্তের মুখে আমরা শুনি "স্ত্রীলোককে কখনো আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না। বুদ্ধি দিয়া যতই কেননা তর্ক করি,

সংসারে কি পিশাচী নাই? নাই যদি তবে পথে ঘাটে এত পাপের মূর্তি দেখি কাহাদের? সবাই যদি ইন্দ্রর দিদি, তবে এত প্রকার দুঃখের স্রোত বহাইতেছে কাহারা? তবুও কেমন করিয়া যেন মনে হয়, এ সকল তাহাদের বাহ্য আবরণ; যখন খুসি ফেলিয়া দিয়া ঠিক তার মতই সতীর আসনের উপর অনায়াসে গিয়া বসিতে পারে"। "Frailty thy name is Woman"; ইহার সঙ্গে শ্রীকান্তের মুখের এই উক্তির মিল কোথায়?

শরৎচন্দ্র আর এক শ্রেণীর নারীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাইয়াছেন, ইহারা অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী বা বড়দিদির মত ব্যথার ভিতর দিয়া পাঠকের হৃদয়ে আসন রচনা করেনা। ব্যথা ইহাদের হৃদয়েও আমরা দেখি কিন্তু সে ব্যথার আসন ব্যথিত হৃদয়ের সমবেদনার উপরে। দুঃখ যখন চারিদিক হইতে ঘনাইয়া আসে, ব্যথার উপর ব্যথার বোঝা পাঠকের নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিতে চায়, ইহাদের সর্ববিধ কাজে, সকল প্রকার কর্তব্যে এমন একটি অখণ্ড মাতৃত্বের ছবি সুপরিস্ফুটভাবে ফুটিয়া উঠে যে পাঠকের চিত্ত ইহাদের আশ্রয় পাইয়া বাঁচে। শৈলর সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরী, রমার সঙ্গে বিশ্বেশ্বরী, ললিতার সঙ্গে শেখরের মাকে আমরা দেখি। শৈল, রমা, বা ললিতার জন্যই ইহাদের প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন ইহাদের পাঠকের জন্য। পল্লীসমাজে আমরা জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরীকে দেখি। বিশ্বেশ্বরী বেণী ঘোষালের মা, কিন্তু এই বেণী ঘোষালের মা বিশ্বেশ্বরীর মাতৃত্বের পরিপূর্ণ ছবি নয়। তাই আপন কর্তব্য, আপন চিন্তায়, আপন কর্মে, বিশ্বেশ্বরী সেই বেণী ঘোষালের মাকে সম্পূর্ণভাবেই অতিক্রম করিয়াছেন। আমরা দেখি, বিশ্বেশ্বরী, রমা, কিংবা রমেশের কেবলমাত্র জ্যাঠাইমা নয় তিনি তাহাদের মায়ের আসন অধিকার করিয়াছেন। রমা এবং রমেশের ব্যথিত হৃদয়ের জন্য সহানুভূতি বিশ্বেশ্বরীর হৃদয়ে সঞ্চিত ছিল। তাই আপনার মাতৃহৃদয়ে ইহাদিগকে টানিয়া আনিয়া তিনি আপন স্নেহাঞ্চলে ইহাদের সমস্ত অশ্রু মুছিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। আমরা দেখি বিশ্বেশ্বরী কেবলমাত্র রমা ও রমেশের জীবনের ব্যথাই অনুভব করেন নাই। সহস্র অত্যাচারে

অত্যাচারিত পল্লীসমাজের অন্তরের ব্যথাও জ্যাঠাইমা অনুভব করিয়াছিলেন। তাই পল্লীসমাজও তাহাকে মায়ের আসনেই বসাইয়াছিল। আমরা দেখি, রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধদিনে পল্লীসমাজ সুকুমারীকে উপলক্ষ্য করিয়া কদর্যতার গাঢ় পঙ্কে নামিতেছিল। অমঙ্গলের সূচনা দেখিয়া রমেশের মন শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল. অনিবার্য অমঙ্গল নিবারণের সে কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিল না। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—"যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্তি সত্ত্বেও বিশ্বেশ্বরী সাধারণত কাহারও সাক্ষাতে বাহির হইতেন না।" কিন্তু তবুও পল্লীসমাজ তাহাকে চিনিত, তাঁহার মায়ের স্নেহ অনুভব করিত। তাই এই সঙ্কট মুহূর্তে রমেশকে ও পল্লীসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যখন বাহির হইয়া আসিলেন, সকলের সচকিত দৃষ্টি মুহূর্তমধ্যেই তাঁহার উপর পড়িল। শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, জ্যাঠাইমা রমেশকে আহ্বান করিয়া সুস্পষ্ট উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—"গাঙ্গুলী মশাইকে ভয় দেখাতে মানা করে দে. রমেশ। আর হালদার মশাইকে আমার নাম করে বল যে আমি সবাইকে আদর করে বাড়ীতে ডেকে এনেচি, সুকুমারীকে অপমান করবার তার কোন প্রয়োজন ছিলনা। আমার কাজকর্মের বাড়ীতে হাঁকাহাঁকি, চেঁচামেচি, গালিগালাজ করতে আমি নিষেধ করচি। যার অসুবিধে হবে তিনি আর কোথাও গিয়ে বসুন।" পল্লীসমাজ সেদিন ঘোষালবাড়ীর বড়গিন্নির আদেশ শুনিয়াছিল। তাই যাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আবার আস্তে আস্তে বসিয়া পড়িয়াছিল। এই সুস্পষ্ট উক্তির পিছনে শক্তি কতখানি সে বিষয়ে তাহারা ধারণা করে নাই, কিন্তু এই উক্তি যাহার সেই লোকটিকে তাহারা দেখিয়াছিল। শক্তি তাহার যত অল্পই হোক না কেন, তাহার মাতৃত্বের আসনকে পল্লীসমাজ উপেক্ষা করিতে পারে নাই। এই সুস্পষ্ট আদেশ লঙ্ঘন করার চিন্তা করাও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

এই অখণ্ড মাতৃত্বের আর একটি ছবি দেখি আমরা সিদ্ধেশ্বরীর জীবনে। যে শক্তির বলে গিরীশ 'নিষ্কৃতির' গৌরব কিনিতে পারিয়াছিল, আমরা জানি তাহার অনেকখানিই সিদ্ধেশ্বরীর নিকট হইতে পাওয়া। শরৎ-সাহিত্যের আর একটি রমণীর বিষয় উল্লেখ করিব—

তাহার ভিতরেও এই অখণ্ড মাতৃহৃদয়ের বিকাশের সম্ভাবনা দেখি। মাধবীর বয়স সবে মাত্র ষোল বছর। মাতৃত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে ইহা অনুকূল নয়। শরৎচন্দ্র সে বিকাশের সুযোগও তাহাকে দেন নাই। মাধবী ব্রজবাবুর গৃহে কল্পবৃক্ষ বড়দিদি সাজিয়াছিল। কিন্তু সেই কল্পবৃক্ষের পাতার ফাঁকে আমরা একটি স্ফুটনোন্মুখ মাতৃহৃদয়কেই দেখি। আমরা দেখি, কল্পবৃক্ষ বহুবিধ ফলের সঙ্গে একটি মধুর মাতৃহৃদয়ও সঞ্চিত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ তাহার সকল তৃপ্তির মধ্যে কল্পবৃক্ষের অযাচিত ফলের সঙ্গে এই অখণ্ড স্নেহপরিপ্লুত হৃদয়টিরই সন্ধান পাইয়াছিল। এ আস্বাদ জীবনে সে কোনদিন পায় নাই, শৈশব হইতেই সুরেন্দ্রনাথ মাতৃস্নেহে বঞ্চিত। ইহারই জন্য কল্পবৃক্ষ তাহাকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল। বড়দিদির নিকট হইতে সুরেন্দ্রনাথ এই মাতৃস্নেহই চাহিয়াছিল। তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে "আমার বড়দিদির" নাম শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সঙ্গেই স্মরণ করিয়াছে।

(শরৎ-সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর নারী আছে জীবনে তাহাদের পরিপূর্ণ এবং অখণ্ড মাতৃত্বের বিকাশ আমরা দেখি না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের মাতৃত্বও আপন সন্তানের স্নেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মেজদিদির মাতৃত্বের ক্ষুধা তাহার আপন সন্তানদিগকে দিয়াই মিটিয়াছিল কিন্তু তবুও পরের ছেলে নরেনের প্রতি স্নেহ তাঁহার মাতৃহৃদয়কে সম্পূর্ণই অধিকার করিয়াছেন।) হয়ত অনাথ বিমাতাপুত্রের প্রতি ভগ্নীর অত্যাচার দেখিয়া মেজদিদির স্বাভাবিক নারীহৃদয়টিই ব্যথিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু ইহার মধ্যেও মাতৃহৃদয় যে কোথাও ছিল না তাহা নয়। (আর সদ্য-মাতৃহারা কেষ্টও মেজদিদির অফুরন্ত স্নেহের মধ্যে আপন হারানো মাকেই পাইয়াছিল। তাই বাহিরের বিরক্তি দেখিয়া সে তাহার মেজদিদিকে কখনও বিচার করে নাই। অন্তরে তাহার একটি স্নেহপূর্ণ মাতৃহৃদয় দেখিতে পাইয়া সর্বদাই সেখানে ছুটিয়া আসিয়াছে।)

বিশ্বেশ্বরী বা সিদ্ধেশ্বরীর হৃদয়ে এই অখণ্ড মাতৃত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হইলেও ইহাদের জীবন সাধারণ মায়ের জীবন নয়। নারী-হৃদয়ের মাতৃত্বের জীবন্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া ইহারা কখনও আমাদের সম্মুখে আসে নাই। সন্তানের প্রতি কর্তব্য, পুত্র-কন্যা স্নেহবাৎসল্য ইহাদের জীবনে ক্ষেত্রবিশেষে আবদ্ধ নয়। সমস্ত সমাজের, সমগ্র জাতির মধ্যেই যেন তাহা ব্যাপ্ত হইতে চায়। তাই ইহাদের কর্মকুশল, বিবেকবুদ্ধি পরিচালিত জীবনে মাতৃত্বের সাধারণ ছবি ফুটিয়া উঠে না। (মাতৃহৃদয়ের যে অতৃপ্ত ক্ষুধা আমরা কুসুম, রাজলক্ষ্মী এবং ষোড়শীর জীবনে দেখি, তাহা আমরা বিশ্বেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরীর মধ্যে পাই না।) কুসুমের জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল বামুন কায়স্থ মেয়েদের সঙ্গেই। (তাহাদের জীবনই ছিল কুসুমের আদর্শ। সে আদর্শ সে জীবনে বিস্মৃত হয় নাই, আদর্শকে সে উপেক্ষা করিতেও পারে নাই। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, কুসুমের নারীহৃদয়ের ইহাই ছিল একমাত্র আকাঙ্ক্ষা কিন্তু তবুও সংস্কারকে সে অতিক্রম করিতে পারে নাই। কিন্তু পথ দেখাইয়াছিল তাহাকে চরণ। সুপ্ত মাতৃহৃদয়কে চরণই আঘাত করিয়া জাগ্রত করিয়াছিল। অতৃপ্ত মাতৃহৃদয়ের সমস্ত ক্ষুধা চরণই তাহার ভিতরে আনিয়া দিয়াছিল। এই চরণকে অনুসরণ করিয়াই কুসুম বৃন্দাবনের নিকট পৌঁছিয়াছিল। (বৃন্দাবনের গৃহে পৌঁছিয়া কুসুম চরণকে তাহার কোলে পায় নাই কিন্তু তবুও আসা তাহার ব্যর্থ হয় নাই। আর চরণ ভিন্ন আর কিছুই কুসুমকে এখানে টানিয়া রাখিতে পারিত না। তাই আমরা দেখি, কুসুমের সমগ্র জীবনে অতৃপ্ত মাতৃহৃদয়ের আকুলি বিকুলি, সার্থকতায় পৌঁছিবার জন্য দীর্ঘ কাতর আবেদন।

(এই মাতৃত্বের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আমরা রাজলক্ষ্মীর জীবনেও দেখি। রাজলক্ষ্মীর জীবনকে দেখাইয়া শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"সমস্ত রমণীর হৃদয়ে নারী বাস করে কিনা তাহা জোর করিয়া বলা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ কিন্তু নারীর চরম সার্থকতা যে মাতৃত্বে, একথা বোধ করি গলা বড় করিয়াই প্রচার করা যায়।")

এই জন্যই আমরা দেখি, মাতৃহৃদয়ের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার নিকট একমাত্র বঙ্কুই পর্যাপ্ত নয়। (পরের ছেলেকে ছেলে কল্পনা করার ছেলেখেলা দিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকের তৃষ্ণা মিটে নাই। মাতৃহৃদয় যেখানে যত ছেলে আছে সকলকেই বুকে টানিতে চায়। আমরা দেখি, অপরিচিত অজ্ঞাত পীড়িতা সরলার জীবন-ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায়ের সঙ্গে একটিবার মাত্র পরিচিত হইয়াই রাজলক্ষ্মীর মাতৃহৃদয় রোগশয্যার পাশে ছুটিয়া গিয়া দাঁড়াইতে চায়।)

(এই মাতৃহৃদয়ের অতৃপ্ত মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা আমরা ষোড়শীর জীবনেও দেখি। হৈমর কল্যাণময়ী মাতৃরূপই ষোড়শীকে নারী জন্মের সার্থকতার পথ দেখাইয়াছিল।) স্বামীপুত্রসহ হৈম আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই ষোড়শীর অন্তরে বহুদিনের সুপ্ত অলকা জাগিয়া উঠিল এবং ভৈরবী জীবনের ব্যর্থতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া অলকা-জীবনকে সফল করিয়া তুলিবার নির্দেশ দিল। (মাতৃত্বের তীব্র ক্ষুধা আমরা বিন্দুবাসিনীর জীবনেও দেখি। পরের ছেলেকে ছেলে কল্পনা করিয়া রাজলক্ষ্মীর মাতৃত্ব শান্ত হইতে পারে নাই কিন্তু আমরা দেখি পরের ছেলে অবলম্বন করিয়াই বিন্দুবাসিনীর হৃদয় পরিপূর্ণ মাতৃত্ব লাভ করিয়াছিল।) (বিন্দুবাসিনী অমূল্যকে একান্ত আপনার করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। (তাহার সেই সর্বময় অধিকারে আর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে না পারে ইহাই সে দেখিতে চাহিয়াছিল।) এই অধিকারবোধই অন্নপূর্ণার সঙ্গে তাহার দ্বন্দ্বের মূল। (বিন্দুবাসিনী জানিত, অমূল্যর উপর স্বাভাবিক মাতৃহৃদয়ের অধিকার তাহার নাই, সে অধিকার সম্পূর্ণ অন্নপূর্ণার। অন্নপূর্ণাকে বঞ্চিত করিয়াই সে অমূল্যকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।) অন্নপূর্ণার প্রতি বিন্দুর অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং অফুরন্ত ভালবাসা সত্ত্বেও তাহার মাতৃহৃদয় অন্নপূর্ণার প্রতি এই জন্যই বিমুখ ছিল। (বিন্দু চাহিয়াছিল মাতৃহৃদয়ের অখণ্ড অধিকার। যদিও এখানে বিন্দুবাসিনীর অধিকার অস্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তবুও ইহার ভিতরে আমরা মাতৃহৃদয়ের ক্ষুধাকেই দেখি।) (শরৎ-

সাহিত্যে মাতৃত্বের আর এক অভিব্যক্তি দেখি আমরা দয়াময়ীর জীবনে। মুখুজ্যে পরিবারে যেদিন তিনি নববধূবেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার অভ্যর্থনায় আত্মীয়স্বজন উল্লসিত হইয়া উঠে নাই। মাতৃহারা শিশু বিপ্রদাসের আসন্ন অমঙ্গলই তাহার মধ্যে সকলে দেখিয়াছিল। স্বামীগৃহে পরিজনবর্গের সহিত তাঁহার বেদনার ভিতর দিয়াই পরিচয় ঘটিয়াছিল বেশী, কাহারও হৃদয়ের সঙ্গে নববধূর পরিচয় সেদিন হয় নাই। দয়াময়ী নিজেই ইহা বলিয়াছিলেন। কুমারীর আজীবন স্বপ্ন, স্বামী-গৃহের সুখঐশ্বর্যের ছবির এই প্রকৃত রূপ দেখিয়া হৃদয় তাঁহার আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য তিনি অন্যত্র—ইহার জন্য সান্ত্বনা খুঁজিয়া ছিলেন। মা না হইয়াও মাতৃত্বের মধ্যেই তিনি ডুবিয়া গিয়া সংসারের সমস্ত দুঃখ-বেদনা ভুলিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথম দিনেই সেই যে বিপ্রদাসকে তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন, মাতৃত্বের স্নেহরসে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন, একদিনের জন্যও বিপ্রদাস তাহার বিন্দুমাত্র অভাব বোধ করে নাই। ইহার পরে দয়াময়ী দ্বিজুকে পাইয়াছিলেন, কল্যাণীকে পাইয়াছিলেন, কিন্তু বিপ্রদাসের স্থান কেহই অধিকার করিতে পারে নাই। পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার দিনে একটা কাল মেঘ আসিয়া বিপ্রদাসের মাতৃস্নেহরূপ সৌভাগ্যাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল সত্য কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্যই। আপনার ব্যথার ভিতর দিয়াই বিপ্রদাস তাহার মাতাকে আবার ফিরিয়া পাইয়াছিল। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, এই মাতৃত্ব নারীর যেমন সহজ তেমনি স্বাভাবিক। নারীর পক্ষে ইহা মহাশক্তি। এই মাতৃত্বের বলেই দয়াময়ী মুখুজ্যে পরিবারে মায়ের আসন লইয়া বসিয়াছিলেন, স্নেহে, প্রেমে ভালবাসায় দয়াময়ীর সে আসন চিরদিনের জন্য অটল হইয়াছিল। কিন্তু এই জন্য দয়াময়ীকে মুখুজ্যে পরিবারে একদিনের জন্য বেমানান দেখায় নাই। নারীর মাতৃরূপ এমনই স্বাভাবিক।

শরৎ-সাহিত্যে নারীর আর এক দিক দেখি, সে নারীর অধিকার। শরৎচন্দ্র কেটি, লিসি বা শিশির চিত্র অঙ্কিত করেন নাই।

শরৎ-সাহিত্য আমাদিগকে বিমলা, সুচরিতা বা ললিতার সন্ধান দেয় না। নারীর জন্য এখানে শিলং বা দার্জিলিং-এর পাহাড় নাই, সভা-সমিতি নাই, পার্টি নাই, নারীর দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন সমাজ-সংস্কারকদিগের হয়ত ইহাদের জন্য দয়ার উদ্রেকই হইবে। কিন্তু আমরা দেখি শরৎ সাহিত্যে নারীর কণ্ঠে এক অভিনব সুর বাজিয়া উঠে সহানুভূতির উত্তরে। সে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেয়, এই সহানুভূতির কোন মূল্যই তাহার নিকট নাই। (আমরা রাজলক্ষ্মীকে শ্রীকান্তের নিকট বলিতে শুনি "বাইরে থেকে বাহিরের সামাজিক ব্যবস্থা দেখে তোমরা ভেবে মরে যাও। আমাদের মেয়েরা বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে দিনরাত কাজ করে বলে তাদের মত হীন আর বুঝি কোন দেশের মেয়ে নেই। নিজেদের একটু উঁচু করবার চেষ্টা করো, যদি কোথাও কিছু সত্যিকার গলদ থাকে, সে শুধু তখনই চোখে পড়বে, তার আগে নয়"। ইহা কেবলমাত্র রাজলক্ষ্মীরই কথা নয়, পুরুষের জন্য শরৎ-সাহিত্যে সকল নারীরই অন্তরের কথা। হয়ত ইহা প্রগতিশীল নারী জীবনের পক্ষে গৌরবময় নয়। হয়ত বা ইহা সামাজিক বা রাজনৈতিক জাগ্রত নারীজীবন নয়, তবুও অধিকার যে তাহার মোটেই নাই শরৎ-সাহিত্যের নারী তাহা স্বীকার করেনা।) কমল প্রভৃতি দুই একটি নারীকে বাদ দিলে শরৎ-সাহিত্যের প্রায় সকল নারীই বাহিরের প্রভুত্ব প্রতিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া চাবির গোছা রান্নাঘর বা ভাঁড়ার ঘর নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চায়। (আজ নারী প্রগতির দিনে এই ভাঁড়ার ঘর, বা রান্নাঘর বা চাবির গোছার মধ্যে নারীর জীবনের যথার্থ সার্থকতা আছে কিনা জানিনা কিন্তু শরৎ-সাহিত্যের নারী আপন নারীজন্মের সার্থকতা ইহার মধ্যেই সন্ধান করে।)

ইয়োরোপের কবি লিখিয়াছেন—

Man's love is of man's life a thing apart
'Tis woman's whole existence ; man may range
The Court, Camp, Church, the vessels and the mart

Swoid, gown, gain glory offer in exchange
Pride, fame, ambition to fill up his heart
And few there are whom these cannot estrange.

Byron—Don Juan (CXCIV)

সে দেশের নারীর সম্বন্ধেও আজ ইহা সর্বতোভাবে সত্য নয়। নারীপ্রগতির দিনে আমাদের দেশেও আজ তার সীমাবদ্ধ জীবন এখন আর সম্ভব নয়। পুরুষের সমকক্ষ ভাবেই উচ্চাশা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তাহারা পোষণ করে। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যের অবলম্বন এ যুগের নারীচরিত্র হইলেও শরৎচন্দ্র "দুলিয়ে বেণী চলেন যিনি" সেই আধুনিক বিনোদিনীর চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। তাহাদের "অন্য দেশী চালে কথাবার্তা" কবির মতে কালিদাসের চোখে জল লাগার সম্ভাবনা থাকিলেও শরৎ-সাহিত্যে আমরা তাহাদিগকে পাইনা। Gown, gain অথবা glory ইহাদের জীবনে দেখিনা, pride, fame, ambition এর পথ ইহাদিগকে কেহ দেখায় না। তবে এখানেও Love is woman's whole existence। কিন্তু আমরা দেখি, এই সমাজে তার প্রণয়ের ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ। শরৎ-সাহিত্যে নায়কনায়িকার মোটর নাই। তাই মোটরের সংঘর্ষের ভিতর দিয়া উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর চক্ষে বিদ্যুত খেলিয়া যায় না। শরৎচন্দ্র মিরকাশিম দলনীবেগমের প্রণয় চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। রাজসিংহ রূপকুমারীর হৃদয় বিনিময় ও আমরা এখানে দেখিনা। শরৎ-সাহিত্যে সাধারণ বাঙালী গৃহের ছবি দেখি। তবে সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতেছে। সুতরাং প্রণয়ের অবসর প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আছে। শরৎ-সাহিত্যে নায়ক নায়িকার প্রেমের মূলে স্নেহ। নারী আপন স্নেহ যত্ন, আদর শ্রদ্ধা, আহার পরিবেশন প্রভৃতির ভিতর দিয়াই স্বীয় হৃদয় পুরুষের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহে নারীর এই মধুর চিত্তই পুরুষের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। নারী-পুরুষের মিলন সম্পূর্ণ হইয়া যায়। যদিও বাহ্য মিলন শরৎ-সাহিত্যের অনেক নরনারীই পায়

নাই এবং ইহার সঙ্গেই শরৎ-সাহিত্যের বিষাদস্মৃতি জড়াইয়া আছে, তবুও অন্তরের মিলন ইহাদের সকলের জীবনেই আছে, সেখানে সুসম্পূর্ণ প্রেমের অভাব ঘটে নাই।

শরৎ-সাহিত্য সর্বত্রই নীরব সহিষ্ণুতাময়। প্রেম এখানে মিতভাষী এবং অন্তর্মুখী, বাহ্যরূপে তাহার প্রকাশ নাই। চরিত্রসমূহের ভুল-ভ্রান্তি এখানে বড় নয়, মনুষ্যত্বই এখানে বড়। সামাজিক আচার পদ্ধতি অনুসরণে যেমন এই মনুষ্যত্ব রক্ষিত হয় না, তেমনি একমাত্র দৈহিক সতীত্ব রক্ষা দ্বারাও মনুষ্যত্ব রক্ষা করা যায়না। আবার দৈহিক সতীত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াও মনুষ্যত্ব রক্ষিত হইতে পারে। শরৎ-সাহিত্য প্রধানতঃ ইহারই ইঙ্গিত বহন করে। সেইজন্যই শরৎ-সাহিত্যে সতীত্ব অপেক্ষা মনুষ্যত্ব বড়। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, নানা কারণে সমাজ আজ জীর্ণ কিন্তু তবুও এ সমাজ মানুষের মনুষ্যত্বকে অহরহ আঘাত করিতেছে। তাই শরৎচন্দ্র ছিলেন এই সমাজের বিরোধী। তিনি জানিতেন, মানুষের কল্যাণের জন্যই সমাজের প্রয়োজন, তাই সমাজ অপেক্ষা মানুষ বড়। সর্বত্র আমরা এই সামাজিক আদর্শের পরিচয় পাই।

স্বাধীনতা সম্পর্কেও শরৎচন্দ্রের আদর্শ অন্যান্য অনেকের চেয়ে স্বতন্ত্র ছিল। শরৎচন্দ্রের নিকট স্বাধীনতাই স্বাধীনতার লক্ষ্য নয়, স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। তিনি বলিতেন, ধর্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ—এর চেয়ে আরও বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্যই স্বাধীনতার প্রয়োজন, নইলে স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই।

শরৎ-সাহিত্য বঞ্চিতের মুখে কথা দিয়াছে, দুর্বলকে, উৎপীড়িতকে, লাঞ্ছিতকে প্রতিবাদ করিতে শিখাইয়াছে। শরৎ-সাহিত্যে ব্যথিতের বেদনা ভাষা পাইয়াছে, মানুষের মনুষ্যত্বের দ্বারে এই বেদনা শরৎ-সাহিত্যের মধ্যদিয়া আজ নালিশ জানাইতেছে। আমরা দেখি, মানুষের মরণ শরৎচন্দ্রকে তেমন আঘাত করে না, যেমন করে মনুষ্যত্বের মরণ। শরৎ-সাহিত্যে সত্যের স্থান মুখে নয়, সত্যের স্থান বুকের মধ্যে। প্রচলিত সকল রকম আদর্শে শরৎচন্দ্র বিশ্বাস

করিতেন না। এদিক দিয়া বিচার করিলে শরৎ-সাহিত্যের অতি কম নারীচরিত্রই সতী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও শরৎ-সাহিত্যের অধিকাংশ নারীই মহীয়সী। তাহারা সতী না হইতে পারে কিন্তু তবুও চরিত্রে তাহাদের কোনরূপ হীনতা নাই। প্রকৃতপক্ষে শরৎ-সাহিত্য নিষিদ্ধ প্রেমের বিশুদ্ধতার ছবি।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়াছে বাঙালীর হৃদয় রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির, তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে।"

কবি এখানে অতি সত্য কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র বাঙালী হৃদয়কে শুধু সাহিত্যদর্পণে দেখিয়াই সে চিত্র অঙ্কন করেন নাই। এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র নিজে লিখিয়াছেন,—"এমন দিন গেছে যখন দু'তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত লোকে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে; তারা ভদ্রলোক। কত হাড়ি বাগ্দীর বাড়ীতে থেকেছি, আহার করেছি। গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশেছি তাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনী জেনে নিয়েছি। তার পরে ভাল করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ। তা ছাড়া আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রই আমার স্বচক্ষে দেখা।"

শরৎচন্দ্র বাংলা পল্লীসমাজকে দেখিয়াছিলেন শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়া নয়, অন্তরের দৃষ্টি দিয়া। পল্লীবাসীকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, তাহারই পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রে, বিশেষ ভাবে নারীচরিত্র সমূহে। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, আমার চরিত্রগুলির শতকরা নব্বই ভাগ বুনিয়াদ সত্য। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে সত্য মাত্রই সাহিত্য নয়। এমন অনেক সত্য আছে যা সাহিত্য-পদবাচ্য হতে পারে না। তবে সত্যের উপর বনেদ খাড়া না করলে চরিত্র জীবন্ত হয় না।"

পতিতের প্রতি বাঙালী-হৃদয়ের বেদনা চিরন্তন। এই সেদিনও নদীয়ার ঠাকুরটি আসিয়া আমাদের জানাইয়া গেলেন, 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।' শরৎচন্দ্র মনে প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। এই জন্যই পতিত এবং লাঞ্ছিত জীবনের প্রতি দরদ শরৎ-সাহিত্যে এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। (শরৎ-সাহিত্যে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগের মূল্য বেশী। এই জন্যই নরনারী এখানে দুঃখের ভিতর দিয়া, ব্যথাবেদনার ভিতর দিয়া পাঠকের হৃদয়কোণে স্থান গ্রহণ করে এবং পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে।)

সন্তানবাৎসল্য নারীর সহজাত প্রবৃত্তি। কোন নারীই এই প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত নয়। (কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে নারীর এই প্রবৃত্তি কেবলমাত্র তাহার আপন সন্তানকে অবলম্বন করিয়া চরিতার্থ হয় না, সমগ্র পরিবারকে এবং কখনও কখনও সমগ্র সমাজকে অবলম্বন করিয়াই নারী তাহার এই প্রবৃত্তি সার্থক করিতে চায়, ইহাই আমরা শরৎ-সাহিত্যে দেখি।) এই জন্যই কোনপ্রকার কৃচ্ছ্রতা স্বীকার, কোন প্রকার দুঃখ স্বীকারেই নারী কুণ্ঠিত নয়। এই সার্থকতার জন্যই শরৎ-সাহিত্যে নারী আপন গৌরবে আপনি ভাস্বতী।

(শরৎ-সাহিত্যে একশ্রেণীর নারী আছে, সাধারণভাবে সমাজে আমরা তাহাদের পতিতা বলিয়া থাকি। চন্দ্রমুখী, বিজলী বাইজী বা পিয়ারী বাইজীর স্থান সমাজে নাই। কিরণময়ী, অভয়া প্রভৃতিকেও সমাজে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে ইহাদের জন্যও সহানুভূতি আছে।) শরৎচন্দ্র ইহাদের সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। একদিনের ভুলভ্রান্তির জন্য সমাজ ইহাদের ঘরের বাহির করিয়া দিয়া অর্গল বন্ধ করিয়া দিল, তাহাতে সমাজেরই কি কল্যাণ হইয়াছে, না ইহাদের কল্যাণ হইয়াছে? জীবনের এক-দিনের ভুলই বড় হইয়া রহিল, অন্তরের শত মঙ্গল কামনা যে সার্থকতা পাইল না, তাহার জন্য দায়ী কে? ইহা কি সমাজের নিষ্ঠুরতা নয়? ইহাকে সমর্থন করা চলে কি? শরৎচন্দ্র প্রশ্ন তুলিয়াছেন, কিন্তু উত্তর দেন নাই।

অনেকের অভিযোগ শরৎ-সাহিত্য প্রচলিত নীতি লঙ্ঘন করিয়াছে। শরৎচন্দ্র নিজেও তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সম্পর্কে জানিতেন। এ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—"যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছনা পেয়েছি সে আমার এই অপরাধ, পাপীর চিত্র নাকি আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেছে।" কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে কোন চিত্রই প্রকৃত প্রস্তাবে পাপী নয়। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে প্রচলিত সামাজিক আদর্শ অনুযায়ী যাহাদের পাপী বলা হয়, প্রকৃতই তাহারা মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে নীতিভ্রষ্ট নয়। ভুল করিয়াই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, একদিন তাহারা সমাজের সাধারণের চলার পথের পা বাহিরে দিয়াছিল। কিন্তু একদিনের সেই ভুলের জন্য তাহাদিগকে সমাজের বাহিরে ঠেলিয়া দেওয়াই ইহার প্রতিকার নয়। কেহ গর্তে পড়িলে তাহাকে টানিয়া তুলিতে হয় কিন্তু মাটি চাপা দিয়া মানুষটিকে মারিয়া ফেলিলেই ইহার প্রতিকার হয় না। শরৎ-সাহিত্যের নীতিতে এ মৃত্যু শুধু মানুষের নয়, ইহা মনুষ্যত্বেরও মৃত্যু।

(কিরণময়ী ভুল করিয়াছিল কিন্তু আজীবন ভুল সংশোধনের চেষ্টা করিয়াও সে-চেষ্টা তাহার সার্থক হইল না। সামাজিক নীতির বিচারেও অন্নদাদিদি হয়ত ভুল করেন নাই তবুও প্রচলিত চলার পথের বাহিরে একবার যখন নিক্ষিপ্ত হইলেন, আর কখনও ফিরিয়া আসিবার পথ পাইলেন না। রাজলক্ষ্মীর বাল্যজীবনের জন্য সে নিজে দায়ী নয়। তবুও শেষ জীবনে সমাজের বুকে ফিরিয়া আসিবার সমস্ত আকুলি বিকুলি তাহার ব্যর্থ হইল। শরৎচন্দ্র ইহাদের এবং রমা, অভয়া প্রভৃতির জীবন অবলম্বনে হয়ত বলিতে চাহিয়াছেন যে সমাজে বিধবা বিবাহের সুযোগ থাকিলে হয়ত এই সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হইত না, এই ধরনের জীবনগুলি ব্যর্থ হইত না। সমাজে নরনারীর জীবন হইত অনায়াসগতি এবং সমাজ হইত কল্যাণময়। তাই শরৎ-সাহিত্যে ইহারা পাপী নয়, বঞ্চিত। সমাজের নির্দেশে সমাজের বাইরে দুঃখপূর্ণ জীবন ইহাদের জন্য

নির্দিষ্ট। শরৎ-সাহিত্য ইহাদের জন্য পাঠকের নিকট এক বিন্দু সহানুভূতির অশ্রু কামনা করে।

(শরৎ-সাহিত্য সত্যই নিষিদ্ধ প্রেমের বিশুদ্ধতার ছবি। সমাজের নিয়মে রমা রমেশের মিলন নিষিদ্ধ, পার্বতীর পক্ষে দেবদাসকে ভালবাসা নিষিদ্ধ, আর অভয়ার পক্ষেও তাহার রোহিণীদাকে ভালবাসা এবং তাহার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করা নিষিদ্ধ। আমরা দেখি, সমাজের মুখ চাহিয়াই রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিল না, সাবিত্রী ও সতীশের নিকট হইতে দূরেই রহিয়া গেল। তবুও শরৎ-সাহিত্যে ইহাদের প্রেম ব্যর্থ নয়, অকল্যাণকরও নয়। সমাজের নিকট ইহা নীতিবিগর্হিত হইতে পারে, কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে ইহা নীতিহীন নয়। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ প্রভৃতি অনেক সমস্যার ইঙ্গিত আমরা শরৎ-সাহিত্যে পাই। কিন্তু শরৎচন্দ্র ইহার কোন সমাধানের ইঙ্গিত করেন নাই। এ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "সমাজ সংস্কারের কোন দুরভিসন্ধি আমার নেই। তাই বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের বিবরণ আছে, সমস্যা আছে কিন্তু সমাধান নেই। ও কাজ অপরের আমি শুধু গল্প লেখক—তা ছাড়া কিছু নয়।")

(প্রচলিত সমাজকে শরৎচন্দ্র সবচেয়ে বেশী আঘাত করিয়াছেন তাঁহার 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে। শেষপ্রশ্নের কমল সমাজকে প্রত্যক্ষভাবেই আঘাত করিয়াছে। আমরা জানি, ইহা শুধু ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের কথা নয়, ইহা মানুষ শরৎচন্দ্রের অন্তরের কথা।) ১৯৩০ সালের ২১ নবেম্বর চন্দননগরে এক সাহিত্যসভায় শরৎচন্দ্র যখন এই ধরণের কথাই বলিয়াছিলেন, তখনও 'শেষপ্রশ্ন' প্রকাশিত হয় নাই।

ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের মাতুলালয়ে মহাআড়ম্বরে সেদিন জগদ্ধাত্রী পূজা হইতেছে। ভাগলপুরের সমস্ত অভিজাত সমাজ নিমন্ত্রিত। বাড়ীর অন্যান্য তরুণদের সঙ্গে শরৎচন্দ্র গেলেন পরিবেশন করিতে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—ওকে

বাহির করিয়া দাও, নতুবা আমরা এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইব। অগত্যা শরৎচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়াই নিমন্ত্রিতদের সম্মান রাখিতে হইল। বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তাঁহার একমাত্র আশ্রয়-স্থল মাতুলালয় হইতে বর্জিত হইলেন।

ইহার পশ্চাতে যে করুণ কাহিনী ছিল তাহা দীর্ঘ দিনের। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাগলপুরে বাঙালী সমাজও সেদিন বাংলা-দেশের মতোই দুই দলে বিভক্ত—একদল উদারপন্থী, আর একদল গোঁড়া। শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রক্ষণশীলদলের নেতা। উদারপন্থী দলের নেতা ছিলেন শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শিবচন্দ্রের অর্থ-সাহায্যে ভাগলপুর সমাজে চলিয়াছিল সঙ্গীত, সাহিত্য ও ব্যায়াম-চর্চা। কেদারনাথের দলে ছিল এ সমস্ত নিষিদ্ধ।

রামচন্দ্র মজুমদারের পুত্র রাজু বা শরৎ-সাহিত্যের ইন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া শরৎচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-গৃহে পালিত হইয়াও শিবচন্দ্রের ভক্ত হইয়া পড়িলেন এবং উদারপন্থী দলে যোগ দিলেন। তিনি শিবচন্দ্রের নাট্যশালায় 'জনা' নাটকে জনার অভিনয় করিলেন। এমন কি, শিবচন্দ্রের শ্যালক কান্তিপণ্ডিতের স্ত্রীর মৃত্যু হইলে শ্মশানে শবদেহ বহিয়া নিয়া দাহ করিয়া আসিলেন। এই সমস্ত দুষ্কার্য ও সমাজবিরোধী কাজের জন্য গাঙ্গুলিগৃহে নিষ্ঠুর শাসন আরম্ভ হইল শরৎচন্দ্রের উপর। কিন্তু কোন ফল হইল না। এই সময়ে জগদ্ধাত্রী পূজার ব্যাপারটা সকল ঘটনার উপর যবনিকা টানিয়া দিল। অপমানিত শরৎচন্দ্র সেই রাত্রিতেই গৃহত্যাগ করিলেন এবং ইহার পর সন্ন্যাসীর বেশে বহু স্থান ভ্রমণ করিলেন।

রক্ষণশীল সমাজের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া শরৎচন্দ্র সেদিন গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারই কিছু তিনি শরৎ-সাহিত্যের পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। এই জন্যই শরৎ-সাহিত্যে আমরা দেখি—পতিত বা সমাজ-লাঞ্ছিতদের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ এবং ক্রূর কৌশলী ধর্মধ্বজী সমাজপতিদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ।

এই জন্যই সমগ্র শরৎ-সাহিত্য বঞ্চিত মানুষের কথা। তিনি নিজেই এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন :—

"সংসারে যারা শুধু দিল কিন্তু পেলনা কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেল না—সমস্ত থেকেও কেন তাঁদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদেরই বেদনা দিল আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠাল আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।১ তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারে দুঃসহ কুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে।")

শরৎ-সাহিত্যে এই একটা প্রশ্নই সবচেয়ে বড় করিয়া দেখা দিয়াছে—সমাজ যাহাদের চরম দণ্ড দিয়া সমাজের বাহিরে ঠেলিয়া দিল, অপরাধ তাহাদের—তাহারা জানিয়া বা না জানিয়া সমাজের আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়াছিল। সমাজের নিষ্ঠুর বিধানে তাই তাহারা জীবনে বঞ্চনা ভিন্ন আর কিছুই পাইল না। কিন্তু শরৎ-সাহিত্য প্রশ্ন তুলিয়াছে—সত্যই কি ইহারা অপরাধী? যে আইনে সমাজ তাহাদের দণ্ডিত করিল সত্যই কি সে আইনে কোন ত্রুটী নাই? শরৎ-সাহিত্য লাঞ্ছিতদের প্রতি সহানুভূতিশীল—শরৎ-সাহিত্যের বিরুদ্ধে ধর্মধ্বজীদের ইহাই অভিযোগ।

এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন আমরা পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি—"যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ—পাপীর চিত্র নাকি আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেছে—আমার বিরুদ্ধে তাদের সবচেয়ে বড়ো এই অভিযোগ।" শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "এ ভাল কি মন্দ জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ বেশী হয় কিনা, এ বিচারও করে দেখিনি, শুধু সেদিন যা সত্য বলে অনুভব করেছিলাম, তাই অকপটে প্রকাশ করেছি।" (পতিতাদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন,—লোকে বলে পতিতাদের আমি

সমর্থন করি। সমর্থন আমি করিনে, কিন্তু ঘৃণা করতেও মন চায় না? বলি তারাও মানুষ। তাদের মধ্যেও ত্যাগ আছে, মহত্ত্ব আছে। আমি তো দেখেছি, পতিতাদের মধ্যে কত মহৎ চরিত্র। আবার পরম সতীকেও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি।")

তাই শরৎ-সাহিত্যে পতিতা আর পতিতা নাই। তাহার অন্তরের চিরন্তন মানুষটিই এখানে বড় হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্র ইহাদের সম্পর্কে আরও লিখিয়াছেন—"মানুষের মধ্যে যে পশু আছে, কেবল তার অন্যায়, তারি ভুলভ্রান্তি নিয়ে মানুষের বিচার করব, আর যে দেবতা সব দুঃখ, সব ব্যথা, সব অপমান নিঃশব্দে বহন করেও আজ সস্মিত মুখে তারই ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন, তাকে বসতে দেবার জন্য আসন কোথাও পেতে দেবনা?"

(জনৈক সমালোচক শরৎ-সাহিত্যের নারীদের বারাঙ্গনা, গৃহ-ত্যাগিণী বিধবা, গৃহত্যাগিণী সধবা, নীরব প্রেমিকা এবং কুমারী এই পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগ ঠিক হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। শরৎ-সাহিত্যে একটিমাত্র নারীই জীবনের বিচিত্রতার মধ্যে বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহারই অন্তরের বেদনা শরৎচন্দ্রের দরদী লেখনীমুখে বিচিত্র ভাষা পাইয়াছে। শরৎ-সাহিত্যের নারীর রূপ বড় নয়, তাহার বেদনাই বড়।)

(আমরা দেখি সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ শরৎচন্দ্রের ছিল, তাই বলিয়া তিনি বিদ্রোহী ছিলেন না। সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তিনি সমর্থন করিতেন না। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসেও তিনি এই কথাই বলিয়াছেন—"সীমা মেনে চলাই সংযম। শক্তির স্পর্ধায় সংযমের সীমাকেও ডিঙ্গিয়ে যাওয়া সম্ভব। সংযম যেখানে উদ্ধত আস্ফালনে জীবনের আনন্দকে ম্লান করে আনে, সংযম যেখানে সহজ না হ'য়ে অপরকে আঘাত করে, তখনই সে দুর্বহ। অতি সংযম আর এক ধরনের অসংযম।" শরৎচন্দ্র সামাজিক এই অতি সংযমকেই আঘাত করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, বর্তমান

ভারতীয় সমাজ সংরক্ষিত স্বার্থস্তূপের প্রতীক, সামাজিক বিধি নিষেধগুলি প্রাণহীন, সমাজের নরনারীর জীবনের কল্যাণ সাধনে উহা সহায়ক নয়। সমাজশাসন বর্তমানে ব্যক্তির জীবনের বিকাশে বাধা। শরৎচন্দ্রের দরদ এখানে ব্যক্তির পক্ষে। এজন্য সমাজের বিরুদ্ধে তিনি ক্ষোভের বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন কিন্তু ক্ষোভ আর বিদ্রোহ এক নয়। বিদ্রোহ সামাজিক সমস্যার প্রতিকার নয়—ইহাই ছিল শরৎচন্দ্রের অভিমত।)

১৯১৬ সালে ১০ মার্চ তারিখে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন হইতে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৩৪৫ সালের আশ্বিন মাসে পত্রখানি কোন এক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্র লিখিতেছেন—

'পল্লী সমাজ' আপনার মন্দ লাগে নাই বরং ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাল্য ও যৌবন কালটার অনেক-খানি পাড়াগাঁয়েই কাটিয়াছে। গ্রামকেই বড় ভালবাসি। তাই দূরে বসিয়া যে দুই চারিটা কথা মনে পড়িয়াছে তাই লিখিয়াছি।

(পত্রপ্রাপক সম্ভবতঃ পল্লীসমস্যার সমাধান চাহিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র ইহার উত্তরে লিখিতেছেন—প্রতিকারের উপায়?) উপায় কি, সে পরামর্শ দিবার সাধ্য কি আমার আছে? সে অনেক শক্তি, অনেক অভিজ্ঞতার কাজ। আমরা মুখ দিয়া সে কথা বাহির করা কতকটা ধৃষ্টতা নয় কি? তবুও মনের ঝোঁকে মাঝে মাঝে বলিয়া দেখিয়াছি তো। (যেমন প্রতিকার আছে জ্ঞানবিস্তারে। আর যারা প্রতিকার করতে চায়, তাহাদের মানুষ হইতে হইবে প্রথম হইতে বাহিরে গিয়া, বিদেশে বাহির হইয়া। কিন্তু কাজ করিতে হইবে গ্রামে বসিয়া এবং গ্রামের ভালমন্দ সকলপ্রকার লোকের সহিত ভাল করিয়া মিল করিয়া লইয়া তবে। এইটা বড় দরকারী জিনিস।")

ইহা ছিল শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিমত। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে কোথাও ইহার ইঙ্গিত নাই।

১৯১৯ সালের ৭ জুলাই শরৎচন্দ্র লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"আমার সকল বই আপনি পড়িয়াছেন কি না জানি না। পড়িয়া থাকিলে নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা চোখে পড়িয়াছে যে অনেকগুলি বড় এবং সুখময় জীবন শুধু বিধবা বিবাহ সমাজে না থাকার জন্য ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে।"

এই জন্যই বড়দিদি মাধবী, পল্লীসমাজের রমা এবং পথনির্দেশের হেম প্রভৃতির জন্য শরৎচন্দ্রের বেদনার্দ্র লেখনী পাঠকদিগকে বেদনা-ব্যথিত করিয়া তোলে। সমাজে বিধবাদের জন্য মর্যাদার স্থান নাই, মমত্ববোধ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে সমাজকে আঘাত করিবে ইহাও শরৎচন্দ্র চাহেন নাই। ১৯১৯ সালের ১৪ অ্যাগষ্ট একপত্রে তিনি লীলারাণীকে এই কথাই লিখিয়াছিলেন—"সমাজের মধ্যে যাকে গৌরব দিতে পারা যায় না, তাকে কেবলমাত্র প্রেমের দ্বারাই সুখী করা যায় না। মর্যাদাহীন প্রেমের ভার আলগা দিলেই দুর্বিসহ হয়ে পড়ে।" সমাজের প্রতি এই মনোভাবই শরৎ-সাহিত্যে রক্ষণশীলতা বলিয়া পরিচিত।

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজের চিত্র শরৎচন্দ্র অতুলনীয় নিষ্ঠার সহিত অঙ্কন করিয়াছেন। এখানে তিনি সত্যদ্রষ্টা। প্রাণবান বাঙ্গালী সমাজের প্রাণের কথা শরৎ-সাহিত্য-মুকুরে ধরা পড়ে। শরৎচন্দ্র তাহার জীবনে দেখিয়াছিলেন, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজ-ই জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক। তাহারাই প্রকৃতপক্ষে নানা-প্রকার নিপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রাম আগাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু তবুও এই সমাজের নানাপ্রকার গলদের জন্য সমাজ লাঞ্ছনা হইতে মুক্তি পাইতেছিল না। এইজন্যই এই সমাজের প্রতি শরৎচন্দ্রের সমবেদনা ছিল সুগভীর। তাই অপূর্ব সহৃদয়তা লইয়া তিনি বাঙ্গালী জীবনের এই চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

(ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রীকে শরৎচন্দ্র একবার লিখিয়া-ছিলেন,—"দিদি, তোমাদের সম্বন্ধে কোন সমাজই কখনও সুবিচার করেনি, আমার উপন্যাসের মধ্যদিয়া আমি জীবনভোর তারই প্রতিবাদ করবো।")

ডাঃ মজুমদারকে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা মনে মনে স্ত্রী-লোকের সতীত্ব সম্বন্ধে যে আদর্শ পোষণ করি, বর্তমান সমাজের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় থাকলে বুঝতে পারবো তা কতটা ভুয়ো।"

সমাজের কোন রীতি-নীতির কোন আচার ব্যবহারই চিরন্তন বা সনাতন হইতে পারে না। আজিকার জগতের নিয়মে যাহা সত্য, যাহা কল্যাণময়, কাল তাহা অসত্য এবং অন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে এবং কল্যাণের পথ সুগম না করিয়া হয়ত রুদ্ধই করিবে। তখন এই সামাজিক বিধিকে লঙ্ঘন করিয়াই নূতনের আগমনের পথ প্রস্তুত করিতে হয়। ইতিহাসে ইহাই বিপ্লব নামে পরিচিত। বিদ্রোহের মধ্যদিয়াই বিপ্লব আসে। কিন্তু শরৎ-সাহিত্য এই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত নয়। সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া নরনারীকে এখানে দণ্ড ভোগ করিতেই হয়। বিদ্রোহের পক্ষে শরৎ-সাহিত্যে যুক্তি হয়ত কিছুটা মিলিবে কিন্তু এই বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশে শরৎচন্দ্রের সমর্থন নাই। শরৎচন্দ্র ছিলেন শিল্পী। লাঞ্ছিতের বেদনা তাঁহার কবি-অন্তরকে অশ্রুসজল করিত, কিন্তু ভাঙবার পথে তাঁহাকে প্রেরণা দিতনা। এইজন্যই সমাজের রীতি-নীতি লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে আঘাত করিবার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। শরৎ-সাহিত্য অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বনি তোলে, ইহার বেশী অগ্রসর হইতে প্রেরণা দেয় না। সমাজের সাধারণ নিয়মে যাহারা উপেক্ষিত, যাহারা লাঞ্ছিত, শরৎ-সাহিত্য তাহাদের মানবতার গৌরবে অধিষ্ঠিত করিয়া সম্মানের আসনে বসাইয়াছেন কিন্তু সামাজিক নিয়ম অকল্যাণকর হইলেও তাহাকে ভাঙ্গিবার পথে এখানে বাধা নিষেধই বেশী।

অবশ্য শরৎচন্দ্র একথাও বলিয়াছেন, যে সমাজ উদ্ধত হয়ে যখন তার সত্যিকার সীমাটি লঙ্ঘন করে, তখন তাহাকে আঘাত করাই উচিত। এ আঘাতে সমাজ মরে না, তার চৈতন্যোদয় হয়, মোহ ছুটে যায়। কিন্তু ইহার পরই তিনি রাশ টানিয়া ধরিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—সমাজকে আঘাত করা আর সামাজিক অবিচারকে

আঘাত করা এক কথা নয় অর্থাৎ সামাজিক অবিচার অত্যাচারকে আঘাত করো কিন্তু সমাজকে নয়। সমাজের বিরুদ্ধে শরৎ-সাহিত্যের বিদ্রোহ এখানে আসিয়াই থামিয়া যায়, বিদ্রোহের আগুন বিচার বিবেচনার মধ্যে ডুবিয়া নিভিয়া যায়।'

প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্র এখানে বিদ্রোহী বা বিপ্লবী নন। বড়জোর তাঁকে সংস্কারবাদী বলা যাইতে পারে। ১৯৩০ সালের ২১শে নবেম্বর চন্দননগরে এক সাহিত্য সভায় শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন, আমি সংস্কারের পক্ষপাতী নই। পুরাণো জিনিষটা অদলবদল করে নেবো এ আমি চাই না। সংস্কারের মানে কি তা 'পথের দাবী'তে বুঝিয়েছি। যেটা খারাপ জিনিষ, অনেকদিন চলে ধড়ধড়ে নড়নড়ে হয়ে গিয়েছে, তাকে মেরামত করা। মেরামত কখনও ভাল হয় না। বরং অন্যায় অচল জিনিসটাকে মজবুত করে কায়েমী করে তোলা হয়। কিন্তু মানুষ শরৎচন্দ্রের এ অভিমত হইলেও শরৎ-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের এ পরিচয় আমরা পাই না। সামাজিক বিধি-নিষেধ নরনারীর জীবনে সর্বত্র কল্যাণের কারণ হয় না।—শরৎ-সাহিত্য এইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তবুও এই সামাজিক বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করিবার বা ইহার বিরুদ্ধতা করিবার দুঃসাহস শরৎচন্দ্র তাঁহার অঙ্কিত নরনারীর অন্তরে দেন নাই। দেখি এ পথে যে কেহ পা বাড়াইয়াছে, তাহাকে অসীম দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছে। বিশেষ করিয়া শরৎ-সাহিত্যের কোন নারীর পক্ষেই এই দুঃসাহস শরৎচন্দ্র সমর্থন করেন নাই।

শরৎ-সাহিত্যে অনেকগুলি নারীই শরৎচন্দ্রের বাস্তব জীবনে সত্য। শরৎ-সাহিত্যের রাজলক্ষ্মীকে আমরা 'কালীদাসী' রূপে সমাজ জীবনে দেখিতে পাই এবং পার্বতীকে আমরা 'পার্বতী' বা 'পারু' রূপেই দেখি। পার্বতীর বাবা অমরবাবু ছিলেন ভাগলপুরে সাব-জজ। তাঁহার বাড়ীতেই ছিল শরৎচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুদের সাহিত্যের আসর। পার্বতীর বয়স তখন চৌদ্দ কি পনের। দেখিতে মোটামুটি সুশ্রী। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। পার্বতীর

বেশী আকর্ষণ ছিল শরৎচন্দ্রের গান ও তাহার ছোট গল্প। এই পার্বতীই ছিল শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দরদী পাঠক। পার্বতী নিজেও চমৎকার কবিতা লিখিতে পারিত। শরৎচন্দ্র তখন স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

অমরবাবু পার্বতীর বিবাহ স্থির করিলেন। অশ্রুমুখী পার্বতী সমস্ত লাজলজ্জা ত্যাগ করিয়া একরাত্রিতে চলিয়া আসিল শরৎচন্দ্রের নিকট। কিন্তু বড়লোকের কন্যাকে বিবাহ করিবার সামর্থ্য যে তখন শরৎচন্দ্রের নাই, ইহা পার্বতী না বুঝিলেও শরৎচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন এবং এই কথাই তিনি পার্বতীকে জানাইয়াছিলেন। নীরবে চোখের জল মুছিয়া পার্বতী সেদিন বাহির হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর অমরবাবু চুঁচুড়ায় বদলী হইয়া গেলেন এবং সেখানেই পার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হইল।

পার্বতীর বিবাহ সংবাদে শরৎচন্দ্রের মনে এক গভীর হতাশা আসিল। তিনি মদ ধরিলেন। ইহার কিছুদিন পর অমরবাবু আবার ভাগলপুরে বদলী হইয়া আসিলেন। পার্বতীও তাঁহার সঙ্গে আসিল। শরৎচন্দ্রের গৃহে আসিয়া দেখিল, মুখে তাহার লাবণ্য নাই, শরীরও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। গৃহের মধ্যে একটা ভাঙা বাক্সে পার্বতী স্তূপীকৃত মদের বোতল আবিষ্কার করিল। জিজ্ঞাসা করিল—একি করচো শরৎদা? শরৎচন্দ্র ম্লান হাসিয়া উত্তর করিলেন,—এ ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় ছিল না, পারু! আমার যে আর কোন সম্বল নেই, পারু। পার্বতী সবই বুঝে, সে কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল—"বল শরৎদা, আমার অপরাধ কোথায়?" কিন্তু শরৎচন্দ্রের তো উত্তর দিবার কিছুই নাই।

শরৎদার দুঃসহ জীবনযাত্রা পার্বতী সহ্য করিতে পারে না। সে লোকলজ্জা, সামাজিক আচার ব্যবহার ভুলিয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে খিড়কির পথে যাওয়া-আসা সুরু করে। নিজ হাতে বোতল সাজায়, ঘরের জঞ্জাল পরিষ্কার করে সে। শরৎদার জন্য সে খাবার তৈরী করে, না খাইলে সাজাইয়া রাখিয়া যায়।

ইহার কয়েকমাস পরেই সংবাদ আসিল পার্বতীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। পার্বতী সিঁথির সিন্দূর মুছিয়া থান কাপড় পরিল। স্বামীর জন্য সে যথারীতি শ্রাদ্ধ করিল। শরৎচন্দ্র এই সময় বোতলের পর বোতল শেষ করিতেছেন আর লিখিতেছেন—দেবদাস, চন্দ্রনাথ, অনুপমার প্রেম প্রভৃতি।

পার্বতীর নিকট শরৎচন্দ্র প্রস্তাব করিলেন— চল বিধবা-বিবাহ করি। কিন্তু পার্বতী সম্মত হইল না—উচ্ছিষ্ট ফুলে দেবতার পূজা চলে না।

কিন্তু যথারীতি আসা যাওয়ার বিরাম নাই। প্রতিদিনের কর্তব্যে কোন ত্রুটী-বিচ্যুতি নাই। ইহার পর বহুবার শরৎচন্দ্র পার্বতীর জীবনের সান্নিধ্যে আসিয়াছেন এবং প্রস্তাব করিয়া একই উত্তর পাইয়াছেন। তার পরে অভিমানে দূরে সরিয়া গিয়াছেন। পার্বতী শরৎচন্দ্রের সম্মুখে চোখের জল ফেলিয়াছে কিন্তু বিধবা বিবাহে কখনও সম্মতি দেয় নাই। বরাবরই সেবার মধ্যদিয়া আপনার হৃদয়কে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে।

উপন্যাসের পার্বতী একবার দেবদাসকে বলিয়াছিল—'আমি যে আর পারিনা দেবদা! আমার যে বড় কষ্ট! জীবনে তোমার সেবা করার সুযোগ পেলাম না। মদ্যপানে অর্ধচেতন দেবদাস উত্তর করিয়াছিল—"তারও সময় আছে।" পার্বতী শরৎচন্দ্রের মৃত্যুকালে তাঁহার সান্নিধ্যে হয়ত আসে নাই। কিছুদিন পরে অমরবাবু পরলোকগমন করিলে পার্বতী কাশী চলিয়া যায়। শরৎচন্দ্রের অন্তরে দেখা দিল এক প্রবল দ্বন্দ্ব। পার্বতী যে শরৎচন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল তাহার প্রমাণের অভাব নাই কিন্তু তবুও সে ধরা দিলনা কেন? তাঁহার মনে হইল, অর্থহীন সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি নিষ্ঠাই ইহার একমাত্র কারণ। শরৎচন্দ্র মনে মনে বিদ্রোহী হইলেন। সামাজিক আচার ব্যবহার সম্পর্কে তাঁহার মনে হইল—মিথ্যা এই আচার ব্যবহার, মানুষের মনুষ্যত্বকে যাহা প্রাণে মারে, তাহাকে বাঁচিবার সন্ধান দেয়না। হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তবুও মিথ্যা লোকাচার আঁকড়াইয়া থাকিতে হইবে? মানুষ কি এতই নিরুপায়? শরৎচন্দ্রের এই সময়ের মনোভাবই শেষ পর্যন্ত

শরৎ-সাহিত্যে এক প্রশ্ন রূপে স্থান পাইয়াছে। মানুষের জন্যই সমাজ না সমাজের জন্য মানুষ? মানুষের কল্যাণের জন্য যে সমাজের সৃষ্টি, সেই সমাজ টিকিয়া থাকিবে তাহার অর্থহীন লোকাচার লইয়া, আর মানুষের হৃদয় যাইবে ডুবিয়া? তাহার অন্তরের সত্য কোথাও আশ্রয় পাইবে না, ইহার কি কোন প্রতিকারই নাই?

কিরণময়ী

শরৎ-সাহিত্যে যে সকল নারী সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে কিরণময়ী তাহাদের অন্যতম। কিরণময়ীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সহজ সরল অথচ তীব্র আত্মানুভূতি রমণী-চরিত্রে বিরল। তাই অন্য নারী যেখানে সমাজের অবিচারকে মানিয়া লইত, অশ্রুজলে ডুবিয়া সকল বিরোধের অবসান করিত, কিরণময়ী সে পথ ধরিয়া যায় নাই। সে শুধু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে নাই, প্রচলিত ধর্ম ও সমাজকে ব্যঙ্গ করিয়াছিল, অন্য দশজনের চক্ষে মনুষ্যত্বকে সে পদদলিত করিয়াছিল। আমরা দেখি, এই বিদ্রোহ করিবার শক্তি কিরণময়ীর ছিল। উপেন্দ্রের অপরিসীম গাম্ভীর্যও এখানে পরাজয় মানিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিরণময়ী আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। কারণ, আপন শক্তির দম্ভে অহঙ্কারের মত্ততায় যে-খেলায় সে মাতিয়াছিল, নারীর পক্ষে সে মারাত্মক খেলা। তাই ইহার ভয়ঙ্করতা যেদিন সে বুঝিতে পারিল সেদিন তাহাকে ফিরিতে হইল। সতীশ উপলক্ষ্য মাত্র। কিরণময়ীর সমগ্র ইতিহাস ব্যর্থতারই ইতিহাস, তীব্র যাতনার ইতিহাস, তিলতিল করিয়া মরণের ইতিহাস।

শরৎ-সাহিত্যে আমরা এই বিদ্রোহী রমণীর পরিচয় দেখি, ছেলেবেলায় কিরণ অনাত্মীয়ের ঘরে মানুষ হইয়া ছেলেবেলাতেই ততোধিক অনাত্মীয় স্বামীভবনে আসিয়াছিল। শাশুড়ী অঘোরময়ী তাহাকে কোনদিন আদর যত্ন করেন নাই, বরং যতদূর সম্ভব নির্যাতন করিয়া আসিয়াছেন। স্বামীও তাহাকে একদিনের জন্য ভালবাসেন নাই। তিনি দিনের বেলা স্কুলে শিক্ষা দিতেন, রাত্রে নিজে অধ্যয়ন করিতেন, বধূকে শিক্ষা দান করিতেন। বিদ্যার্জনের নেশা তাহাকে এমনি গ্রাস করিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে গুরুশিষ্যের কঠোর সম্বন্ধ ভিন্ন স্বামীস্ত্রীর মধুর সম্পর্কের কিছুমাত্র অবকাশ ঘটে নাই।

এমনি করিয়াই কিরণময়ীর শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। সৌন্দর্য ও মাধুর্য হইতে সম্পূর্ণ নির্বাসিত এক জগতের সে ছিল অধিবাসী। কিন্তু পরিপূর্ণ যৌবনের মাঝখানে আসিয়া হঠাৎ তাহার জীবনের গতি ফিরিয়া গেল। এই নিরুপমা প্রখর বুদ্ধিশালিনী রমণী আপনার চারিদিকে ফিরিয়া তাকাইল, সেখানে এক শুষ্ক কঠোরতা ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহার মনে হইল, সমস্ত প্রতিবেশ যেন তাহাকে এমন ভাবে ঘিরিয়া রাখিতেছে, যেখান হইতে তাহার মুক্তির কোন সম্ভাবনা নাই। পরিপূর্ণ যৌবন যখন বিকাশের জন্য ব্যাকুল, পাথুরে-ঘাটার বদ্ধগৃহে কিরণময়ীর জীবন তখন অসহনীয় মনে হইল। মুক্তির সহজপথ সে খুঁজিয়া পাইল না, তাই আঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়াই সে বাহির হইতে চাহিল। সমাজ তাহার এ আঘাতকে উপেক্ষা করে নাই। এই জন্যই কিরণময়ীর সমস্ত জীবন ব্যর্থতারই ইতিহাস।

কিরণময়ীর স্বামী হারাণের কথা শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, "সেই শুষ্ক কঠোর মূর্তিমান বিদ্যার অভিমান! বিজ্ঞানের শক্ত বেড়া দিয়া যিনি অত্যন্ত সতর্ক হইয়া দিবারাত্রি নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেন, সেই স্বামী!" শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, লিখিয়া পড়িয়া ভাত রাঁধিয়া, শ্বাশুড়ীর বকুনি খাইয়া, ঘরের কাজকর্ম করিয়া দিনের বেলা কাটিত, রাত্রে পরকালের বিরুদ্ধে, আত্মার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া, নালিশ করিয়া, গ্লানি বা ব্যঙ্গ করিয়া ঘরের দেওয়ালগুলা পর্যন্ত দূষিত বিষাক্ত করিয়া দিয়া ক্লান্তজর্জর হইয়া কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িত। আবার প্রভাত হইত, রাত্রি আসিত। এমনই করিয়া মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর গড়াইয়া গিয়াছিল। বাড়ীতে, 'ভিক্ষা দাও লা', বলিয়া ভিখারী প্রবেশ করে নাই, 'কেমন আছ' বলিয়া প্রতিবেশী সংবাদ নেয় নাই; মুহূর্তের তরেও মুক্ত বায়ু-পথ-ভুলিয়া প্রবেশ করে নাই, তবু দীর্ঘ দশ বৎসর গত হইয়াছিল।

মা বাপের কথা কিরণময়ীর মনে নাই, কালনার কোন এক নিরানন্দ মাতুল বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নববধূ সজ্জায় একদিন সে এই শুষ্ক গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। বধূজীবনে শ্বাশুড়ীর পরীক্ষা ছিল আরও কঠোর।

সেখানে অতি ক্ষুদ্র ভুলভ্রান্তিরও ক্ষমা ছিলনা। অঘোরময়ী তাঁহার রান্নাঘরের হাতা-বেড়ী-খুন্তি হইতে পোড়া কাঠ পর্যন্ত সবগুলির চিহ্নই এই ছোট বধূটির দেহে অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

ইহাই ছিল কিরণময়ীর বধূ-জীবনের ইতিহাস। এই বিপরীত আব-হাওয়ার মধ্যে কবে যে সে কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিল সে নিজেই জানিতনা। যৌবনে অজ্ঞাতে নিরহঙ্কারে দেহের কূল-উপকূল যখন সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, তখনও সে স্বামীর সহিত পুস্তকের সূক্ষ্ম বিচারতর্ক লইয়াই ব্যস্ত রহিল। তারপর স্বামী অসুখে পড়িল। দীর্ঘকাল রোগভোগের পর স্বামীর ইহকাল ফুরাইয়া আসিল, তাহার পুস্তকালোচনার আর শক্তি রহিল না। স্বামী-গৃহে এই নীরব অবসরের মধ্যে কিরণময়ী হঠাৎ চৈতন্য লাভ করিল। সে দেখিল—রূপ, যৌবন, নারীর বিকাশের পক্ষে যা সহায়, তাহার নিজের মধ্যে তার অভাব নাই। যৌবনের রূপ তখন তাহার সর্বাঙ্গ উপচিয়া পড়িতেছে, কিন্তু এ অর্ঘ কাহার পায়ে সে উপহার দিবে? ভোগতৃষ্ণা তাহার প্রবল হইল, সে আকণ্ঠ পিপাসা অনুভব করিল। যে পিপাসায় লোক নর্দমার ঘোলা জল চোখ বুজিয়া পান করে, তাহার ছিল সেই পিপাসা। স্বচ্ছ পরিষ্কার জল যখন হাতের নাগালের বাহিরে, তখন ঘোলা জল দিয়াই সে তৃষ্ণা মিটাইতে উদ্যত হইল, সে অনঙ্গ ডাক্তারকেই প্রেম নিবেদন করিতে চাহিল। ইহার ব্যর্থতা একদিন কিরণময়ী নিজেই বুঝিতে পারিল। উপেন্দ্রের নিকট এই কথাই সে স্বীকার করিয়াছিল।
—ঠাকুরপো, সেই অনঙ্গ ডাক্তারকে তুমি চেননা। চিনলে বুঝতে পারতে কত বৎসরের দুর্দান্ত অনাবৃষ্টির জ্বালা আমার এই বুকের মাঝ-খানে জমাট বেঁধেছিল বলেই এমন অসম্ভব সম্ভব হতে পেরেছিল।

কিরণময়ী অমৃত চাহিয়াছিল কিন্তু এই দুর্গন্ধময় বিষাক্ত জল পান করিয়াই বুঝিল. ইহা স্বর্গের অমৃত নয়। কিন্তু তবুও হীনতার মধ্যেই হয়ত তাহাকে ডুবিয়া যাইতে হইত কিন্তু উপেন্দ্রের অকস্মাৎ আবির্ভাবে অন্ধকারের মধ্যেও সে আলোকরেখা দেখিতে পাইল। কিরণময়ী উপেন্দ্র-সুরবালার পরস্পর নিবিড় ভালবাসার কথা শুনিল, উপেন্দ্রের

সৌম্য-মধুর-শান্তমূর্তি তাহাকে আকর্ষণ করিল, সে উপেন্দ্রকে ভাল বাসিয়া ফেলিল। কিরণময়ী উপেন্দ্রের দেহটাকেই ভালবাসে নাই, সে ভাল বাসিয়াছিল তার শান্ত উদাসীনতাকে, পরিপূর্ণ মহত্ত্বকে। তাই ইহার মধ্যদিয়াই নূতন পথের সন্ধান পাইল, সমস্ত বীভৎসতা হইতে মুক্ত হইয়া জীবনে প্রথম দিন সে শান্তির স্বাদ পাইল।

মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্ন স্বামীর কঙ্কালসার দেহটাকে অবলম্বন করিয়াই কিরণময়ী তাহার ভালবাসা সার্থক করিতে চাহিল, স্বামীপ্রেমের পরিবর্তে স্বামী সেবাকেই সে অবলম্বন করিতে চাহিল। স্বামীর মুমূর্ষু দেহটাকে লইয়াই সে নারীত্বকে সার্থক করিতে চাহিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনি, স্বামী তাহাব বেশীদিন বাঁচিলনা, সে সেদিক হইতেও বঞ্চিত হইল। জগতে তাহার আর কোন অবলম্বন রহিল না।

উপেন্দ্রকে সে পূর্বেই ভালবাসিয়াছিল এবং সেই ভালবাসাই যে তাহাকে মহৎ করিয়াছিল ইহা আমরা জানি। সেই জীবনের এই প্রথম মধুর স্পর্শ তাহাকে মাতাল করিয়াছিল, উপেন্দ্রর নিকট ইহা জানাইয়া সে অপূর্ব তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিল। আমরা জানি, উপেন্দ্রর নিকট কিরণময়ী তাহার হৃদয় ব্যক্ত করিয়াছিল মাত্র, সে তাহার নিকট প্রেম নিবেদন করিতে যায় নাই, সে উদ্দেশ্যও তাহার ছিলনা। কিরণময়ী জীবনে প্রথম যে মাধুর্য অনুভব করিয়াছিল তাহা ধরিয়া রাখিবার শক্তি তাহার ছিলনা, তাই একান্ত প্রিয়তমের নিকট স্বতঃই তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

উপেন্দ্র নেহাৎ ভালমানুষ, পরোপকার করাই তাহার ব্রত। কিন্তু মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা ছিলনা। তাহাকে যে ভালবাসিত অন্য কাহাকেও সে ভালবাসিতে পারিবে না, এ ছিল তাহার শেখা কথা। তাই কিরণময়ীকে সে ভুল বুঝিল। কিরণময়ীর মধ্যে এক অপূর্ব শক্তি ছিল, সেই শক্তি বলেই সে আপনাকে অমন করিয়া প্রকাশ করিতে পরিয়াছিল। কিন্তু উপেন্দ্র সেই শক্তিকে দেখিতে পাইল না। উপেন্দ্র দেখিল—এক লালসাময়ী নারী, জীবনে বঞ্চনাকেই যে ক্রমাগত অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। উপেন্দ্র বুঝিয়াছিল, দেহের লালসাই

কিরণময়ীর একমাত্র কাম্য, তাই কিরণময়ী ও দিবাকরের স্নেহভালবাসার সম্বন্ধকে সে সন্দেহ করিয়া বসিল।

দিবাকরের সঙ্গে কিরণময়ীর হাসিঠাট্টা অনেক সময় রুচির সীমা অতিক্রম করিত। কিন্তু দিবাকরের পক্ষে যাহা হউক, ইহার কদর্যতা কিরণময়ীকে স্পর্শ করিতে পারিত না। সে ছিল আপন শক্তিতে ভরপুর, তাই দিবাকররূপী এই অসহায় জীবটিকে লইয়া সে একটু আমোদ করিত, সংসারানভিজ্ঞ গোবেচারা তাই তাহার হাসি ঠাট্টার পাত্রই ছিল। আমরা জানি দিবাকরের প্রতি তাহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিলনা এবং এই শ্রদ্ধা ব্যতীত প্রণয়সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু অন্ধ উপেন্দ্র ইহা দেখিতে পায় নাই। এইজন্য সে কিরণময়ীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছিল, বিনা দোষে তাহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়াছিল।

কিরণময়ী উপেন্দ্রের এই ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে পারিল না, তাহার অপরিমেয় সংযম এবং অসীম অহংকার ফিরিয়া উপেন্দ্রকেই আঘাত করিল। কিন্তু এই আঘাত উপেন্দ্রও নিজেই আহ্বান করিয়াছিল। কিরণময়ী উপেন্দ্রকে অকপটে জানাইয়াছিল, "সমস্ত মিথ্যে, সমস্ত মিথ্যে। ছি, ছি, এত ছোট তুমি আমাকে পারলে ভাবতে!" কিন্তু উপেন্দ্র তাহার কথা শুনে নাই, কিরণময়ীকে তীব্র ব্যঙ্গ এবং উপহাস করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাই আহত সর্প ফিরিয়া দংশন করিয়া বসিল। ইহার ভালমন্দ ভাবিয়া দেখিবার সময় কিরণময়ীর ছিল না। আঘাত পাইয়া সেই আঘাতকে ফিরাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু সুবুদ্ধি, সুবিচার যখন উদয় হইল, তখন আর ফিরিবার উপায় ছিল না।

আরাকানে দিবাকরের সঙ্গে কিরণময়ীর জীবনযাত্রা আমরা দেখি। যে-লালসাকে ইন্ধন যোগাইয়া সে বৃদ্ধি করিয়াছিল তাহাই তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। অবোধ অপরিণামদর্শী দিবাকরকে সে ভালবাসার নামে প্রতারিত করিয়া তাহার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হইতে বিচ্যুত করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। কিরণময়ী জানিত, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই, লক্ষ্য তাহার ঠিকই আছে। তাই সমস্ত দুঃখকষ্টকে বিনা

প্রতিবাদেই গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু দিবাকর আরাকানে এক লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনই যাপন করিতেছিল। অতীত তাহার মুছিয়া গিয়াছে, বর্তমান তাহার নিকট কিছুই নয়, ভবিষ্যৎ তাহার নিকট অন্ধকার, এই একান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে কোন লোক বাঁচিতে পারে না। কলিকাতা হইতে আসিবার সময়ে দিবাকর বুঝিয়াছিল কিরণময়ী তাহাকে ভালবাসে, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই ভালবাসার নিকটই সে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সে জানিত, আরাকানে তাহার এইটুকুমাত্র অবলম্বনই আছে। কিন্তু সেখানেও যখন সন্দেহ দেখা দিল, দিবাকর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাছাড়া, হীনতার মধ্যে দিবারাত্রি অবস্থান করিয়া হীনতাই আসিয়া দিবাকরকে আশ্রয় করিল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, পাপের সহিত নিষ্ফল ক্রিয়া করিতে গিয়া সেই দিবাকরের ভিতর হইতেই আজ বাসনার যে রাক্ষস বাহির হইয়া আসিয়াছে, আত্মরক্ষা করিতে তাহারই সহিত লড়াই করিয়া কিরণময়ী আজ ক্ষতবিক্ষত।

এই অবস্থায় আমরা দেখি, তাহার মাথার চুল রুক্ষ, বিপর্যস্ত, বস্ত্র মলিন ও জীর্ণ, মুখের উপর কি এক প্রকারের শুষ্ক ক্ষুধা যেন হতাশ্বাসের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। দেহের সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া কদর্য শ্রীহীনতায় দৃষ্টি পীড়িত হয়। কিন্তু এই সঙ্গে আমরা ইহাও দেখি এই হীনতা কিরণময়ীর অন্তরকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই দিবাকরের দেওয়া সমস্ত আঘাতকে সে নিজেরই কৃতকর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, তাহারই জন্য দিবাকর আজ এইরূপ কদর্য, হীন পঙ্কে নামিয়া আসিয়াছে। দিবাকর তার অন্যায়ের জন্য বৌদির নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিল। কিন্তু কিরণময়ী তাহাকে বলিয়াছিল, তোমার একার দোষ নয়, মানুষমাত্রকেই এসব কাজ পশু করে ফেলে। আমাকেও এক তিল কম পশু করেনি।

দিবাকরকে সমস্ত জানাইয়া শুনাইয়াই কিরণময়ী তাহার নিকট হইতে পার্থক্য চাহিয়া লইয়াছিল। দিবাকরকে সে জানাইয়াছিল, 'আর একজনের সর্বনাশ করব ভেবেই তোমার ক্ষতি করেচি ··· সমস্ত আগাগোড়া ভুল হয়ে গেছে।' সে বলিয়াছিল, 'আমি ভগবান মানিনে,

আত্মা মানিনে, জন্মান্তর মানিনে, স্বর্গ নরক, ওসব কিছুই মানিনে—ও সমস্তই আমার কাছে ভুয়ো, একেবারে মিথ্যে। মানি শুধু ইহকাল আর এই দেহটাকে?' আমরা জানি ইহাই সত্য কথা। কিরণময়ীর অপরিসীম বুদ্ধি তাহাকে অন্য নারী হইতে পৃথক করিয়াছিল। সাধারণ নরনারীর মধ্যে যে অন্ধ বিশ্বাসটুকু সংস্কাররূপে কাজ করে তাহার মধ্যে তাহাও ছিল না। তারপর, সাধারণ নরনারীর ইহকাল আছে, ইহকালে স্বচ্ছ স্বাভাবিক জীবনযাপন করিয়াই তাহারা পরলোকের দিকে তাকাইয়া থাকে। কিন্তু তাহার তাহাও ছিল না। নারী জীবনের স্বাভাবিক সার্থকতার পথ তাহার নিকট উন্মুক্ত ছিল না! তাই প্রথম যেদিন ইহার আকর্ষণ সে অনুভব করিল, আকর্ষণ তাহার নিকট সর্বগ্রাসী হইয়া দেখা দিল। এইজন্যই সে নর্দমার ঘোলা জলও পান করিতে উদ্যত হইয়াছিল! কিন্তু উপেন্দ্রকে ভালবাসিয়া সে এই হীনতা হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল। কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যেও অত্যুগ্র কামনার লেলিহান রসনাই আমরা দেখিতে পাই। উপেন্দ্রকে ভালবাসিয়াই সে বুঝিল সুরবালা তাহার অন্তরায়। সে শুনিয়াছিল, সুরবালাকে উপেন্দ্র একান্তভাবে ভালবাসে, সুরবালার প্রতি সে তীব্র ঈর্ষা অনুভব করিতে লাগিল। সেখানেই সে আঘাত করিতে উদ্যত হইল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, প্রেয়সী ভার্যার যে অমূল্য ঐশ্বর্যকে উপেন্দ্র ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জাবোধ করে নাই, সে যে কিছুই নয়, তাহাকে সে যে পরাস্ত খণ্ডবিখণ্ড করিয়া তাহারই চক্ষের উপর ধূলার মত উড়াইয়া দিতে পারে, ইহাই প্রমাণ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, তাহার বুকের ভিতর প্রতিহিংসার মত গড়াইয়া বেড়াইতেছিল। কোনমতেই কিরণময়ী ইহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু কিরণময়ী ভুল বুঝিয়াছিল। সুরবালার নিকটই সে প্রথম শুনিল, প্রতিপক্ষকে চড়াও করিয়া আক্রমণ করিবার মধ্যে যেমন শক্তি, শান্ত সরল আত্মসমর্পণের মধ্যেও তেমনই শক্তি আছে। তাই কিরণময়ী এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিল না। সুরবালার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই এই অন্ধ সরলতাই তাহাকে জয়ী করিল। কিরণময়ী সুরবালার অন্তরের নিকট

আত্মসমর্পণ করিয়াই ফিরিয়া আসিল। এই কথাই সেদিন সে দিবাকরকে কহিয়াছিল—'ভেবেছিলুম, আমার এ ভালবাসার তুলনা বুঝি স্বর্গেও নাই। কিন্তু সে গর্ব টিকল না। ভালবাসার দ্বন্দ্বেও মাথা হেঁট করে ফিরে এলুম। মোহের ঘোর কেটে গেলে স্পষ্ট দেখতে পেলুম তাকে রূপ দিয়ে ভোলাতে পারি এ সাধ্য আমার নেই।' কিরণময়ীর সমস্ত কথাবার্তার লক্ষ্যস্থল যে তাহার উপীনকে, দিবাকর তখনও তাহা বুঝিতে পারে নাই। তাই সে কহিয়াছিল, 'এই সর্বনাশের চেয়েও আজ আমার ভালবাসা অনেক বড় তাই এখনো বেঁচে আছি, নইলে বুক ফেটে মরে যেতুম। দিবাকর জানিতে চাহিয়াছিল, তবুও কিরণময়ী কেন দিবাকরকে ভালবাসিতে পারে নাই। সে কহিয়াছিল—'কে বললে বাসিনি? বেসেছিলুম বৈ কি! কিন্তু বয়সে আমি বড়, তাই যেদিন তোমার উপীনদা আমার হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে যান, সেই দিন থেকে তোমাকে ছোট ভাইটির মত ভালবেসেছিলুম। তাইত এই ছটা মাস নিজের ছলনায় আমি ক্ষতবিক্ষত। তোমার ক্ষুধায়, তোমার মুখের প্রেমনিবেদনে আমার সমস্ত দেহ ঘৃণায়, লজ্জায় কেমন করে শিউরে ওঠে তাকি একটা দিনও বুঝতে পারোনি, ঠাকুরপো'? কিরণময়ী এই স্নেহকেই দৈহিক আকর্ষণ বলিয়া দিবাকরকে প্রতারিত করিয়াছিল। কিন্তু ইহার পরিণতি যে এমন ভীষণ হইয়া উঠিতে পারে, এই বুদ্ধিমতী রমণীও সেদিন তাহা বুঝিতে পারে নাই।

কিরণময়ী উপেন্দ্রকে আঘাত করিতে গিয়াছিল। ইহার ভালমন্দ বুঝিবার মত অবস্থা তাহার তখন ছিল না। কিন্তু আঘাত বড় ভীষণ হইয়া লাগিয়াছিল। মাত্র ছয় মাস পরে উপেন্দ্রের মরণাপন্ন অসুখের সংবাদ শুনিয়া কিরণময়ী আত্মসংবরণ করিতে পারে নাই। সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। উপেন্দ্রের অমঙ্গল সংবাদ প্রত্যাঘাতরূপেই ভীষণতরভাবে তাহাকে আঘাত করিল। তাহার আসন্ন মৃত্যুর কথা শুনিয়া সে আপনাকে ভুলিয়া গেল। তাহা না হইলে কোনদিনই সে ফিরিয়া আসিতে পারে, উপেন্দ্র প্রভৃতির নিকট সে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে পারে, এ কল্পনা কোনদিনও করে নাই। এই হীনতাকে

সে উপেন্দ্রের জন্যই সহ্য করিয়াছিল। তাহার অত্যগ্র বিরোধিতাও এখানে হার মানিয়াছিল। যে সমাজকে একদিন সে ব্যঙ্গ, উপহাস, বিদ্রূপ ও আঘাত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, উপেন্দ্রের অমঙ্গলের কথা শুনিয়াই—সে আসিয়া আবার তাহার নিকট মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার এই আত্মসমর্পণের পরেও সমাজ তাহাকে ক্ষমা করিল না। শত্রুকে পরাজিত করিয়া কঠোর আঘাতে ভূপাতিত করিল। উপেন্দ্রের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইবার অধিকার হইতেও কিরণময়ী বঞ্চিত হইল। সুতরাং বিদ্রোহী নারীর উন্মাদিনী হওয়া ভিন্ন অন্য পথ কোথায়?

আমরা জানি, সমাজের প্রতি বিদ্রোহিতাকে শরৎচন্দ্র ক্ষমা করেন নাই। সমাজের সঙ্গে নারীহৃদয়ের দ্বন্দ্ব তিনি সাহিত্যে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই দ্বন্দ্বে কখনও তিনি নারীকে জয়ী হইতে দেন নাই। মনে হয় যেন সমাজের উমেদারীর বোঝা কাঁধে লইয়াই শরৎচন্দ্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছেন, সমাজের সঙ্গে নারী হৃদয়ের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক, কিন্তু ইহাতে নারীর বিদ্রোহ করিবার অধিকার নাই। শরৎ-সাহিত্যে আমরা দেখি সহনশীলতাই নারীর ধর্ম। চিরকালের সীতা সাবিত্রী সে, তাই শত প্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়াও তাহাকে নীরব থাকিতে হইবে। এই পরীক্ষায় সে যত কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে সমাজে তাহার স্থান তত উচ্চে। তাহার জন্য সমাজের প্রশংসার আর অন্ত থাকে না। কিন্তু কিরণময়ী এই পথ ধরিয়া যায় নাই। কিরণময়ী তাহার জ্ঞানবুদ্ধির নির্দেশেই চলিয়াছে। এই নির্দেশের জোরেই সে সমাজকে উপেক্ষা করিয়াছিল। সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল, সমাজের দেওয়া অপমানকে, অত্যাচারকে সে মাথা পাতিয়া আশীর্বাদ-রূপে লইতে পারে নাই। ইহারই পরিণতি আমরা দেখি কিরণময়ী সমাজের নিকট নতি স্বীকার করিয়াও রেহাই পাইল না। সমাজ কঠোর আঘাতে পরাজিত শত্রুকেও ধরাশায়ী করিল। কিরণময়ী শেষ পর্যন্ত পাগল হইল। ইহাই তাহার বিদ্রোহের পরিণতি। কিরণময়ী নিজেই একদিন উপেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ভালবাসা অন্ধ" একথা সত্য কি না। উপেন্দ্র সেদিন উত্তর করিয়াছিল, 'সত্য বই কি' অনেকের

অভিজ্ঞতাই ত প্রবাদ বচন। কিরণময়ী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তা যদি হয়, কানা খানায় পড়লে লোকে ছুটে এসে তাকে তুলে দেয়, তার জন্য দুঃখ করে, যার যেমন সাধ্য ভালর চেষ্টা করে। কিন্তু ভালবাসায় অন্ধ হয়ে সে যখন গর্তে পড়ে, কেউতো তুলে ধরতে আসে না? বরং আরও তার হাত পা ভেঙ্গে দিয়ে সেই গর্তে মাটি চাপা দিতে চায়। যে-সত্য মানুষ নিজেই প্রচার করে প্রয়োজনের সময়ে সে সত্যের কোন মর্যাদাই রাখেনা। আমার কথা বুঝতে পারচো, ঠাকুরপো!'

উপেন্দ্র কথাটা ঠিকই বুঝিয়াছিল এবং কিরণময়ীকে সে ইহাই জানাইয়াছিল, তবুও আসল উত্তরটা সে এড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এ প্রশ্ন শুধু কিরণময়ীর নয়, সমস্ত পাঠক সমাজের। এ চিরন্তন প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। উত্তর একদিন কিরণময়ী নিজেই দিয়াছিল। দিবাকরকে সে কহিয়াছিল, সন্তানধারণের জন্য যে সমস্ত লক্ষণ সবচেয়ে উপযোগী তাহাই নারীর রূপ। সমস্ত জগতের সাহিত্যে কাব্যে এই বর্ণনাই তার রূপের বর্ণনা। কিরণময়ী আরও কহিয়াছিল, বাস্তবিক ঠাকুরপো, এইখানেই রূপের যেন একটা কূল পাওয়া যায়। এই জন্যই নারীর বাল্যরূপ যদিবা মানুষকে আকৃষ্ট করে তাহাকে মাতাল করেনা। আবার যেদিন সে সন্তান ধারণের বয়স পার হয়ে যায় তখনও ঠিক তাই। ভেবে দেখো ঠাকুরপো, শুধু নারী নয়, পুরুষেরও এই দশা। ততক্ষণই তার রূপ যতক্ষণ সে সৃষ্টি করতে পারে। এই সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই তার রূপ, যৌবন, এই সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই তার প্রেম। দিবাকর কহিয়াছিল, 'কিন্তু—'।

কিরণময়ী তাহাকে বাধা দিয়া কহিয়াছিল, 'না, কিন্তুর জায়গা এর মধ্যে নেই। বিশ্বচরাচরে যে দিকে খুশী চেয়ে দেখ, ওই এক কথা, ঠাকুরপো। সৃষ্টিতত্ত্বের মূল কথা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার জন্যই থাক, কিন্তু এর কাজের দিকে একবার চেয়ে দেখ—দেখতে পাবে এর প্রতি অণু-পরমাণু নিরন্তর আপনাকে নতুন করে সৃষ্টি করতে চায়। কেমন করে নিজেকে বিকাশ করবে, কোথায় গেলে কার সঙ্গে মিশলে, কি করলে সে আরও সবল, আরও উন্নত হবে এই তার অক্লান্ত উদ্যম। দৃষ্টে

অদৃশ্যে, অন্তরে বাহিরে তার এই নিত্য পরিবর্তন, এই জন্যই নারীর মধ্যে পুরুষ যখন এমন কিছু দেখতে পায়—জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক,—যেখানে সে আপনাকে আরও সুন্দর আরও সার্থক করে তুলতে পারবে, সে লোভ সে কোন মতেই দমাতে পারবে না।

আমরা জানি, কিরণময়ী নিজের জন্যই এই সার্থকতার পথই খুঁজিয়াছিল। কিন্তু স্বাভাবিক পথ তাহার পক্ষে উন্মুক্ত ছিল না। তাই বাঁধ ভাঙ্গিয়াই সে বন্যার মত দুর্দমবেগে অপ্রতিহত গতিতে দুই কূল ভাঙ্গিয়া লইয়াছিল। অন্তরে তাহার প্রবল শক্তি ফল্গুধারার মতই প্রবাহিত হইতেছিল। স্বাভাবিক সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত না দেখিয়া ধ্বংসের পথই সে বাছিয়া লইয়াছিল। যে প্রবল শক্তি তাহার নতুন সৃষ্টি গড়িতে পারিল না, সমাজের প্রতিরোধে তাহাই ধ্বংসের কাজে নিযুক্ত হইল। এইজন্য কিরণময়ী নিজে ডুবিল, দিবাকরকেও ডুবাইল। একটা ধূমকেতুর মত সমস্ত অনাসৃষ্টি করিয়া, সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্যকে সে কলুষিত করিয়া দিল।

আপনার পথ চলার গতিতে কিরণময়ী সমাজকে উপেক্ষা করিয়াছিল। সামাজিক যুক্তিকে সে মানিয়া লইতে পারে নাই। সে নিজের দিক হইতেই বিচার করিতেছিল। ইহাই সে একদিন দিবাকরকে কহিয়াছিল—'আমরা যথার্থ অন্যায় তখনই করি, যখন কাহাকেও ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করি। সুতরাং কোন কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ইহাই দেখা প্রয়োজন যে কাহারো প্রকৃত অধিকারে হাত দিতেছি কিনা। আবার এই অধিকার বাহিরের দিকে যেমন ভিতরের দিকেও ঠিক তেমনি। নিজের উপরও নিজের একটা সত্য অধিকার আছে। নিজের বলিয়া সে কাহারও চেয়ে তুচ্ছ নয়। সে অধিকারেও বাহিরের কাহারও হস্তক্ষেপ সহ্য করা নিজের উপর অন্যায় করা। ইহাই আমার কথা।'

এই যুক্তির বলেই কিরণময়ী সমাজকে উপেক্ষা করিয়াছিল। সমাজ তাহার এই অধিকারের সীমা অতিক্রম করিবে ইহা কিরণময়ী চাহিতনা। সে সমাজের পক্ষে ইহা অনধিকার মনে করিত। কিরণময়ী বুঝিত মানুষের জন্যই সমাজ, সমাজের জন্য মানুষ নয়। তাই মানুষের ভালমন্দ,

মানুষের হৃদয়ের কামনা প্রার্থনাকে সার্থক করিয়া তোলাতেই সমাজের সার্থকতা, ইহাই ছিল কিরণময়ীর যুক্তি। সে কহিয়াছিল, সমাজ উদ্ধত হয়ে যখন তার সত্যিকার সীমা লঙ্ঘন করে তখন তাকে আঘাত করাই উচিত এ আঘাতে সমাজ মরেনা—তার চেতনা হয়, মোহ ছুটে যায়।

তাই কিরণময়ী তাহার অজ্ঞাতসারেও সমাজকে আঘাত করিতেই গিয়াছিল। কিন্তু তখনও বুঝিতে পারে নাই তাহার নিজের হৃদয়ই একদিন ইহার বিরোধিতা করিবে। উপেন্দ্রের মরণাপন্ন অসুখের সংবাদ এক নিমিষে তাহার সমস্ত দৃঢ়তা কঠোরতাকে চূর্ণ করিয়া দিল। যে সমাজকে সে একদিন ব্যঙ্গ করিয়াছিল তাহারই নিকট আত্মসমর্পণ হইল তাহার একমাত্র পরিণতি। সমাজের বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহে নারীর নিজের হৃদয়ই তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল।

অচলা

শরৎ-সাহিত্যের সকল চরিত্রের সঙ্গেই আমরা একটি সহৃদয় আত্মীয়তা, একটি অনির্বচনীয় আপন ভাব অনুভব করি। মনে হয় সকলেই আমাদের পরিচিত, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইহাদের সকলের সাক্ষাৎ সব সময়েই আমরা পাই। তাই শ্রীকান্তের বন্ধু ইন্দ্রনাথ আর রাত্রির অন্ধকারে সেই মাছ চুরির রোমাঞ্চকর ইতিহাস, তালসোনা-পুরের দেবদাস এবং আমবাগানের ভিতরে তার ক্ষুদ্র সংসার, অন্নদা-দিদির স্বেচ্ছাকৃত বনবাস, চারিদিকে পরাজয়ের গ্লানির ভিতরে বিজয়-গৌরবে বিজয়া, নিঃসম্পর্ক অনাথ ভাই কেষ্টকে নিয়া বিব্রতা মেজদিদির চিরকল্যাণবুদ্ধি, সমাজের অকল্যাণের মধ্যে জ্যাঠাইমার অপূর্ব কল্যাণ, রমার নীরব আত্মদান, রমেশের প্রাণ—সকলই আমরা চিনি, যেন কত দিনের একটা যোগাযোগ ইহাদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের। তাই ইহাদের সকলকেই আমরা একান্ত আপন করিয়াই ভাবি। এমনকি ম্যালেরিয়ার ডিপো হরিপালের পোড়াকাঠকেও আমরা দূরে রাখিয়া দেখিতে পারিনা। জীবনের নানা অভাবের পীড়নে জর্জরিত, এই নারীর রূপহীনতা বিবেচনা না করিলেও তাহার রুচিহীনতা আমাদের হৃদয়ে সহানুভূতি সৃষ্টি করেনা, একথা খুবই সত্য। তবু ইহারই অন্তরালে কোমল সহিষ্ণু পরহিতব্রতী হৃদয়ের যে করুণ-পরিচয় তাহা আমাদের খুব দূরের বলিয়া মনে হয় না। রাসবিহারীর কূটবুদ্ধিপূর্ণ স্বার্থপরতা, বিলাসের সহানুভূতিহীন একগুঁয়েমি, রমার মাসীর জিহ্বার অকারণ বিষ উদ্গীরণ আমরা দেখি এবং হৃদয়ের কোমল অংশে ইহাদের স্থান দিতে কুণ্ঠিত হই। ইহাদের আপন আপন বুদ্ধিব্যবহার আমাদের অন্তরে সাহারারই সৃষ্টি করে, তার কোন স্থানে ইহাদের জন্য সহানুভূতির সামান্য বাষ্পটুকুও সঞ্চিত হইবার অবকাশ পায়না। কিন্তু তবুও মনে হয় ইহারাঁও আমাদের অপরিচিত নয়, চলার পথে ইহাদের প্রত্যেকটি গতিভঙ্গী, প্রত্যেকটি

পদক্ষেপের সঙ্গে পরিচয় যেন আমাদের শুধু এ জীবনের নয়, জন্ম জন্মা--ন্তরের, তাই ইহাদের কাহারও বিচার আমরা করিনা। যাহাকে ভাল-বাসি তাহাকে ভালইবাসি। তাহার লাঞ্ছনায় ব্যথিত হই। আর যাহার জীবন আর একজনের জীবনের দুঃখের কারণ, তাহাকে না চাহিলেও তাহার সাহিত্যিক প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক বাস্তবতা আমরা অনুভব করি। ভাল না বাসিলেও সমাজে তাহার স্থান সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন প্রশ্ন আসেনা। আমরা দেখি সমাজে এক শ্রেণী দুঃখ পায়, আর অন্য একদল লোক এই দুঃখের কারণ। তাই সাহিত্যে ইহাদের কাহাকেও আমরা অস্বীকার করিতে পারিনা। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে এই দুই শ্রেণীরই বাহিরে অচলা। শরৎ-সাহিত্যের সাধারণ মাপকাঠি দিয়া ইহাকে পরীক্ষা করা চলে না, আমরা অন্নদাদিদিকে দেখিয়াছি, পার্বতীকে দেখিয়াছি, বড়দিদিকে দেখিয়াছি। আমাদের আত্মীয়তা, আমাদের ভালবাসার উপরই ইহাদের অস্তিত্ব। আর রাসবিহারী, বিলাসবিহারী প্রভৃতি ইহাদের জীবনকেই অবলম্বন করিয়া আমাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। কিন্তু একমাত্র অচলাকেই দেখি আমাদের সহানুভূতিকে সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষা করিয়া আমাদের নিন্দা-গ্লানির প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন সাহিত্যিক অস্তিত্বের আবরণ সকলের সমক্ষে উন্মুক্ত করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জা সে অনুভব করে না। অচলার প্রতি আমরা সহানুভূতি সম্পন্ন হইতে পারি না। শরৎচন্দ্রও বোধহয় আমাদের সহানুভূতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অচলার চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই। মনে হয় শরৎচন্দ্রের অন্তরে অচলা যেদিন প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ভবিষ্যৎ পাঠকগোষ্ঠীর প্রতি সে ছিল একান্তই নিরপেক্ষ। সাহিত্যিক সমাজ এই নবজাত প্রবীণ শিশুকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। কাঠে কাঠে ঘর্ষণে আগুন জন্মে, মেঘে মেঘে ঘর্ষণে বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠে। আর অনন্ত ধ্বংসের বীজ এই আগুন ও বিদ্যুৎ। কিন্তু আগুন ও বিদ্যুৎ যে ধ্বংসবাহী তার জন্য দায়ী কে? দায়ী—যে আবেষ্টন ও প্রতিবেশ তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছে সে। আগুন ও বিদ্যুৎ-এর স্বভাব সে ধ্বংস করিবে,

সে যে জল নয় সে তাহার দোষ নয়। শরৎচন্দ্র দেখিয়াছিলেন, এক বিশেষ প্রতিবেশের মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট ঘটনার সমাবেশে অচলা চরিত্র গৃহদাহের আগুন সৃষ্টি করিবে। ইহার মধ্যে তাহার দোষ-গুণের বিচার নাই, ভালমন্দ দেখিবার অবকাশ নাই, তাই ইহার জন্য তাহাকে দায়ী করা চলেনা। ইহাই তাহার স্বভাব এবং এই স্বভাবকে সৃষ্টি করিয়াছে তাহার বিশিষ্ট প্রতিবেশ।

শরৎ-সাহিত্যে অচলা এক কঠিন প্রশ্ন। কমল চরিত্রে যাহা শেষ-প্রশ্ন তাহারই প্রথম অবতারণা আমরা দেখি অচলার জীবনে। নরনারীর পরস্পর আকর্ষণ চিরন্তন, ইহা ভালমন্দ বিচারনিরপেক্ষ। সমাজের সমস্ত আইন, সকল বিধিনিষেধের গণ্ডিবহির্ভূত—সমাজ যতক্ষণ ইহার ন্যায়সঙ্গত দাবী মানিয়া চলে ততক্ষণ সমাজের সঙ্গে ইহার কোন বিরোধ নাই কিন্তু শক্তিমদমত্ত সমাজ যখনই এই দাবীকে অস্বীকার করতে চায়, সেও আপন প্রাধান্য প্রমাণ করিতেই সমাজকে আঘাত করিয়া বসে। শরৎ-সাহিত্যে আমরা দেখি অচলাকে—তার একদিকে মহিম আর একদিকে সুরেশ, একদিকে নির্বিকার উদাসীনতা, আর একদিকে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা, একদিকে নীরব তপোময় জীবন, আর একদিকে রাসহীন উন্মত্ত পুরুষত্ব, মাঝখানে অচলা Eternal Eve, উভয়কেই সমানভাবে আকর্ষণ করিতেছে এবং উভয় দিক হইতেই সমানভাবে আকৃষ্ট হইতেছে। এই দুই দিকের আকর্ষণে অচলা গতিশক্তিহীন। সে সত্যই অচলা, তার আপনার চলিবার কোন পথ নাই। সে কখনো বা মহিমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছে, আবার কখনো বা সুরেশের পদচিহ্ন তাহাকে চলার গতি দিয়াছে। জীবনে নানা ঘটনার ও উৎপাতের মধ্যে মহিমের আকর্ষণ শিথিল হইলে সুরেশের দিকে এবং সুরেশের আকর্ষণ শিথিল হইলে মহিমের দিকেই তাহাকে আমরা অগ্রসর হইতে দেখি। মহিম ছিল তাহার নিকট সন্ধ্যার আঁধার। সে উদাসীন, তাই অচলা তাহাকে জয় করিতে চাহিয়াছিল, আপনার সমস্ত কিছুর পরিবর্তে তাহারই আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিল, আর সুরেশ উন্মত্ত বেগে অচলাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। অচলা সে বেগ সহ্য করিতে পারে নাই, আপন দুর্বলতা অনুভব

করিয়াছিল। সুরেশের জন্য তাহার মহিমের মত শ্রদ্ধা ছিলনা এবং এই শ্রদ্ধাহীন আকর্ষণকে যথার্থ ভালবাসা বলা চলে না। তবুও যে সুরেশ অচলাকে আপন ইচ্ছামত তাহার মঙ্গলের বিরুদ্ধে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার কারণ সে অচলার স্বাভাবিক নারীহৃদয়কে চিনিয়াছিল এবং তাহার স্বাভাবিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল। আইন তাহাকে না মানিতে পারে, সমাজের রক্তচক্ষুকে সব সময়ে উপেক্ষা করিবার শক্তি তার নাও থাকিতে পারে তবুও সুরেশের এই আকর্ষণ অচলার হৃদয়ের পক্ষে বাস্তবের অপেক্ষাও কঠিন সত্য। মহিমের আকাশের মত উদারতাকে উপেক্ষা করিতে না পারাও অচলার হৃদয়ের পক্ষে যেমন সত্য, সুরেশের বিরাট আবেগ ও আকর্ষণের নিকট আত্মসমর্পণও তাহার পক্ষে তেমনি সত্য। তাই মনে হয় অচলাকে সৃষ্টি করিতে গিয়া শরৎচন্দ্র মানবহৃদয়ের এক গভীর সত্যেরই উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। দুই বিরাট বিপরীত শক্তির আঘাত ও আকর্ষণে অচলা আহত ও তাড়িত হইয়াছে ক্রমাগত এবং তাহারই ফলশ্রুতি গৃহদাহ। আর সেই গৃহদাহে কেবল রাজপুরের একখানি মেটে ঘর বা মহিমের সর্বস্বই ভস্ম হয় নাই, ভস্ম হইয়াছিল তাহাতে অচলার সর্বস্বও। অচলার গহনার বাক্স উদ্ধার করিয়াই মহিম মনে করিয়াছিল অচলার প্রতি তাহার কর্তব্য শেষ হইল। কিন্তু ভুল করিয়াছিল সে, অচলার যথাসর্বস্ব গহনার বাক্সে ছিল না, সে ছিল অন্যত্র। তাহাকেও উদ্ধার করিতে পারিত মহিমই কিন্তু সে তাহা করে নাই। সে মনে করিয়াছিল, তাহারই গৃহ দগ্ধ করিয়া আগুন সেদিন নিভিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেদিন সে জানিতে পারে নাই নিভিয়া যাওয়া দূরে থাকুক আগুনের দহনশক্তি তখনও একটুও কমে নাই আর অচলার জীবন, অচলার অতীত, অচলার ভবিষ্যতকে দগ্ধ না করিয়া সে আগুন নিভিবে না। ইহারই জন্য গৃহদাহে অচলা যথাসর্বস্বহীন। তাই অন্নদাদিদি, বড়দিদি, রমা, পার্বতীর ন্যায় তাহাকে আমরা সহানুভূতির চোখে না দেখিতে পারিলেও তাহার অস্তিত্বকে উপেক্ষা করায়,

তাহাকে ঘৃণা করিবার সাধ্য আমাদের নাই। সমস্ত শরৎ-সাহিত্যে অচলা অতুলনীয়। অচলা একটি কঠিন প্রশ্ন। বিধিবদ্ধ সমাজ-গণ্ডীর মধ্যে আমরা অচলাকে খুঁজিয়া পাইনা, অচলা সেখানে সত্যই অচলা। তাই মনে হয়, এই নামকরণও শরৎচন্দ্র সমাজের মুখ চাহিয়াই করিয়াছেন। কিন্তু অচলা মরেনা! সমাজ না চাহিলেও চিরদিনই হৃদয়ে হৃদয়ে সে বাঁচিয়া থাকিবে। তাই শরৎ-প্রতিভার একদিকের দান অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, মৃণাল প্রভৃতি আর একদিকের দান এই অচলা। অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মীকে সমাজ চায় না, তাই সে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারে, যখনই ইচ্ছা ইহাদিগকে নির্বাসন দিতে পারে। অন্নদাদিদি কিম্বা রাজলক্ষ্মীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে সমাজের লাভ ক্ষতি কিছুই নাই; কিন্তু অচলা সম্বন্ধে ঠিক একথা বলা চলে না। অচলা সমাজে অচলা হইতে পারে, সমাজ তাহাকে কামনা না করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারেনা। সমাজ যত শক্তিমান হউক না কেন, অচলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ক্ষমতা তাহার নাই।

আমরা অভয়াকে দেখিয়াছি—আপন শক্তিতে সে সমাজকে উপেক্ষা করিয়াছিল। কিরণময়ীকে দেখিয়াছি শক্তির উগ্রতায় সে সমাজকে উপহাস করিয়াছিল। কমলকে দেখিয়াছি, শক্তি তার বর্তমান সমাজের ধ্বংসের উপর সে ভবিষ্যৎ সমাজ গড়িতে চায় কিন্তু অচলা ইহাদের কাহারও সঙ্গেই মিলিতে পারেনা। সমাজকে উপেক্ষা করিবার, উপহাস করিবার শক্তি অচলার নাই। সমাজের অনুশাসন মানিয়া সমাজের মধ্যেই সে থাকিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার আপন হৃদয় তাহাকে এক উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছিল। আবেষ্টনী সুযোগ বুঝিয়া আসিয়া তাহারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিল। ফলে অচলাকে সমাজ, স্বামী, পিতা, গৃহ সকলই ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। আপন ভবিষ্যৎ সে মহিমের সঙ্গেই মিলাইয়া লইতে চাহিয়াছিল। কলিকাতার আড়ম্বরপূর্ণ জীবন অপেক্ষা রাজপুরের উত্তরপাড়ার মেটে ঘরের প্রতিই

ছিল তার বেশী আকর্ষণ। সে ছিল সেই রাজপুরের মেটে ঘরের স্বপ্নে বিভোর, এমনি সময়ে তাহার জীবনে সহসা প্রবল ভূমিকম্পের মত আসিল সুরেশ। প্রবল আঘাতে অচলার সুস্থির ভবিষ্যতের সুদৃঢ় ভিত্তির সমস্ত গাঁথুনিই কাঁপিয়া উঠিল। অচলার জীবনে সে ভূমিকম্প একদিনে শেষ হইল না, ধূমকেতুর মতই সে তাহার পিছনে লাগিয়া রহিল। এক বিরাট বিপ্লবের মধ্যে তাহাকে টানিয়া নিয়া তাহার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সমস্তই মুছিয়া একাকার করিয়া দিল। আপনার জীবনের গতিপথ হইতে এই ধূমকেতুকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা অচলা যে করে নাই তাহা নয়। মহিমের প্রতি তাহার আপন মনোভাব একান্ত অনাড়ম্বরভাবেই সুরেশকে জানাইয়া দিয়াছিল। অচলা সুস্পষ্ট ভাষায় সুরেশকে জানাইয়া দিয়াছিল, তাহার সঙ্গে জীবনে মিলনের সম্ভাবনা অচলার নাই। অচলার মুখের এ উক্তির মধ্যে সেদিন দ্বিধা সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। তাই সে স্থির করিতে পারিয়াছিল, মহিমকে ফিরিয়া পাইবার সমস্ত আশা যদি লুপ্ত হইয়া যায় তবুও মহিমের আসনে সুরেশকে চিন্তা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। এইজন্য সে একথা সুরেশকে এমনি দৃঢ়তা সহকারে জানাইয়া দিতে পারিয়াছিল। কিন্তু শত্রুতা সাধন করিল তাহার প্রতিবেশ। পিতার ঋণ, পিতার ইচ্ছা, সুরেশের ঐশ্বর্য, মহিমের সাগরের গাম্ভীর্য ও বাহ্যিক উদাসীনতা—একসঙ্গে তাহার বিরুদ্ধচারণ করিতে লাগিল। অচলা সুরেশের মুখে পিতৃঋণ পরিশোধের কথা শুনিয়াছিল কিন্তু হাত পাতিয়া সুরেশের দেওয়া অর্থ গ্রহণ করিতে সে অস্বীকার করিয়াছিল। বিপন্ন পিতার কাতর করুণ আঁখি এবং বিষণ্ণ মুখকে যে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। ইহার পরিণাম কি অচলা যে সেদিন বুঝে নাই তাহা নয়। ইহাকে অবলম্বন করিয়া এবং এই পিতৃঋণ পরিশোধের মধ্যে দিয়াই সুরেশ যে তাহার জীবনে দৃঢ় ভাবে আসন পাতিয়া বসিল অচলা ইহা ঠিকই সেদিন বুঝিয়াছিল। কিন্তু তাহার উপায় ছিলনা, তাহার দুর্বলতা ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিকারই

খুঁজিয়া পায় নাই। এই সময়ে তাহার একান্ত প্রয়োজন ছিল মহিমকে। আপনাকে সুস্থ, সুদৃঢ় রাখিতে যে শক্তির প্রয়োজন ছিল তাহা তাহাকে দিতে পারিত মহিম। মহিম একবার সম্মুখে দাঁড়ালেই হইত। অচলার সমস্ত দুর্বলতা, সমস্ত দ্বিধা শরতের মেঘের মতই দূর হইয়া যাইত। কিন্তু অচলার জীবনের অতি বড় প্রয়োজনীয় মুহূর্তেও মহিম তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। আপন পর্বতের উচ্চতা ও সাগরের গভীরতা এবং ক্ষমার বিপুল গৌরব নিয়া সে দূরেই দাঁড়াইয়া রহিল, হাত বাড়াইয়াও অচলা তাহার নাগাল পাইল না। অচলার জীবনে সর্বাপেক্ষা অনিষ্ট করিয়াছে মহিমের এই নির্লিপ্ত নীরব উদাসীনতা। ভূমিকম্পের প্রচণ্ড পীড়নে অচলা যখন কাঁপিতেছিল, কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছিল না, মহিমের কর্তব্য ছিল আপন সক্ষম হাতখানি বাড়াইয়া দেওয়া। কিন্তু মহিম আপন কর্তব্য করে নাই। ক্ষমা ও উদারতার ব্যর্থ আড়ম্বরের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অচলাকে সে গৃহদাহের পথেই তিলে তিলে অগ্রসর হইতে দেখিতেছিল। মহিমের হাতখানি যে অচলার কতবড় আশ্রয় ইহা আমাদের অজ্ঞাত নয়, ইহার সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা একদিন পাইয়াছি। ভূমিকম্পের প্রচণ্ড পীড়ন তখন শেষ হইয়াছে কিন্তু অচলার উপর হইতে তাহার শেষ চিহ্ন তখনও মুছিয়া যায় নাই। মাঝুলি হইতে ফিরিবার সময়ে অচলা উঠিতে গিয়া পা টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়াই মহিম আপন হাতখানি তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়াছিল। আর আপনার একান্ত অধিকারে চিরবঞ্চিত অচলাও সেই হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছিল, ধরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহিম হাত বাড়াইয়াছিল, সে কিছু ভাবিয়া দেখিবার সময় পায় নাই। কিন্তু অচলা হাতখানি ধরিয়া ফেলিতেই অতীত ভবিষ্যৎ আসিয়া তাহাব সমস্ত অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া বসিল।

নিজের হাত অচলার হাতের মধ্যে দেখিয়া মহিম ঘৃণায় লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই এই হাতখানি পুনরায় টানিয়া লইবার চেষ্টাই সে করিয়াছিল। শরৎচন্দ্র আমাদের জানাইয়াছেন,

মহিম অচলাকে দুর্বল দেখিয়া বলিয়াছিল, "আজ না হয় থাক" কিন্তু আমরা জানি একমাত্র অচলার দুর্বলতাই মহিমকে একথা বলিতে প্রণোদিত করে নাই। অচলার জীবনের প্রতি একটা তীব্র ঘৃণার প্রকাশও ইহার মধ্যে ছিল। কিন্তু মহিম হাত ছাড়াইতে চাহিলেও অচলা হাত ছাড়ে নাই। আজ এত দিন পরে আপনার একমাত্র অবলম্বন সে পাইয়াছে, তাই সে শুধু মাথা নাড়িয়া কহিল, —না চল। আর আমি দুর্বল নই, তোমার হাত ধরে যতদূর যেতে বল, যেতে পারব। আপনার অতি দুর্বল মুহূর্তে এই হাতখানির কত প্রয়োজন সে অনুভব করিয়াছে। কতবার ইহাকে ধরিবার জন্য আকুল আগ্রহে হাত বাড়াইয়াছে, কিন্তু কখনো পায় নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি এ অপরাধ কাহার? এজন্য দোষী কে? মহিম না অচলা? অচলা ত প্রথমেই সাবধান করিয়া বলিয়াছিল—তুমি কি তোমার কসাই বন্ধুর হাতে জবাই হবার জন্য আমাকে রেখে গেলে? যে তোমার উপর এত কৃতঘ্ন হতে পারলে তার হাতে আমাকে ফেলে যাবে কি বলে? আমরা জানি ইহাই অচলার যথার্থ পরিচয়। ইহার পর ঘটনার পর ঘটনা আসিয়া জীবনে তাহার মেঘের পর মেঘ ঢালিয়া দিল। তাহার তীব্র কালিমা ভেদ করিয়া অচলার যথার্থ স্বরূপ ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ আর কখনো পায় নাই। অচলা বুঝিয়াছিল তাহার লজ্জা করিবার সময় নাই। তাই মহিমের দক্ষিণ হস্ত টানিয়া লইয়া নিজের আঙ্গুল হইতে সোনার আংটিটা খুলিয়া তাহার আঙ্গুলে পরাইয়া দিতে দিতে বলিয়াছিল—আমি আর ভাবতে পারিনে। এবার যা করবার তুমি করো। অচলা নিজের সমস্ত ভাবনা চিন্তার ভার মহিমের উপর দিয়া তাহারই আড়ালে আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। দুঃখে সুখে, আপদে বিপদে, ঝড়ঝঞ্ঝায় সে মহিমকে অবলম্বন পাইবে ভাবিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল মহিমের শক্তি আছে তাই সে সেই শক্তির পশ্চাতেই গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অচলা বুঝিয়াছিল, সে নিজে দুর্বল, তাই এ শক্তির প্রয়োজনও তাহার ছিল একান্তভাবেই। আমরা দেখি, মহিম ধীর, মহিম শান্ত, মহিম উদার,

মহিম শক্তিশালী কিন্তু অচলার জীবনের একান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তেও সে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল না, গৃহদাহের সমস্ত সম্ভাবনা দেখিয়াও দূরেই দাঁড়াইয়া রহিল। মহিম তাহার বিরাট ও মহৎ ক্ষমার গৌরব নিয়াই ব্যস্ত ছিল আর সেই সুযোগ নিয়াই একটি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আসিয়া রাজপুরের মেটে ঘরের কোণে দেখা দিয়াছিল। সে অগ্নিকণা যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন মহিমের দৃষ্টি এড়ায় নাই, সে আগুন বর্ধিত হইয়া একদিন বিরাট দাবানলের সৃষ্টির সম্ভাবনা রাখে ইহাও সে জানিত। কিন্তু তবুও সে যে প্রতিকারের কোন উপায় অনুসন্ধান করে নাই, তার কারণ ইহা ছিল তাহার আত্ম-নিগ্রহের গৌরব। এই গৃহদাহের দহন মহিমকেও স্পর্শ করিতে ছাড়ে নাই। প্রকাশ যত সামান্যই হউক না কেন, তাহার তীব্রতা মহিমের জন্য বিপুল দুঃখই বহন করিয়া আনিয়াছিল, আর তাহারই জন্য আত্মপ্রকাশে সে ছিল কুণ্ঠিত। কিন্তু সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়াই বুঝি মহিমের দৃষ্টি ছিল আত্মকেন্দ্রীভূত। গৃহদাহের সমস্ত দুঃখটাকে সে কেবল আপনার জন্যই চিন্তা করিয়াছিল। অচলার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কত বড় সর্বনাশ সে সাধন করিবে, ইহা সে ভাবিতে পারে নাই ; তাহা না হইলে এইভাবে নির্লিপ্ত নির্বিকার উদাসীন থাকা তাহার পক্ষে হয়ত সম্ভব হইত না।

গৃহদাহ করিয়াছিল অচলা কিন্তু ইহার পশ্চাতে আমরা দেখি মহিমের চরিত্রের আরও একটা দোষ। অচলা ও মহিমের মিলিত জীবনে সংশয় সন্দেহের অবকাশ ছিল সে জন্য তাহার দায়িত্ব ও কম নয়। মহিম তাহার সুখদুঃখের অংশ কোনদিন কাহাকেও দেয় নাই। পাঠ্য জীবনে সুরেশ বন্ধুর দুঃখের অংশ দিতে চাহিয়াছে কিন্তু মহিম কৃপণের ধনের মতই তাহাকে অন্যের স্পর্শ হইতে আগলাইয়া রাখিয়াছে। সুরেশের মুখেই আমরা শুনি—"তার কি প্রয়োজন কখনো সে বলেনা। তার সুখদুঃখ ভালমন্দ সমস্তই তার একার, স্বার্থপর। কখনো কাউকে ভাগ দিলেনা", কথাগুলি যে একমাত্র সুরেশের পক্ষেই সত্য তাহা নয়, অচলার দিক দিয়া বিচার করিলেও

ইহা সমান ভাবেই সত্য। কেদারবাবুর স্বার্থপরতা, সুরেশের অকৃতজ্ঞতা যখন তীব্রভাবে মহিমকে বিদ্ধ করিতেছিল অচলাই তখন অগ্রসর হইয়াছিল আপন ব্যথিত হৃদয়ের সমস্ত সান্ত্বনা লইয়া। গরমে মহিমের চা সহ্য হয় না তাহা মহিমের অপেক্ষা অচলাই ভাল জানে, একথা সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিতে সে একটুও লজ্জিত হয় নাই। সুরেশকে সে জানাইয়া দিয়াছিল, মহিমের ওকালতির কেতাবের মধ্যে প্লেগের চিকিৎসা নাই; সুস্পষ্ট ভাষায় তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, যাহাকে এক সময়ে বাঁচানো যায় আর এক সময় ইচ্ছা করিলেই তাহাকে খুন করা যায় না। মহিমের যথাসর্বস্ব আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গেলে অচলা ব্যথিত স্বামীকে নিকটে টানিতে চাহিয়াছিল। আপন হৃদয়ের সমস্ত সান্ত্বনা দিয়া সে তাহার ব্যথার স্থান ভরিয়া দিতে চাহিয়াছিল। মহিমকে সে জানাইয়াছিল, লাভ লোকসান দেখবার ভার আজ থেকে আমি নেব। অচলা ঠিকই বুঝিয়াছিল। মহিমের শুভানুধ্যায়ী গ্রামে বেশী নাই। তাই সে এমন দৃঢ়তাসহকারে বলিয়া পাঠাইয়াছিল, "আমার গলায় ছুরি দিলেও এখানে একলা রেখে তোমাকে, আমি যেতে পারব না।" কিন্তু মহিমের নিকট এ আকুল আবেদন কোন কাজেই আসিল না। আপন নির্মম উদাসীনতার কঠিন বর্মকে ইহা দ্বারা সে বিদ্ধ হইতে দিলনা। অচলার গহনার বাক্স কেবল তাহারই সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রহিয়া গেল। অচলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "পৃথিবীতে স্বামী কি কেবল তুমি একটি? দুঃসময়ে তারা নেন কি কোরে? স্ত্রীর গহনা থাকে কি জন্য?" কিন্তু তবুও মহিমের দুঃসময় তাহার একান্ত আপনার হইয়া রহিল, অচলা তাহার কোন অংশই পাইলনা, অতি দুঃসময়েও সে স্বামীর ব্যথার নিকট পৌঁছিতে পারিলনা। মহিম অন্য দশজনের মত অচলাকে দূরে রাখিয়াছিল, তাহার মুখের কথাকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল; স্বামী হইয়াও তাহার হৃদয় দেখিতে পায় নাই, দেখিবার চেষ্টাও করে নাই সেখানে কত বড় একটা আকুলি বিকুলি চলিতেছিল। আপনাকে মহিমের পাশে সুস্থির

দেখিবার জন্য বেদনাতুর হৃদয়ের যে বিরাট সংগ্রাম চলিতেছিল, মহিম তাহা দেখিতে পায় নাই ; তাই অমন করিয়া সে অচলাকে পরাজয়ের খাদেই ঠেলিয়া দিয়াছিল।

অচলার জীবনের দিক দিয়া বিচার করিলে মহিমের অপরাধের এখানেই শেষ নয়, অচলাকে সে তাহার আজন্মের সমাজ হইতে টানিয়া আনিয়া রাজপুরের মেটে বাড়ীর নিরানন্দ নির্জন কক্ষে স্থাপন করিয়াছিল। নববধূর অভ্যর্থনার ঘটা, পল্লীবাসিনীদের অস্ফুট কলরবে সুমিষ্ট ইঙ্গিত, অচলার বিবাহিত জীবনের সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত স্বাদগন্ধ অন্তর্হিত করিয়া দিয়াছিল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "ছাপার অক্ষরের ভিতর দিয়া পল্লীগ্রামের অপরূপ কবিত্বের সঙ্গে অচলার পরিচয় ছিল, তাই স্বামীর দারিদ্র্যকেও সে কল্পনার মাধুর্য দিয়া মণ্ডিত করিয়া দেখিয়াছিল কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয়ে তাহার যে ছবি সে দেখিল তাহার মধ্যে কোন আকর্ষণই খুঁজিয়া পাইলনা"। মহিমের উচিত ছিল অচলার এই অবস্থাকে বুঝিতে পারা, অচলার প্রতি আপন সহানুভূতির ভিতর দিয়া পল্লীসমাজের প্রতি অচলার সহানুভূতি সৃষ্টি করা। কিন্তু নারীর প্রতি উদাসীনতার গৌরব মহিমকে নিশ্চেষ্ট করিয়াই রাখিয়াছিল। একমাত্র গভীর দুঃখ নীরবে নতমুখে সহ্য করা ভিন্ন অন্য কিছুই ইহা তাহাকে করিতে দেয় নাই। প্রতিকারের উপায় তাহার কাছেই ছিল কিন্তু মহিম দুঃখকেই গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। এই অবসরেই অচলা তিলে তিলে পল্লীসমাজের প্রতি, পল্লীর নিরানন্দ জীবনের প্রতি সহানুভূতি হারাইয়াছিল এবং ইহারই ফলে অতি বড় ভুলকেই সে সত্য বলিয়া মানিয়া লইল। সে স্থির করিয়া ফেলিল—স্বামীকে সে ভালবাসেনা, ভুল করিয়াই সে বিবাহ করিয়াছে। ইহা যে কত বড় ভুল তাহা সে যখন টের পাইল তখন প্রতিকারের উপায় তাহার নিকট হইতে বহু দূরে। অচলার এই ভুলের জন্য দায়ী মহিম নিজে এবং ইহার প্রতিকারও ছিল তাহার নিকটেই।

মহিম বুঝিয়াছিল অচলা যে পথে চলিতেছে তাহা ভুলপথ। এবং সুরেশ যে পথে চলিতেছে তাহা অন্যায়ের পথ, কিন্তু কোন সময়েই সে তাহাদের কাহারও পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় নাই। মহিমের পথ ছিল এখানে "ঘরে বাইরে"র নিখিলেশের পথ। অচলা এবং সুরেশ উভয়কেই সে আপন বিবেকচালিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত দেখিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও মহিম সুরেশকে ভুল বুঝিয়াছিল। সুরেশের ছিল উন্মত্ত আবেগ, বিবেক-পরিচালিত হইয়া সে কোন দিন কোন কাজ করে নাই। গঙ্গার ঘাটে যেদিন সে মহিমকে উদ্ধার করিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে বসিয়াছিল সেদিনও সে ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া এ কাজ করে নাই. আর অচলার জীবনে বিরাট বিপ্লব সে যেদিন সৃষ্টি করিল তখনও তাহার ভাবনা চিন্তার সময় ছিল না। তাই আপন সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াই সে অচলাকে টানিতেছিল। সে যেন অচলার নিকট এক বিরাট ভূমিকম্প। অচলার অন্তর বাহির কাঁপাইয়া দিয়া সে আসিয়া উপস্থিত হইত। সেই বিরাট অশান্তিকে অস্বীকার করিবার শক্তি অচলার ছিলনা। ঝড়ের মত সে আসিত, আপন দুর্দান্ত, দুঃসহ তেজে সে অচলার অস্তিত্বের সমস্ত ভিত্তিকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিত এবং তাহারই ভিতর দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়া উন্মত্ত আবেগে দুর্বলা এবং লুণ্ঠিতা অচলাকে যে-পথে টানিয়া নিয়া চলিত তাহা স্বর্গের পথ কি নরকের পথ তাহা ভাবিয়া দেখিবার উপায়ও অচলার ছিল না। সেই বিরাট বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া অসহায়া নারী দিশেহারা হইয়া অতল তলেই ডুবিয়া যাইত। এই অবস্থায়ই তাহার প্রয়োজন ছিল মহিমকে। কিন্তু মহিম কোনদিনই তাহার এই প্রয়োজনকে বুঝে নাই। বিপন্ন হৃদয়ের এই আকুলি বিকুলিকে সে কোনদিন দেখিতে পায় নাই।

ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই গৃহদাহের জন্য বেশী দায়ী অচলার আপন অন্তরের দুর্বলতা। সুরেশের মধ্যে উন্মত্ত আবেগ ছিল কিন্তু অচলাই তাহাকে বাহিরে আনিয়াছে। অচলার এই

দুর্বলতাই সাগরের বুকে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়াছে। পিতার ইচ্ছাকে অচলা উপেক্ষা করিয়াছিল, ইহার ভিতরে সে স্বার্থত্যাগের মহান চিত্রই দেখিয়াছিল। সুরেশের ঐশ্বর্য না চাহিতেই তাহার নিকটে আসিয়াছিল তাই তাহাকে উপেক্ষা করিয়া সে মহিমের উদাসীনতাকেই জয় করিতে চাহিয়াছিল। অচলা বুঝিয়াছিল সুরেশের যাহা কিছু সমস্তই সে হাত বাড়াইলেই পাইতে পারে, কিন্তু মহিমের কঠিন বর্ম ভেদ করা তত সহজ নয়। তাই তাহার তূণীরের সমস্ত অস্ত্রই সে প্রয়োগ করিয়াছিল মহিমকে জয় করিতে; তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল তার মহিম। কিন্তু তাই বলিয়া সুরেশকে নির্মমভাবে বিদায় দিবার মত কঠিনও সে কখনও হইতে পারে নাই। সুরেশ তাহার দুর্বলতার পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়াছে। সুরেশকে সে শান্ত দৃঢ় অথচ অবিচলিত স্বরেই জানাইয়া দিয়াছিল, কোনক্রমেই অচলার জীবনে মহিমের আসনে তাহার বসা সম্ভব নয় কিন্তু তাহার পরেই সুরেশ যখন চলিয়া গেল, শরৎচন্দ্র জানাইয়াছেন, নিতান্ত অকারণেই তাহার দুই চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। "নিতান্ত অকারণেই", ইহা বলিয়াছেন শরৎচন্দ্র কিন্তু আমরা জানি, শরৎচন্দ্র যাহাকে অকারণেই মনে করিয়াছেন তাহার পশ্চাতেই যে কারণ ছিল তাহা নিতান্ত সামান্য নয়। আপন অন্তর হইতে ইহাকেই ঝাড়িয়া ফেলিবার ব্যর্থ চেষ্টার পুঞ্জীভূত গ্লানি অচলার আপন জীবনকেই তিক্ত করিয়াছিল। জীবনে একদিনের জন্যও ইহা তাহাকে স্থির হইয়া বসিতে দেয় নাই। অচলার দুর্বলতা আমরা আরও দেখি। পিতাকে সে জানাইয়াছিল, "না বাবা, দিনরাত্রি এত পীড়ন আর আমি সহ্য করতে পারিনে। যা একেবারে অসম্ভব তা প্রাণ থাকতে স্বীকার করা আমার একেবারে যো নাই, তাই নিয়ে তোমরা আমাকে অহর্নিশি বিঁধচ।" অচলার এই মনোভাবকে কোন মতেই অনিশ্চিত বলা চলে না। সুরেশের ঐশ্বর্যের প্রতি বৃদ্ধের দুর্বলতার যোগ্য উত্তরই সে এখানে দিয়াছে। কিন্তু সেই সুরেশই ফয়জাদাবাদ হইতে যখন আত্মত্যাগের উজ্জ্বল

ছাপ লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পিঠের ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতে দিতে অচলার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু এই নয়। গোপন অশ্রু তাহার কোন গোপনতাই মানিল না। শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন, "অশ্রু তাহার মুক্তার আকারে একটির পর একটি নীরবে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মহিম যখন জরুরী প্রয়োজনে রাজপুরের পল্লীতে, কেদারবাবুর অনুগ্রহে সুরেশ তখন ভাবী ধনী জামাতার সমস্ত সুখ সৌভাগ্যই উপভোগ করিতেছিল। আমরা জানি, মহিমের অদর্শনের প্রত্যেকটি দিন অচলা ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় গনিতেছিল। সুরেশকে সে জানাইয়াছিল, আজ নিয়ে উনিশ দিন। কিন্তু আপন অনভিপ্রেত ভবিষ্যতের প্রতি তীব্র বিক্ষোভও তাহার ছিলনা। আত্মসমর্পণই তাহার একমাত্র পথ, তা সে-পথ বাঞ্ছিতই হউক বা অবাঞ্ছিতই হউক। সুরেশকে বলিয়াছিল, একখানা চিঠিতে তাঁকে সমস্ত কথা জানানো বাবার উচিত। হঠাৎ কোন দিন আবার না এসে উপস্থিত হন।" ইহার মধ্যে অচলার ভবিষ্যৎ জীবনের নিরানন্দের সুর বাজে, দৃঢ়তার সুর নয়। এইখানেই অচলার দুর্বলতা। তার সমস্ত ব্যর্থতার জন্য এই দুর্বলতাই দায়ী।

এই দুর্বলতাই অচলার একমাত্র পরিচয় নয়। তাহার পরিচয় পাইয়াছিল সুরেশের পিসী, পরিচয় পাইয়াছিল মৃণাল। তাহার অন্তরকে চিনিয়াছিলেন রামবাবু, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিল রাক্ষুসী। রাজপুর হইতে আসিবার পূর্বে সে স্বামীর সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়াছিল। সে তাহাকে ভালবাসে না বলিয়াছিল, কিন্তু তবু তাহাকেই রোগশয্যায় দেখিয়া অচলা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। পিতা উদ্বেগের সহিত তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু প্রত্যুত্তরে অচলা পিতার হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল, ঘুমোবার জন্য এখানে আসিনি বাবা, আমার কিছুই হয়নি, আমি ও ঘরে যাচ্ছি। ইহার ভিতরে মৃণালের প্রতি ঈর্ষা যে কতকটা ছিল আমরা জানি। কিন্তু মহিমের প্রতি আন্তরিক ভালবাসাই সে ঈর্ষার ভিত্তি। একদিন অচলা স্বামীর মঙ্গলের জন্য গহনা

দিতে চাহিয়াছিল, সেদিন মহিম তাহা নেয় নাই। কিন্তু সেই গহনা বিক্রয় করিয়াই অচলা স্বামীর বায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। পিসীমা তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হাতের নোয়া অক্ষয় হোক মা। স্বামীকে নীরোগ করে শীগ্‌গীর ফিরিয়ে এসো।" অচলা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিয়াছিল, এই আমার সব চেয়ে বড় আশীর্বাদ পিসীমা। অচলা সেদিন মিথ্যা কথা বলে নাই। সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহার মুখের এই কথা-গুলির ব্যর্থতা তাহাকেই ফিরিয়া আঘাত করিবে। পথের পরিচিত রাক্ষুসী তাহাকে বলিয়াছিল, "আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। এই আমি বলে যাচ্ছি, আপনার এতবড় ভক্তি ভালবাসাকে ভগবান কখনো বিমুখ করবেন না, এমন হতেই পারেনা।" রামবাবুর নিকট অচলা ছিল সুরমা-মা। আপন অন্তরের বিরাট বিপ্লবকে গোপন করিয়া সেখানে সে সুরমা-মার আসনকেই গৌরবান্বিত করিয়াছিল। অতি সন্তর্পণে সে সুরমার সম্মানকে রক্ষা করিয়াছে, কোন কারণেই কদর্যতার গভীর পাঁকে ডুবিতে দেয় নাই।

আমরা দেখি, অচলার দোটানা জীবন-স্রোত একদিনের জন্যও শান্ত হয় নাই, একদিনের জন্যও সে-নদীতে একটানা স্রোত বহিয়া তাহাকে ভাল হউক মন্দ হউক একটা সীমা-রেখায় পৌঁছিতে সাহায্য করে নাই। মাঝপথে বিরাট আবর্ত তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া তাহাকে এমন ভাবে দিশাহারা করিল যে কূলের সীমারেখার চিহ্ন পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। মহিম তাহাকে দেখাইয়াছিল স্থিরতার পথ কিন্তু ঘটনার পর ঘটনা আসিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া সে পথ হইতে তাহাকে দূরে সরাইয়া দিল। সুরেশ তাহাকে ডাকিয়াছিল তাহার আপন পথে। সেখানে অতলতলে পৌঁছিয়াও অচলার কূল হয়ত মিলিত কিন্তু অচলার আপন ভবিষ্যৎ তাহাকে কোথাও স্থির থাকিতে দেয় নাই। আবেষ্টনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আপনার ভাগ্য রচনা করিবার শক্তি অচলার ছিলনা। আপন দুর্বলতাই সর্বত্র তাহাকে পথ দেখাইত। তবু সুরেশের নিকট সে

আত্মসমর্পণ করিলনা কেন? প্রতিবেশ যখন তাহাকে কদর্যতার গভীর পঙ্কে নামাইয়া দিল, কেন সে সেই পঙ্কে একেবারেই ডুবিয়া গেলনা? ইহার কারণ অচলার দুর্বলতার পাশেই ছিল রামবাবুর সুরমা-মা, কেদারবাবুর কন্যা এবং সখী বীণাপাণির অচলা দিদি। রামবাবু ভুল বুঝিয়াছিলেন। সুরেশের প্রতি অচলার বিরূপ ভাবকে তিনি স্বামী-স্ত্রীর কলহই মনে করিয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহার স্বাভাবিক শুভেচ্ছা নিয়া পতি পত্নীর মিলনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে ছিলেন। কিন্তু ইহার ভিতরে আন্তরিকতার, অচলার প্রতি বৃদ্ধের আন্তরিক শুভেচ্ছা যতই অচলার নিকট স্পষ্ট হইল সুরেশের সহিত মিলনের কল্পনাও তাহার ততই অসম্ভব ও অসহ্য হইয়া পড়িল। অচলাকে ডিহিরিতে এই অবস্থায় দেখি—তার অতীত নাই, বর্তমান নাই, ভবিষ্যৎ নাই; যেদিকে তাকায় অন্ধকারের পর অন্ধকারের স্তর তাহার অন্তর বাহির অধিকার করিয়া আছে। এই সময়ে বীণাপাণিই হয়ত তাহার হৃদয়কে কতকটা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে বুঝিবার মত কোন আলোকই সেখানে সে দেখিতে পায় নাই। তাই সে একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে বসিয়া চুপি চুপি অচলাকে কহিয়াছিল, "ওপারের চরটার পানে চেয়ে চেয়ে আমার কি মনে হচ্ছিল জান দিদি? মনে হচ্ছিল যেন ঠিক তুমি, অন্ধকার দিয়ে ঘেরা একটুখানি —" শুনিয়া অচলা শিহরিয়া উঠিয়াছিল। জীবনে ইহা অপেক্ষা সত্য কথা সে কোনদিন শুনে নাই। তাহার জীবনে এই দৃষ্টিহীন অন্ধকারের কথা তাহার চেয়ে কে বেশী জানে? তবুও ডিহিরিতে সে ছিল সুরমা-মা এবং অচলাদিদি। জীবনের সমস্ত পরিহাসের পালা শেষ হইয়া গেলে, পরাজয়ের গভীর গর্তেই তার স্থান হবে। মাঝুলিতে মহিম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এখন তুমি কি করবে? অচলা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বসিয়াছিল—আমি ত ভেবে পাইনে। তুমি যা হুকুম করবে তাই করব। মহিম জানিতে চাহিয়াছিল, সে কেন হুকুম দিবে, আর অচলাই বা তা শুনিতে বাধ্য হইবে কিসের জন্য? অচলা উত্তর করিয়াছিল—তুমি ছাড়া আর যে কেউ নেই, কেউ ত

আমার সঙ্গে কথা কবে না। এই একান্ত নিরভিমান নিঃসঙ্কোচ উক্তির মধ্য দিয়া যে গভীর অসহায়তার সুরটি বাজিয়া উঠিল, তাহার ভিতর দিয়া অচলার জীবন-ইতিহাসের সমস্ত অধ্যায়গুলি আমাদের নিকট স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হইয়া গেল। আত্মসমর্পণের কোন চেষ্টা নাই, মহিমের উদাসীনতার সত্ত্বেও তাহার কোন দোষ দেখিল না। ইহাই অচলা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। অচলা নিজের কাছে নিজেই একদিন প্রশ্ন করিয়াছিল, যাহাকে কোনদিনই ভালবাসে নাই, সেই তাহার প্রাণাধিক, এই মিথ্যা কথাটা কি সবাই জানিয়া রাখিল? আর যাহা সত্য, সেকি কোথাও কাহারও কাছেই আশ্রয় পাইল না? আমরা তাহার এই অভিযোগের সবটুকু অনুমোদন করিনা, কারণ তাহার নিজের মুখেই শুনি, সুরেশকে সে একদিন বলিয়াছিল, একদিন তোমাকে ভালবাসতুম। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, সে ছিল ভূমিকম্পের আকর্ষণ। সময়মত মহিমের সাহায্য পাইলেই অচলা ইহার কবল হইতে উদ্ধার পাইত, আর সেই সাহায্যের অভাবেই অচলার পরিণতি গৃহদাহ।

অভয়া

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত একদিন বলিয়াছিল, "পতি সতীর একমাত্র দেবতা কিনা, এই বিষয়ে আমার মত ছাপার অক্ষরে ব্যক্ত করার দুঃসাহস আমার নাই, তাহার আবশ্যকতাও দেখিনা।" কিন্তু আমরা দেখি তবুও সে তাহার অন্নদাদিদিকে লইয়া গর্ব করিতে ছাড়ে নাই। সেই স্পর্শমণির স্পর্শেই তাহার অন্তরবাহির নাকি একেবারেই খাঁটি সোনা হইয়া গিয়াছে। গিল্টি করা রূপের প্রলোভনে কোনদিনই সে পড়িবেনা ইহা একাধিকবার জানাইয়াছে। আমরাও জানি, অন্নদাদিদি আজীবন দুঃখ সহ্য করিয়া গিয়াছেন, তবুও কাহারও বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগের একটি কথাও রাখিয়া যান নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে একটা আশাহীন, ভবিষ্যৎ শূন্য, পরম সহিষ্ণুতাই কি জীবনের চরম সার্থকতা? শ্রীকান্ত নিজেই কি সতীসাবিত্রী সমান তাহার অন্নদাদিদির জীবনের নীরব দুঃখময় পরিণতির বিরুদ্ধে ভগবানের নিকট অভিযোগ করে নাই? অন্নদাদিদি চিনিয়াছেন হিন্দু নারীর স্বামীকে এবং তাহার দেহাতীত রূপকে, তাই তাহাকেই তিনি ভালবাসিয়াছিলেন। সেইজন্য বাহির হইতে শাহজীর সঙ্গে জীবন মিলাইয়া নিতে তাহার কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নাই। তাহার দেওয়া অসহ্য দুঃখ তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তেই সহ্য করিতেছিলেন। তিনি জানিতেন, স্বামী হিন্দুনারীর নিকট দেবতা, তাহার দোষগুণ বা অপরাধের বিচার করিবার স্পর্ধা নারীর থাকিতে পারেনা! তাই তাহার সমস্ত অত্যাচার, সমস্ত অন্যায় তিনি অবনত মস্তকেই সহ্য করিয়াছেন, কোনদিন মাথা তুলিয়া প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে অনিন্দিত অতুলনীয় নারী তাহার অনন্ত বেদনাময় হৃদয় লইয়া সংসারের সমস্ত অত্যাচার অবিচার নির্বিবাদে সহ্য করিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল এবং

যাবার আগে সমস্ত দুঃখ নিংড়াইয়া লইয়া গেল, স্বামীর ঋণের শেষ কড়িটি পর্যন্ত পরিশোধ করিয়া. মাত্র পাঁচ গণ্ডা পয়সা হাতে নিয়া অজানার পথে পাড়ি জমাইল, তাহার জীবনের সার্থকতার পথই সে খুঁজিয়া পাইয়াছে, না জগতের সার্থকতার পথই সে দেখাইয়াছে? তাই অন্নদাদিদির পথই যে সার্থকতার একমাত্র পথ, ইহা যদি কেহ মানিয়া নিতে না পারে তাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না। নির্বাক নিষ্পন্দ ভাবেই যে অত্যাচার সহ্য করে তাহার সহ্য করিবার ক্ষমতা দেখিয়া আমরা তাহাকে বাহবা দেই; আবার অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে. বিদ্রোহী জীবনের সমস্ত দুঃখই যে মস্তক উন্নত রাখিয়াই সহ্য করে, তাহার তেজও ত প্রশংসার অযোগ্য নয়। অন্নদাদিদি বড় কিন্তু অভয়াও ছোট নয়।

অভয়ার স্বামীরূপ জীবটি, যাহাকে শ্রীকান্ত বর্মার কোন জঙ্গল হইতে বাহির হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল, আমাদের প্রায় অপরিচিত। তবুও একটু সামান্য পরিচয়েই যে কয়েকটি বিশেষণে আমরা তাহাকে বিশেষিত করিতে পারি তাহা নীচ, নির্লজ্জ, মিথ্যাবাদী এবং আরও অনেক কিছু। কিন্তু এই স্বামী-রত্নটির অনুসন্ধানেই অভয়া মেয়ে হইয়াও বাংলা দেশের মায়া কাটাইয়া সাগরের ওপারে বর্মামুলুকে পা দিয়াছিল। স্বামীকে যে সে চিনিত তাহা নয়। তবুও সে ইহারই পায়ে একটু মাথা রাখিবার ঠাঁই চাহিয়াছিল, কারণ সে হিন্দু রমণী, জন্ম হইতেই শুনিয়া আসিয়াছে স্বামীই জীবনে মরণে তাহার সর্বস্ব। লোকে জানিয়াছে, অভয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে। হয়ত গ্রামে তাহার কলঙ্কের কথা সকলের মুখে ব্যাপ্ত হইতেছে কিন্তু অভয়া ইহাকে উপেক্ষাই করিয়াছে। ষোড়শী ভৈরবীর মতই সে নির্লিপ্ত নির্বিকারভাবে সেদিন হয়ত বলিয়াছিল. দুর্নাম যদি মিথ্যা হয় তবে সইবেনা কেন? আসার সময়ে অভয়া রোহিণীদাকে সঙ্গে আনিয়াছে এবং পথে শ্রীকান্তকেও সংগ্রহ করিয়াছিল কারণ অজানার পথে ইহাদের প্রয়োজন সে অনুভব করিয়াছিল। অবশ্য রোহিণীদা তাহাকে একান্তভাবেই

ভালবাসিয়াছিল তাই মানসম্ভ্রম সকলই ত্যাগ করিয়া তাহারই কলঙ্কের অংশ নিয়াছিল কিন্তু সেজন্য অভয়াকে দোষ দেওয়া যায়না। সে সর্বান্তঃকরণে তাহার স্বামীকেই চাহিয়াছিল, স্বামীর অনুসন্ধান করিতেই সে ঘর ছাড়িয়াছিল। শ্রীকান্তের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তিনি বেঁচে নেই, তাই কি আপনার মনে হয়? উত্তরে শ্রীকান্ত যখন দৃঢ় প্রত্যয় জানাইল যে তিনি বাঁচিয়াই আছেন, অভয়া শ্রীকান্তের পায়ে হাত দিয়া হাতটা মাথায় ঠেকাইয়া বলিয়াছিল—আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক শ্রীকান্তবাবু, আমি আর কিছু চাইনে। ইহার পরেও শ্রীকান্ত যখন মৌন হইয়া রহিল অভয়া বলিয়াছিল, আপনি কি ভাবছেন আমি জানি,...... তা হোক্, আমি ভয় করিনে, আমি সতীন নিয়ে খুব ঘর করতে পারব। অভয়া স্বামীর ঘরে একটু গৌরবের আশ্রয় চাহিয়াছিল। স্বামীর ভালমন্দ এবং নিজের মঙ্গলামঙ্গল একসঙ্গে মিলাইয়া দিয়া তাহাকেই সার্থক করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। তাই সেখানে রোহিনীবাবুর অতল স্নেহ ঠাঁই পায়না। অভয়ার বাহিরের প্রয়োজনই সে সাধন করে, অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। আমরা জানি অভয়াও ইচ্ছা করিয়াই এই স্নেহকে তাহার অতি সন্নিকটে আসিতে দেয় নাই। শুধু শ্রীকান্তকেই নয়, রোহিণীকেও প্রতিক্ষণেই তাহার ব্যবহার স্মরণ করাইয়া দিয়াছে তাহাদের কাহারও সহিত তাহার সত্যকার সম্বন্ধ নাই। এইভাবে রোহিণীদার অপরিসীম ভালবাসাকে সে যে আঘাত করিয়াছে ইহা সে জানিত। তাই এই নিরীহ নির্বিরোধ লোকটির জন্য মনটি তাহার ব্যথায় ভরিয়া উঠিত। তবুও এক মুহূর্তের জন্যও সে ভোলে নাই—তাহার স্বামী বর্তমান আছে এবং সে একান্তভাবে তাহারই। শ্রীকান্তকে সে বলিয়াছিল, 'এত সমস্তই আমার নিজের কাজ। নইলে রোহিণীদারই বা এ কষ্টের কি আবশ্যক ছিল, আপনারই বা কি মাথাব্যথা পড়েছিল, এ জেলখানায় আসতে। আমার জন্য আপনাদের এত দুঃখ।' অভয়ার এই গৃহত্যাগের সমস্ত দোষ, সমস্ত

ভুল, সকল ন্যায় এবং অন্যায় সে আপন মাথায়ই বহন করিয়া আনিয়াছিল। রোহিণীদা ইহার জন্য এক বিন্দুও দায়ী নয়, অভয়া ইহা শ্রীকান্তের নিকট বলিয়াছিল। শ্রীকান্ত সেদিন মনে মনে বলিয়াছিল—তোমার স্বামী যত পাপিষ্ঠ হোন, পুরুষ মানুষ ত, যদি কখনও তাকে পাও, তোমার মূল্য তিনি বুঝবেনই।

উত্তর ইহার শ্রীকান্ত একদিন নিজের কাছেই পাইয়াছিল। সেদিন অভয়ার এই স্বামী-সৌভাগ্য আপন অকৃত্রিম পরিচয় নিয়া শ্রীকান্তের সম্মুখেই উপস্থিত হইয়াছিল। পতি নারীর দেবতা এবং তাহার ইহকাল পরকাল, শ্রীকান্ত ইহা জানিত কিন্তু তবুও ইহার পাশে অভয়াকে কল্পনা করিতে শ্রীকান্তের দেহমন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত। শ্রীকান্ত ইহা বহুবার স্বীকার করিয়াছে। তারপরে এই নীচ নিষ্ঠুর মিথ্যাবাদী, শ্রীকান্তকে "একান্ত আত্মীয়ের সামিল" পাইয়াই তাহার নিকট যেভাবে "ফ্যামিলি সিক্রেট" প্রকাশ করিতে লাগিল তাহাতে শ্রীকান্ত শুধু বিস্মিতই হইলনা, এই মূর্তিমান ইতরটার প্রতি মন তাহার ঘৃণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলা শ্রীকান্তের মুখে অভয়া সমস্ত কথা নিঃশব্দে নতমুখে শুনিয়াছিল। কোন উত্তরই সে দেয় নাই; শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়াছিল মাত্র। তাহার এত দিনের কল্পনা, এত দিনের ভাবনার আজ এই বাস্তব মূর্তি দেখিয়া সে আঘাত পাইল কিন্তু তবুও সেই ত তাহার সর্বস্ব, সেই ত তাহার স্বামী। ইহার পরেও শ্রীকান্ত যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সে তাহার স্বামীকে ক্ষমা করিতে পারিবে কিনা এবং নিয়ে যেতে চাইলে যাবে কিনা—অভয়া শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়াছিল। বাহিরে তাহার এত বড় কদর্যতা, তবুও ইহার অন্তরে যে চিরন্তন স্বামীটি লুকাইয়া আছে, তাহাই হিন্দু-নারীর সিঁথির সিঁদুর, হাতের নোয়া এবং হৃদয়ের গৌরব মনেপ্রাণে অভয়া এই কথাই জানিত। তাই তার কদর্যতা যত বড়ই হউক না কেন, তাহারই পাশে গিয়া, হাত ধরিয়া দাঁড়াইতে অভয়ার কোন লজ্জা, কোন সঙ্কোচ ছিল না। সমস্ত হৃদয় দিয়া আজ সে তাহাকেই

পাইতে চায়। অভয়ার দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানিনা, পতিসঙ্গ তাহার বেশীদিন হয় নাই, কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তাহার এই একান্ত পতি-আনুগত্যের যে "সামান্য পুরস্কার" সে পাইয়াছিল, তাহা সে দক্ষিণ বাহু অনাবৃত করিয়া শ্রীকান্তকে দেখাইয়াছিল। শ্রীকান্তের অন্নদাদিদিপরায়ণ চিত্তও সেদিন বিচারে অভয়ার বিপক্ষে রায় দিতে সাহস করে নাই। শ্রীকান্ত কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিয়াছিল, 'আসাটা অন্যায় একথা আমি বলতে পারিনে, কিন্তু—'। এ উত্তরের পরেও অভয়া শ্রীকান্তকে ছাড়ে নাই। সে এখন বিদ্রোহী, সমাজের বিরুদ্ধে সে দৃপ্ততেজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে জানে, সমাজ তাহার এই অকুণ্ঠিত তেজকে সহ্য করিবে না। অভয়া ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল, নারীত্বের এই বিদ্রোহকে ক্ষমা করিবার শক্তি বা উদারতা সমাজের নাই। তাই সে শ্রীকান্তের নিকট বিচার চাহিয়াছিল, কহিয়াছিল,—এই 'কিন্তু'টার উত্তরই ত আপনার কাছে চাইছি, শ্রীকান্তবাবু। স্বামী যখন শুধুমাত্র এক-গাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকারে একা ঘরের বার করে দেন, তারপরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কিনা আমি সেই কথাই ত আপনার কাছে জানতে চাইছি। শ্রীকান্ত কোন উত্তর করে নাই, চুপ করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন তাহার কোন উপায়ও ছিলনা। কারণ এ প্রশ্নটি একা অভয়ার দিক হইতেই আসে নাই। সমাজের সমস্ত লাঞ্ছিত নারীর সকল শ্রীকান্তের নিকট জিজ্ঞাসা ইহাই। উত্তরে ইহাদের নির্বাক হওয়া ভিন্ন অন্য উপায় কি আছে? শ্রীকান্তের এই 'কিন্তু'র অর্থ রোহিণীদা এবং সেইজন্যই একসঙ্গে নারীজীবনের তিনটি ব্যথার ইতিহাস, বর্মা মেয়ে, অন্নদাদিদি এবং রাজলক্ষ্মীর কথা সে অভয়াকে শুনাইয়াছিল তাহার অন্নদাদিদি যে তার সমস্ত দুঃখের ভার নিঃশব্দে বহন করা ছাড়া জীবনে আর কিছু করিতে পারিত না, এবং সে ভার অসহ্য হইলেও অভয়ার পথে পা দেওয়া তাহার একান্ত অসম্ভব ছিল, ইহা সে জোর করিয়া এবং শপথ

করিয়াই বলিয়াছিল। অন্নদাদিদির সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া অভয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়াছিল, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। কারণ অন্নদাদিদির ব্যথিত অন্তরকে অভয়া অপেক্ষা কে বেশী বুঝিবে? আজ সার্থকতার পথে গতি বিভিন্ন হইলেও অন্তরের অনুভূতি তাহাদের একই। তাই সমস্ত কথা শুনিয়া অভয়া ধীরে ধীরে বলিয়াছিল, 'আপনার কথা বুঝেছি, শ্রীকান্তবাবু। অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী এঁরা দুঃখটাকেই জীবনে সম্বল পেয়েছেন। কিন্তু আমার তো তাও হাতে নেই।' স্বামীর কাছে অভয়া পাইয়াছিল অপমান, শুধু লাঞ্ছনা আর গ্লানি। তাই কেবল এই মূলধন সম্বল করিয়া শ্রীকান্ত অভয়াকে বাঁচিয়া থাকিতে বলিতে পারে নাই। অথচ মন তাহার এই সমাজকেই চিরদিন ধরিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছে। ইহার সঙ্গে আপনার প্রতিদিনকে সে মিলাইয়া নিয়াছে কিন্তু ইহার অত্যাচার, অমঙ্গল এবং অবিচারের রূপটি এমন করিয়া ইতিপূর্বে কেহ তাহার চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেয় নাই, তাই সে আজ নিরুত্তর। শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন, "অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন"। সেইজন্যই উত্তর দিয়াছিল অভয়া নিজে। অভয়াই শ্রীকান্তকে জানাইয়াছিল সংসারের সব নারীই এক ছাঁচে তৈরী নয়, তাদের সার্থক হবার পথও একটা নয়। অভয়া হিন্দু রমণী। সে আবাল্য শুনিয়া আসিয়াছে সীতা, সাবিত্রী দময়ন্তীকে অনন্ত দুঃখের পথে যাঁহারা অগণিত হিন্দুর হৃদয়ে চিরদিনের জন্য আসন পাতিয়া লইয়াছে। সে নিজেও ত দুঃখবরণ করিতেই এই বর্মা মুলুকে আসিয়াছিল। স্বামীর মঙ্গলের জন্য সে যে-কোন দুঃখকেই বরণ করিতে পারিত। স্বামীর সুখদুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গলের কোন অংশ সে পায় নাই তাই আজ সে বিদ্রোহী জীবনের দুঃখের ভিতরেই আপন সার্থকতার পথ খুঁজিতেছে। তাই দুঃখ সহ্য করার ভিতরে সে গৌরবই দেখিয়াছে। কিন্তু আমরা যদি প্রশ্ন করি, কোন্ মঙ্গল হইল অন্নদাদিদির অমন করিয়া নির্বাসন-দুঃখ সহ্য করাতে? সে কি সত্যই তার ধ্যানের স্বামীকে শাহজীর মধ্যে পাইয়া-

ছিল? সমস্ত জীবন ধরিয়া অন্নদাদিদি একটা শূন্য কাঠামোকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আপন জীবন লক্ষ্যহীন নির্জন অন্ধকারে অতি-বাহিত করিয়াছিল। এ প্রশ্ন অভয়া শ্রীকান্তকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত। আমরা জানি সমাজের বুকে অন্নদাদিদির মত হৃদয় বেশী জন্মায় না; আর তাহাকেই হারানো সমাজের যে কত বড় দুর্ভাগ্য তাহা আজ সমাজ অনুদার বলিয়াই ধারণা করিতে পারে না; তাই অন্নদাদিদি যাহা পারে নাই, অভয়া তাহাই পারিয়াছে. অভয়া সমাজের বুকে বাঁচিয়া থাকিবার সাহস সঞ্চয় করিয়াছে। দুঃখ সম্বল করিয়াও স্বামীর ছায়ায় বাস করিবার মত একটু সৌভাগ্য যাহার ঘটিল না, একটা আশাহীন, উৎসাহহীন, ভরসাহীন, ভবিষ্যৎহীন, ঘৃণিত জীবনযাপন করিলেই কি তার জীবন ফলে ফুলে ভরিয়া উঠিত? অভয়া জানে, রোহিণীদা তাহাকে ভালবাসে। স্বামীসঙ্গ লাভের প্রয়াসী অভয়া এ ভালবাসাকে উপেক্ষাই করিয়াছে। কিন্তু আজ আর তাহার এমন কোন সম্বল নাই যাহাকে আশ্রয় করিয়া ইহাকে সে উপেক্ষা করিতে পারে। একদিকে তার জীবনের সার্থকতা—সংসার, গৃহ, সন্তান সন্ততি—একটা পরিপূর্ণ ভবিষ্যতের মনোমুগ্ধকর ছবি আর একদিকে নৈরাশ্যময় জীবনের এক ভয়াবহ চিত্র। তাই আজ যদি অভয়া সেই সার্থকতার পথই বাছিয়া নিয়া থাকে তবে ইহাকে আর যাহা হউক অন্যায় বলা চলে না। শ্রীকান্ত একদিন অভয়ার কথা রাজলক্ষ্মীকে জানাইয়াছিল। রাজলক্ষ্মী অভয়ার নামে সহস্র কোটি নমস্কার জানাইয়া শ্রীকান্তকে লিখিয়াছিল, "অভয়াকে চোখে দেখি নাই, তবুও মনে হইতেছে তাঁর ভিতরে যে বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহার শিখার আভাস তোমার চিঠির মধ্যে যেন দেখিতে পাইতেছি। তার কর্মের বিচার একটু সাবধানে করিও।" আমরা জানি, অভয়া রোহিণীদার ভালবাসার প্রতিদানে যে নূতন সংসার পাতিয়াছিল সেখানে কামনা, বাসনা, লালসা প্রলোভন আসিয়া অধিকার জন্মায় নাই। সেখানে ছিল সার্থকতার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ছিল কল্যাণ, ছিল অপরের দুঃখ বহন

করিবার দুর্জয় সাহস। তাই মরণের পরওয়ানা হাতে করিয়া শ্রীকান্ত যেদিন সেই মহাপাপিষ্ঠারই দরজায় তার মারাত্মক পীড়ার বিশ্রী বোঝাটা ঘৃণাভরে নামাইয়া দিতে আসিয়াছিল, অভয়া তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া চোখের জল মুছিয়াছিল। উত্তপ্ত ললাটের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়াছিল—"তোমাকে 'যাও' যদি বলতে পারতুম, তাহলে নূতন করে ঘর সংসার পাততে যেতুম না। আজ থেকে আমার নূতন সংসার সত্যিকারের সংসার হলো।"

রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে শ্রীকান্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আগুনটা কি জানো? সেদিন প্লেগ বলে যখন তাঁর সবে পাতা সুখের ঘরকন্নার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলে, তখন যে বস্তুটি নির্ভয়ে নিবিচারে তোমাকে ভিতরে ডেকে নিয়েছিল, আমি তাকেই বলছি তার আগুন। রাজলক্ষ্মী অভয়াকে ঠিকই চিনিয়াছিল। অভয়া দুঃখবরণ করিতেই ভালবাসিয়াছিল। তাই সে জানে, রোহিণীদা এবং অভয়ার ভালবাসা জগতের যে-কোন প্রেমের চেয়ে নীচে নয়, নূতন ঘর-পাতা তাহার নিকট কেবল সুখের স্বপ্ন নয়। ইহার দুঃখ তাহাকে আজীবন বহন করিতে হইবে। কিন্তু তবুও ইহারই ভিতরে সে জীবনের সার্থকতা দেখিতে পাইয়াছিল। তাই সে গর্ব করিয়াই বলিতে পারিয়াছিল, তাদের ভালবাসার ভবিষ্যৎ সন্তানগণ অভয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটাকে দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিবে না, কারণ "তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যেতে পারবে যে তারা সত্যের মধ্যে জন্মেছে এবং সত্যের বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নাই।" ইহাই অভয়ার ভবিষ্যৎ আশা এবং এই আশা নিয়াই সে বাঁচিয়া থাকিবে। ইহা দ্বারাই যাচাই করিয়া দেখিবে "সত্যিকার মানুষই মানুষের মধ্যে বড়, না তার জন্মের হিসেবটাই জগতে বড়।"

ইহাই তাহার আগুন। ইহাই তাহাকে নারী জীবনের সমস্ত দুর্বলতাকে দূরে ঠেলিয়া অমন করিয়া বিদ্রোহীর বেশে বাহিরে

আনিয়াছিল। ইহারই জোরে সকল মতামত অগ্রাহ্য করিয়া, 'সমাজের সমস্ত চোখরাঙ্গানিকে উপেক্ষা করিয়া এই বিদ্রোহী নারী অকুণ্ঠিত তেজে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিল। ইহার জন্যই শ্রীকান্তের অন্নদাদিদির সংস্পর্শে আসা মনও তাহার দোষ গুণের বিচার করিবার স্পর্ধা করে করে নাই। এইজন্যই আমরা শ্রীকান্তের মুখে শুনিতে পাই—"কি ভাল, কি মন্দ, কেন ভাল, কোথায় কাহার কিসে মন্দ—এ সকল প্রশ্ন, পারি যদি তাহার নিজের মুখে শুনিয়া, তাহারই মুখের পানে চাহিয়া বিচার করিব। না পারি ত শুধু পুঁথির লেখা অক্ষরের প্রতি চোখ পাতিয়া মীমাংসা করিবার অধিকার আমার নাই, তোমার নাই, বোধকরি বা বিধাতারও নাই।"

বড়দিদি মাধবী

মনোরমার পত্রের উত্তরে তাহার স্বামী তাহাকে লিখিয়াছিল, "মাধবীলতা রসালকে অবলম্বন করে ইহা জগতের রীতি—তুমি আমি কি করিতে পারি। মাধবীলতার এই চিরন্তন গতির বিরুদ্ধে কোন নালিশ নাই। অবলম্বন তাহার চাই এবং শাল, তমাল, বট প্রভৃতি বিরাট বনস্পতি থাকা সত্ত্বেও সে যে রসালকেই চায়, কারণ ইহাই তাহার স্বভাব।" কিন্তু তবুও মনোরমা ঠিকই লিখিয়াছিল, মাধবী পোড়ারমুখী, কারণ সে বিধবা এবং বিধবাকে যাহা করিতে নাই তাহা সে করিয়াছে, মনে মনে আর একজনকে ভালবাসিয়াছে। সমাজের নিষ্ঠুর বিধানে মাধবী পোড়ারমুখী, কারণ তার হৃদয় আছে, সে দয়ার পাত্রকে দয়া করে, করুণা বিলায়, ভালবাসা দেয়। মাধবী পোড়ারমুখী—কারণ সে জানেনা বিধবার হৃদয় থাকিতে নাই, বিধবাকে ভালবাসিয়া দয়া করিতে নাই। ষোল বছর বয়সে বিধবা হইয়া মাধবী যখন পিতৃগৃহে আসিয়াছিল, সবাই তাহাকে ডাকিয়াছিল—বড়দিদি, সবাই ডাকিয়াছিল—মা, আর সেও একদিনেই ষোল হইতে ছাপ্পান্নতে পা দিয়াছিল। ব্রজবাবুর গৃহে সে ছিল কল্পবৃক্ষ; তলায় গিয়া হাত পাতিলেই হইল, অভীষ্ট লাভে কেহই বঞ্চিত হইত না, সকলেই হাসিমুখ লইয়া ফিরিত। মাধবীর আশা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল, জীবনে সে সার্থকতা চাহিয়াছিল, তাই হৃদয়ে তাহার অনেক ফুলই ফুটিত। যখন স্বামী ছিল, মালা গাঁথিয়া স্বামীর গলায় পরাইয়া দিয়া তৃপ্তি লাভ করিত। কিন্তু শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন স্বামী নাই বলিয়াই সে গাছটি কাটিয়া ফেলিয়া দেয় নাই।

কিন্তু সে ইহাও জানে, তাহার পুরাতন সুখের দিন আর নাই। তাই আর আজ সে সেই ফুলে মালা গাঁথেনা, ফুলগুলি অঞ্জলি

ভরিয়া দীনদুঃখীকে বিলাইয়া দেয়। স্বামী যোগেন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্বে মাধবীর নিকট তাহার শেষ অনুরোধ জানাইয়াছিল। যোগেন্দ্রনাথ বলিয়াছিল, 'মাধবী যে জীবন তুমি আমার সুখের জন্য অর্পণ করিতে, সে জীবন সকলের সুখে সমর্পণ করিও।' যাহারই মুখ সে ক্লিষ্ট মলিন দেখিবে তাহারই মুখ প্রফুল্ল করিতে স্বামীই তাহাকে শেষ নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। মাধবী উদ্বেলিত অশ্রু নিরুদ্ধ রাখিয়া হৃদয় দেবতার অন্তিম কথা কয়টি হৃদয়েই গাঁথিয়া রাখিয়াছিল। যে আসনে সে একদিন যোগেন্দ্রনাথকে বসাইয়া পূজা করিয়া আসিয়াছে তাহার মৃতুর পরে তাহারই অন্তিম ইচ্ছা সে আসন অধিকার করিল। তাই আমরা দেখি, দীনদুঃখীর সেবাই মাধবীর দৈনিক ব্রত; তাই মাধবী সকলের বড়দিদি, আর সেইজন্যই সে কল্পতরু।

শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, মাধবী তাহার ভাদ্রমাসের ভরাগঙ্গার মত রূপ এবং স্নেহমমতা লইয়া পিতৃভবনে আসিয়াছিল, এবং এখানে আসিয়া কল্পবৃক্ষ বড়দিদি সাজিয়া সেই স্নেহমমতা এবং করুণার অযাচিত দানে সকলকে তৃপ্ত এবং মুগ্ধ করিতেছিল। মাধবী অকাতরে দান করিতেছিল, সুতরাং সে দানে দীনদুঃখী মাত্রেরই অধিকার। তাই সুরেন্দ্রনাথ যখন দীনদুঃখীর অধিকার নিয়াই সেই কল্পবৃক্ষে নীচে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার একান্ত রিক্ত নিঃস্ব হস্ত দেখিয়া মাধবীর করুণার্দ্র হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিছু না চাহিতেই একটি অজ্ঞাত ব্যথিত হৃদয়ের দানে সুরেন্দ্রনাথের অন্তর-বাহির পরিপূর্ণ হইতেছিল। সুরেন্দ্রনাথকে স্থান দিয়া পিতা ব্রজরাজবাবু মাধবীকে জানাইয়াছিলেন, 'মা একজন দুঃখী লোককে স্থান দিয়াছি।' মাধবী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'কে বাবা?' পিতা উত্তরে জানাইয়াছিলেন, 'দুঃখী লোক, এ ছাড়া আর কিছুই জানিনা। মাধবীও ইহাই জানিয়া রাখিয়াছিল। ব্রজরাজবাবু বুঝিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ দুঃখী, কিন্তু সে দুঃখের পরিমাণ যে কত ইহা জানিয়াছিল বড়দিদি। যাহাকে মানুষ বলিলেও হয়, ছোট ছেলে বলিলেও হয়, যে খাইতে দিলে খায়, না দিলে উপবাস করে, সেই অকর্মণ্যের

অপেক্ষা বড় দুঃখী সংসারে কে আছে? এই সৃষ্টিছাড়া উদাসীনের জন্য একজন বড়দিদি নিতান্তই আবশ্যক। তাই আমরা দেখি, সুরেন্দ্রনাথ আসা অবধি মাধবীর অর্দ্ধেক সময় সে কাড়িয়া লইয়াছে, এমন কি মনোরমার নিকট পত্র লেখার সময়ও এইজন্য সে পায়না। মাধবী সুরেন্দ্রনাথকে করুণা করিতে গিয়াছিল কিন্তু সে তখনও জানিত না, করুণার সঙ্গে হৃদয়ের মিলন অচ্ছেদ্য। মাধবী বুঝিতে পারে নাই, হৃদয়হীন শুষ্ক করুণা কেহ কাহাকেও দান করিতে পারে না। যার হৃদয় আছে সেই শুধু করুণা করিতে পারে এবং আপন পাত্রের নিকট করুণা পৌঁছিবার বহু পূর্বেই দাতার হৃদয়টি ব্যথিত হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত হয়। তাই সুরেন্দ্রনাথকে দয়া করিতে গিয়া মাধবী ভুল করিয়াছিল কিন্তু তবুও তাহার উপায় ছিল না। কারণ, সে কল্পবৃক্ষ বড়দিদি সাজিয়াছিল। সকলেই যখন সেই বৃক্ষের নীচে আসিয়া হাসিমুখে ফিরিবে, সুরেন্দ্রনাথকেই সে স্নেহের দানে বঞ্চিত করিবে কোন অধিকারে? এই করুণার ভিতর দিয়াই হৃদয়ের একটি বিশেষ অংশ যে সুরেন্দ্রনাথ অধিকার করিয়াছিল, মাধবীর ইহা অগোচর ছিল না। তবুও ইহাকে সে দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া কখনও দেখে নাই, কারণ তাহার প্রতিদিনের বড়দিদির কর্তব্যের কোন ব্যাঘাতই ইহা জন্মাইতে পারে নাই। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় চলিয়া গেলেও তাহারই অশরীরী মূর্তি মাধবী-হৃদয়ের কতখানি অধিকার করিয়াছিল ইহা সে বুঝিতে পারিল সেইদিন, যেদিন সখী মনোরমা তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল—'কেমন শোভে পোড়ার বাঁদর (মাধবীর) রাঙ্গা-চরণতলে' দেখিবার জন্য। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "মাধবী আর সামলাইতে পারিল না, চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মনোরমা মাধবীকে বলিয়াছিল—কাজটা ভাল হয়নি। মনোরমা বাহির হইতেই যুক্তিতর্ক দিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়াছিল। মাধবীর হৃদয় যে কত নিরুপায়, ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তি তাহার যে কত অল্প, ইহা সে বুঝিয়া দেখে নাই। মনোরমা ফিরিয়া গিয়া স্বামীকে পত্র

লিখিয়াছিল, স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিতে নাই। আর বিধাতাকে দোষ দিয়াছিল। এত ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া এ হৃদয় তাহাকে কে গড়িতে সাধিয়াছিল? এবারে কিন্তু মনোরমা ঠিকই বুঝিয়াছিল। মাধবীর হৃদয় আছে, তাই হৃদয়ের স্বাভাবিক গতিতেই তাহাকে চলিতে হইয়াছে, ভালবাসিতে হইয়াছে। কিন্তু তবুও ইার মধ্যেই মাধবীর সক্রিয় হস্ত যে একেবারেই নাই তাহাও নহে। বড়দিদি-রূপ কল্পবৃক্ষে মাষ্টারমহাশয়ের জন্য চশমা ফলিত, পুরাতন কাপড় ফলিত, এমন কি কম্পাস পর্যন্ত ফলিত, কিন্তু তবু সুরেন্দ্রনাথ ছিল উদাসীন। বড়দিদিকে সে জানে না, কে তাহার বড়দিদি সে সংবাদ রাখিবার প্রয়োজনও সে অনুভব করে না। তাই মাধবী অকৃতজ্ঞ উদাসীনতাকেই আঘাত করিয়া সচেতন করিতে গিয়াছিল। মাধবী প্রমীলার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিল, মাষ্টার মহাশয় আবশ্যক মত দ্রব্য পাইয়াও ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে কিছুই বলে না। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, শুনিয়া মাধবীর সদাপ্রফুল্ল মুখ মুহূর্তের জন্য মলিন হইয়া গিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের উদাসীনতাই তাহাকে সেদিন ব্যথা দিয়াছিল। দাতা দান করে এবং ইহার পরিবর্তে যে দান গ্রহণ করে তাহাকে কৃতজ্ঞ দেখিতে চায়। মাধবীর বড়দিদি-হৃদয় কল্পবৃক্ষ হইলেও ইহাই চাহিয়াছিল এবং এই চাওয়া তাহার পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক ছিল। তাই মাধবী ব্রজরাজবাবুর গৃহ ত্যাগ করিয়া কাশী গিয়াছিল যাহাতে সুরেন্দ্রনাথকে বড়দিদির প্রয়োজন অনুভব করাইতে পারে। শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, যাইবার সময়ে মাধবী প্রমীলা, দাদা, বাবা, সকলের সম্বন্ধে উপদেশ দিল এবং সকলকে দেখিবার জন্য দাসদাসীদিগকে অনুরোধ জানাইতে ভুলিল না কিন্তু একমাত্র মাষ্টার মহাশয় সম্বন্ধেই কাহাকেই ইচ্ছা করিয়া কিছু বলিল না। কারণ এই উদাসীন অকর্মণ্য লোকটিকে সে জানাইতে চাহে, সে একজন ছিল। কিন্তু মাধবী বিশেষ কোন অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য নিয়া সুরেন্দ্রনাথকে এই ভাবে আঘাত করিতে যায় নাই। সে একটু কৌতুক দেখিতে চাহিয়া-

ছিল মাত্র। মাধবী মনে করিয়াছিল, বড়দিদি ছাড়া সুরেন্দ্রনাথের কেমন করিয়া দিন কাটে দেখিতে হানি কি? মাধবীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। দুঃখে পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ বড়দিদির প্রয়োজন অত্যন্ত কঠোরভাবেই অনুভব করিয়াছিল—প্রমীলা, এক মাসের আর কত বাকী? কাশী হইতে ফিরিবামাত্র সে প্রমীলার হাত ধরিয়া বড়-দিদিকে দেখিতে গিয়াছিল। মাধবী সুরেন্দ্রনাথকে আঘাত করিয়া কৌতুক দেখিতে চাহিয়াছিল, এই উদাসীন অকৃতজ্ঞ লোকটিকে দান গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞ দেখিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তখনও জানিতে পারে নাই, এই একান্ত সংসারানভিজ্ঞ লোকটির নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা কোন পথ ধরিয়া আসিবে। তাছাড়া সুরেন্দ্রনাথ যতদিন দূরে ছিল মাধবী নিজের হৃদয়কে দেখিতে পায় নাই, দেখিবার প্রয়োজনও অনুভব করে নাই। তখন সে সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিল সুরেন্দ্রনাথের প্রতি এবং সমস্ত শক্তি নিয়াই তাহার উদাসীন প্রকৃতিকে আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু আঘাত খাইয়া সুরেন্দ্রনাথ যখন ফিরিল, মাধবীও সেইদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিল। দেখিল তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে, সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে এবং একান্ত অগোচরে, তাহার করুণা কৌতুকের ভিতর দিয়াই সুরেন্দ্রনাথ সেখানে বাসা বাঁধিয়াছে। মাধবী ভীত হইল, পাছে তার নিভৃত হৃদয়ের এই গোপন অংশটি বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কল্পবৃক্ষ ছিল বড়দিদি কিন্তু আজ আবার সেখানে মাধবী-হৃদয়কেই সে দেখিতে পাইল। তাই সুরেন্দ্রনাথের জন্য বড়দিদির অসীম ভাণ্ডার সীমাবদ্ধ হইল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, 'ভগিনীর যত্ন, জননীর স্নেহ-পরশ, যেন তাহার আর গায়ে লাগে না, একটু দূরে দূরে থাকিয়া সরিয়া যায়।' মাধবী আঘাত করিয়া যে সুরেন্দ্রনাথকে নিকটে আনিয়াছে আজ আবার আঘাত করিয়াই তাহাকে দূরে রাখিতে চাহিল। কিন্তু মাধবী ইহার দুঃখান্তক পরিণতির জন্য প্রস্তুত ছিলনা। তাই যে আঘাত সে সুরেন্দ্রনাথকে করিল, ততোধিক আঘাত নিজেই সহ্য করিল। সুরেন্দ্রনাথ এতদিন পরে বড়দিদিকে চিনিয়াছিল, সে

হস্তের স্নেহ-পরশ সে একান্ত করিয়াই চাহিয়াছিল। তাই বড়দিদির দেওয়া আঘাতকেও তাহারই দেওয়া দান বলিয়া গ্রহণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বড়দিদির আশ্রয় ত্যাগ করিল। মাধবী ইহা বুঝিতে পারে নাই। সে জানিত না, এই উদাসীন প্রকৃতির অনভিজ্ঞ লোক-গুলি যেমন একদিন হঠাৎ আসিয়া নিঃসঙ্কোচে হাত পাতিয়া স্নেহের সমস্ত দানই গ্রহণ করিতে পারে, যেন সব কিছুতেই তাহার অধিকার আছে, আবার তেমনি হঠাৎ একদিন সকলই ত্যাগ করিয়া বিদায় নিতেও ইহারা দ্বিধাবোধ করেনা। যেন কোন কিছুতেই তাহার প্রয়োজন ছিলনা। আপন প্রয়োজন অপ্রয়োজন সকলই ইহারা সঙ্গে করিয়া নিয়া চলে, কেবল স্মৃতিটিকেই ইহারা পিছনে রাখিয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া ব্রজবাবু বলিয়াছিলেন, 'কাজটা ভাল হয়নি মা।' মনোরমাও তাহাকে পরে এই একই কথা বলিয়াছিল কিন্তু সে অন্য কারণে। কিন্তু ভাল-মন্দ সম্বন্ধে মাধবী যে কত নিরুপায় ইহা একমাত্র সে ভিন্ন অন্য কেহই বুঝিতে পারে নাই। ব্রজবাবুর কথা শুনিয়া মাধবী কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়াছিল। কলিকাতার নিঃসম্পর্ক রাস্তায় উপায়হীন অবস্থায় সুরেন্দ্রনাথকেই তাহার মনে পড়িতেছিল। প্রমীলা কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'বড়দিদি, তিনি চলে গেলেন কেন?' মাধবী কোন উত্তর দেয় নাই। তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, 'বাইরে যা, কাঁদিসনে।' মাষ্টার মহাশয়ের জন্য প্রমীলা কাঁদিয়া তাহার দুঃখের ভার লাঘব করিয়া-ছিল কিন্তু মাধবীর সে উপায়ও ছিলনা। কারণ সে "পোড়ারমুখী"। মাধবী জানিত প্রমীলার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে একমাত্র তাহার আপন হৃদয় কিন্তু সেখানে যে বিপ্লব চলিতেছিল তাহার সন্ধান না রাখিতেছিল প্রমীলা, না অন্য কেহ।

মাধবী ইহা হইতেও বড় আঘাত পাইল, যখন শুনিল, সুরেন্দ্র-নাথ কলিকাতার রাস্তায় গাড়ী-চাপা পড়িয়াছে। পিতা মাধবীকে সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন—সুরেন্দ্রনাথ গাড়ী-চাপা পড়ে হাসপাতালে আছে। পিতার কাছেই মাধবী শুনিয়াছিল, সুরেন্দ্র-

নাথ তাহারই নাম করিয়া বড়দিদি বলিয়া ডাকিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত সময়েই পাশের কক্ষে প্রমীলা ঝন্ঝন্ করিয়া কি সব ফেলিয়া দিয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া শরৎচন্দ্র আমাদের সম্মুখ হইতে মাধবীকে সরাইয়া নিয়া গেলেন। না হইলে সেদিন তার নিরুদ্ধ অশ্রু বোধহয় বন্যার জলের মতই বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রবাহিত হইত।

এর পরেও প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়াই মাধবীর জীবন বহিয়া যাইতেছিল। গোপন স্বপ্ন লইয়াই তাহার দিবাবিভাবরী কাটিতেছিল। তাহার আঁধার হৃদয়তলে সুরেন্দ্রনাথের পবিত্র স্মৃতি মাণিকের মতোই জ্বলিতেছিল, কিন্তু সব ওলট্-পালট্ হইয়া গেল মাধবীর গোলাগাঁয়ে প্রত্যাবর্তনে। জমিদার সুরেন রায়েরই গোমস্তা মথুরবাবুর পরওয়ানা বলে স্বামীর ভিটার মাটিটুকুর উপর হইতেও তাহার শেষ অধিকার যখন উঠিয়া গেল, মাধবী তখনও সমস্ত দিন ধরিয়া সুরেন্দ্র রায়ের কথাই চিন্তা করিয়াছিল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "মাধবী ভাবিল, সুরেন রায়! নামটি বড় পরিচিত।" কিন্তু জমিদার সুরেন রায়ের এই নূতন কাজের সঙ্গে মাধবী তাহার সেই পুরাতন মাষ্টার মহাশয়কে মিলাইয়া দেখিতে পারে নাই। ইহার পরেই মাধবী লালতাগাঁয়ের জমিদার সুরেন রায়কে চিনিয়াছিল, পাঁচ বৎসর আগে যাহাকে সে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, সেই সুরেন্দ্রনাথ মাধবীর পুরাতন স্মৃতির উপর নূতন ব্যথা দিবার জন্যই যেন ফিরিয়া আসিল। আপন প্রাণের পরিবর্তেই সে মাধবীকে গৃহে ফিরাইতে আসিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ আসিয়াছে—মৃত্যুর পূর্বে আর একবার। বড়দিদির স্নেহের স্বাদ পাইতে পাঁচ বৎসর আগে আপন স্নেহের দানে ইহাকে বিমুখ করিয়া নিজেই আঘাতের পর আঘাত সহ্য করিতেছিল। তাই ইহাই ছিল তাহার এই দীর্ঘ দিনের চিন্তা, এই পাঁচ বছরের ধ্যান—কি করিয়া তাহার গতিপথের সম্মুখ হইতে অমঙ্গলের ক্ষুদ্রতম কণ্টকটি পর্যন্ত তুলিয়া লইবে তাই এবার কোন বাধা, কোন সঙ্কোচ, কোন লজ্জাই তাহার পথে দাঁড়াইতে পারে নাই। মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম আকুল আকাঙ্ক্ষাকে সে আপন হৃদয়

দিয়াই পূর্ণ করিবে, আপন হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ, সমস্ত করুণা নিঃশেষ করিয়া, তাহার পাঁচ বৎসরের চিন্তা, ঐ আজ যে পরপারের দিকে মুখ ফিরাইয়াছে, তাহাকেই ঢালিতে চায়। তাই এই সময়ে মাধবীকে শরৎচন্দ্র ঠিকই দেখিয়াছিলেন—তাহার মাথায় অবগুণ্ঠন নাই, সুরেন্দ্রনাথের মাথা সে কোলে লইয়া বসিয়াছিল। অর্ধচেতন সুরেন্দ্রনাথ মাধবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তুমি বড়দিদি' ? মাধবী উত্তর করিয়াছিল 'আমি মাধবী'। আজ সে সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচের অতীত, তাই আজ সে মাধবী। শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "বিশ্বের আরাম যেন এই ক্রোড়ে লুকাইয়া ছিল। এতদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ তাহা খুঁজিয়া পাইয়াছে।" বিশ্বের আরাম সত্যই বড়দিদির কোলে লুকাইয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথ তাহাই চাহিয়াছিল, তাই সে পাইয়াছিল। কিন্তু তবুও মনে হয় মনোরমার স্বামী ভুল বুঝিয়াছিল। আধক্রোশ ধরিয়া ভূমিতলে লতাইয়া বৃক্ষে জড়ান সকল লতার ভাগ্যে ঘটেনা। এমন লতারও অভাব নাই, যাহারা সারা জীবন ধরিয়া লতাইয়া লতাইয়া পদদলিত হয়, কখনও পত্র কিম্বা পুষ্পে মঞ্জুরিত হওয়ার সৌভাগ্য তাহাদের হয়না।

মৃণাল

শরৎ-সাহিত্যে অরক্ষণীয়া জ্ঞানদার সংস্পর্শে আমরা পোড়াকাঠের সঙ্গে পরিচিত হই। আমরা দেখি, পোড়াকাঠের রূপ নাই, রুচি নাই কিন্তু সে অভাবের জন্য তাহার ক্ষোভও নাই, নারীজীবনের সার্থকতার সন্ধান কেহ তাহাকে দেয়না, এই সার্থকতার জন্য রূপ কিংবা রুচির প্রয়োজনও সে অনুভব করেনা। তার স্বামীসৌভাগ্যের ইতিহাস, স্বামীগৃহে দৈনন্দিন জীবনাতিপাতের ইতিহাসের পাতা কয়টি খুলিলে অনেকে হয়ত আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু তবুও আমরা দেখি, পোড়াকাঠ হরিপালের সেই অল্পপরিসর ক্ষেত্রের মধ্যেই আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত, ম্যালেরিয়ার শুষ্ক এই হরিপালের ক্ষেত্র হইতেই সে রস আহরণ করিয়া জীবন রক্ষা করে। আমরা দেখি, অন্তরে তার অভাবের জন্য অভিযোগ নাই, না পাওয়ার দুঃখ নাই কিন্তু তবুও অপরের ব্যথা সে অনুভব করিতে পারে এবং আপন সমস্ত হৃদয়, সমস্ত চেষ্টা এবং সমস্ত যত্ন দিয়া সে স্থান পূর্ণ করিয়া দিতে চায়। যে পল্লীগৃহে আমরা পোড়াকাঠকে দেখিয়াছিলাম, তেমনি অপর এক গৃহে আমরা মৃণালকে দেখি। তবুও মৃণাল ও ভামিনী এক পদার্থ দিয়া গঠিত নয়। আমরা পোড়াকাঠকে দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম পল্লীরমণীর হৃদয় আছে, সহানুভূতি আছে কিন্তু বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সে হৃদয়ের সংযোগ নাই। কিন্তু মৃণালকে দেখিয়া আমাদের সে সন্দেহ ঘুচিল। আমরা দেখি, বিদ্যালয়ে শিক্ষা না পাইলেও মৃণাল অশিক্ষিতা নয়, ধর্মের কূটতর্ক সে জানে না কিন্তু তাই বলিয়া তার মূল মঙ্গলাভিপ্রায়ের সঙ্গে সে সম্পূর্ণই অপরিচিত। মৃণাল গ্রামের বাহিরে কখনো যায় নাই, কিন্তু বহির্জগতের সঙ্গে মিলন সহরের মেয়ে অপেক্ষা তাহার কম নাই। তার বয়স মাত্র কুড়ি একুশ

বছর। সে পল্লীগ্রামের আবহাওয়ার পরিবর্ধিত কিন্তু পল্লী-সমাজের সেই আবহাওয়া সর্বত্র মধুর নয় ; ঈর্ষা, দ্বেষ, পরনিন্দা, পরচর্চার গ্লানি ইহাতে কম মিশ্রিত নাই। কিন্তু মৃণালের সংস্পর্শে আসিয়া পল্লীসমাজের মধুরতার স্পর্শ আমরা দেখি। ইহার বিষাক্ত বাষ্পকণাও তাহার সৌরভে দূর হইয়া যায়। সুরেশের উদ্দাম প্রবৃত্তি ও অচলার নারী-হৃদয়ের দুর্বলতা যখন একসঙ্গে মিলিয়া গৃহদাহের বিষাক্ত প্রতিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং মহিমের নির্লিপ্ত নির্বিকার উদাসীনতা পরোক্ষভাবে যখন ইহার ইন্ধন যোগাইতেছিল, তখন আমরা হঠাৎ মৃণালকে দেখি। আমাদের মনে হয়, কেবলমাত্র কেদারবাবুকেই দুঃসহ ব্যথায় সান্ত্বনা দিবার জন্য মৃণালকে প্রয়োজন নয়, মৃণালের প্রয়োজন ছিল অচলার, মৃণালের প্রয়োজন ছিল মহিমেরও। স্বামীর সঙ্গে কল্পিত বিরোধ যখন বিচ্ছেদের আকার ধারণ করিতেছিল, তখন মৃণালের ভিতর দিয়াই অচলা আপন ত্যক্ত গৌরবের স্থানটি পুনরায় অধিকার করিয়াছিল। যদিও মৃণালের প্রতি ঈর্ষাই অচলাকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছিল কিন্তু মৃণালের আপন আকুলতাও এজন্য কম ছিল না। মৃণালের জন্যই মহিম তাহার একান্ত উদাসীনভাব কতকটা ত্যাগ করিতে পারিয়াছিল। কেদারবাবুর ব্যথিত হৃদয়ে সান্ত্বনা দিয়া এবং আপন সমবেদনা দিয়াই মৃণাল সে হৃদয়ের গোপন নিভৃতে আপন অচল আসন স্থাপন করে নাই। মৃণালকে আমরা ইহার পূর্বেও দেখি। মহিমের রোগশয্যায় তাহার অক্লান্ত সেবার কথা আমরা সুরেশের মুখে শুনি। কিন্তু ইহাই মৃণাল চরিত্রের একমাত্র পরিচয় নয়। মৃণাল যেখানে পদার্পণ করে, হৃদয়ের অনিন্দ্য মাধুর্যে, অক্লান্ত সেবায় এবং অদম্য যত্নে স্থানটিকে সে সম্পূর্ণই ভরিয়া দেয়। মহিমের অসুস্থতার সময়ই কেদারবাবু এই মৃণালকে দেখিয়াছিলেন। ফিরিবার দিনে মৃণাল প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই বৃদ্ধের চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন,—"ষ্টেশনের অভিমুখে মৃণালের গাড়ী ফটকের বাহির হইয়া গেলে বৃদ্ধের অন্তরের

ভিতর হইতে একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। তিনি ধীরে ধীরে শুধু বলিলেন,—"অদ্ভুত অপূর্ব মেয়ে।" আমরা জানি, মৃণালের পরিচয় শুধু কেদারবাবুই পান নাই। তাহার পরিচয় সুরেশও পাইয়াছিল। সুরেশের নিকট ধর্ম নাই, ঠাকুরদেবতা মিছে কথা কিন্তু মৃণালকে সেও এক মুহূর্তেই চিনিতে পারিয়াছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল—এই হতভাগ্য দেশের আজও যদি গৌরব করিবার কিছু থাকে তবে সে এই পল্লী নারী, যাহাদের অন্তরে এখনও মৃণাল জীবিত আছে। তাই সে গর্বভরেই বলিয়াছিল—এমন জিনিসটি বোধ করি অন্য কোন দেশ দেখাতে পারে না। সুরেশের উক্তির ভিতরে আবেগ ছিল না, ছিল গভীর অনুভূতি, উচ্ছ্বাস ছিল না কিন্তু একান্ত আন্তরিকতা ছিল। আমরা জানি, ইহা শুধু সুরেশেরই উক্তি নয়, শরৎচন্দ্রের নিজেরও ইহাই ছিল অভিমত।

অচলা সুরেশের নিকট মৃণালের সহিত তাহার বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল। সুরেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'সে কি রাজী হবে?' উত্তরে অচলা বলিয়াছিল—'তাইত আমার বিশ্বাস।' কিন্তু আমরা জানি অচলা তখনও মৃণালকে চিনিতে পারে নাই। মৃণালের প্রতি ঈর্ষাই ছিল তাহার অন্তরায়। অচলার কথা শুনিয়া সুরেশ একটু ম্লান হাসিয়া বলিয়াছিল—"আমার বিশ্বাস তা নয়। বই-এ পড়েছ ত; সহমরণের দিনে কোন সতী হাসতে হাসতে পুড়ে মরত। মৃণাল তাদেরই জাত।" সুরেশের এই উক্তির মধ্যে কিছু আবেগ থাকিতে পারে, কিন্তু সত্যতাও ছিল। সুরেশ ঠিকই বুঝিয়াছিল। জীবনে ইহাদের ভুলভ্রান্তি বলিয়া কিছু নাই। ভুল করিয়া ইহারা কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। কল্পিত ভুল বা কল্পিত অনুতাপে চিরজীবন দগ্ধ হইবার ভাগ্যও ইহাদের নয়। জীবনে একবার যে পথের সম্মুখে ইহারা আসিয়া দাঁড়ায়, সে পথের সমস্ত ভালমন্দ, সমস্ত মঙ্গল অমঙ্গল ইহারা দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন চিত্তেই গ্রহণ করে। পথের ধূলামাটি, পথের আ[illegible] [illegible]পনা-

দিগকে ইহারা এমন করিয়া জড়াইয়া ফেলে যে, চলার গতি তাহাদের পথের সঙ্গেই একান্তভাবে মিলিয়া যায়। পথের ভুল ভ্রান্তি ইহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। নূতন করিয়া পথচলার সম্ভাবনা ইহারা কল্পনা করিতেই পারে না। সুরেশ ইহা বুঝিয়াছিল এবং এইজন্যই সে অচলাকে অনুরোধ করিয়াছিল—এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা যেন সে না করে। এইজন্যই সে অসম্ভবের কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া মৃণালের নিকট আপন "দাদার সম্মানটুকু"ই বজায় রাখিতে চাহিয়াছিল।

গৃহদাহের আবিল ও পঙ্কিল পরিবেশের মধ্যেই মৃণালের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এবং সে পরিচয়ও বেশীক্ষণের জন্য নয়। অচলা, সুরেশ ও মহিমের দীর্ঘ জীবনেতিহাসের মাত্র দুই একটা পাতা ব্যতীত অন্য কোথাও আমরা মৃণালের সাক্ষাৎ পাই না। কিন্তু আমাদের পরিচয় তাহার সঙ্গে যতই অল্প হউক না কেন, ইহার মধ্যেই সে আপন ব্যথিত অন্তরের করুণ চিত্রটি আমাদের মনে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া যায়। আমাদের মনে হয়, তাহার যাত্রাপথে প্রতিটি গতিভঙ্গীই যেন আমাদের কতই না পরিচিত, কতকালের জানা। ইহাকে স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিবার কোনই সাধ্য আমাদের নাই। আমরা দেখি, রাজপুরের আনন্দলেশহীন নির্জন গৃহের কোণে অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিতেছিল এবং গাঢ় অন্ধকার যখন ক্রমেই গাঢ়তর আকার ধারণ করিতেছিল, পল্লীগ্রামের এই বিশ্রী কদর্যতার ভিতরে অচলার বিবাহিত জীবনের সুখের কল্পনা মেঘাবৃত আকাশে চাঁদের মতই অন্তর্হিত হইয়াছিল। ঠিক এই সময়ই কুড়ি একুশ বছরের একটি পল্লীমেয়ে জলে ভিজিতে ভিজিতে নববধূর গৃহের দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা দেখি সদাআনন্দময়ী এই তরুণী সেই দোরগোড়া হইতেই অচলার সঙ্গে ঠানদি সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিল এবং তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার মেঘ যেন আংশিক ভাবে কাটিয়া গেল। মুহূর্ত মধ্যেই কি জানি কেমন করিয়া আন[illegible] সে তাহার

মধুরতর মেজদিতে পরিণত করিল। শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, ইহার আগমনে অচলার বিবাহিত নির্বাসন-জীবনের অর্ধেক বেদনা যেন তিরোহিত হইয়া গেল।

কিন্তু তবুও আমরা দেখি, কাহারও সঙ্গেই যেন মৃণালের সত্যিকার কোন সম্পর্ক নাই। সুদূর কোন অতীতে পিতামাতা তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, সে-সন্ধান সে রাখে না। বায়ান্ন বছরের স্বামীর সঙ্গে একুশ বছরের বালিকার বিবাহের পর মৃণালের মনে যে আকাঙ্ক্ষার ঢেউ বহিয়া যায় নাই, ইহা আমাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় না। শ্বশুর গৃহে মৃণাল স্বামীসেবা এবং শ্বাশুড়ীসেবার অধিকারই পাইয়াছিল, স্বামীস্ত্রীর সুগভীর প্রেম সেখানে ছিল না। কিন্তু আমরা দেখি, কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধই তাহার না থাকিলেও সকলেই তাহার অত্যন্ত আপনার। মহিম তাহার মেজদা, অচলা তাহার মেজদি, সুরেশ তাহার ন'দা, বৃদ্ধ কেদারবাবুর সে স্নেহময়ী কন্যা—মা। মনে হয়, জগতে যেখানে যতটুকু স্নেহ আছে, ভগবান ঐ একুশ বছরের মেয়ের বুকের ভিতরে যেন সমস্তটুকুই সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাই বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীর জন্যই হউক, অচল স্বামীর জন্যই হউক—স্নেহ সেখানে অফুরন্ত। মেজদা, মেজদি, সুরেশ, কেদারবাবু সকলেই যেন তাহার চিরপরিচিত, কাহারও জন্যই সে বিন্দুমাত্র স্নেহের অভাব অনুভব করে নাই। সকলের ব্যথার স্থান সে সরস মধুর স্নেহে ভরিয়া দিয়াছে, নিঃসঙ্কোচে সকলের সমস্ত অভাবই সে পূর্ণ করিয়াছে। দুই হাত ভরিয়া সে সকলকে দান করিয়াছে, অতি প্রয়োজনেও মুখ খুলিয়া কাহারও নিকট সে আপন অভাবের কথা জানায় নাই। যেখানেই ব্যথা সেইখানেই মৃণাল, সেইখানেই তাহার স্নেহমাখা হাতের অপূর্ব অদ্ভুত প্রলেপ। বৃদ্ধ কেদারবাবুর আহত পিতৃহৃদয়কে মৃণাল বুঝিয়াছিল। মৃণাল বুঝিয়াছিল—কি দারুণ ব্যথা বুকে লইয়া বৃদ্ধ জীবন ধারণ করিয়া আছেন। সেই জন্যই আপন অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ব্যথিত হৃদয় দিয়া বৃদ্ধের সমস্ত ব্যথাকে ঢাকিয়া দিবার জন্য

তাহার কতই না আকুলতা, কতই না ব্যগ্রতা! পিতৃহৃদয় নির্ভরতা চাহিয়াছিল কিন্তু চারিদিকে দেখিতেছিল এক সীমাহীন শূন্যতা। পিতৃত্ব যখন গৌরব আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল কিন্তু পাইতেছিল তাহার একমাত্র প্রাপ্য পরিহাস, কন্যাস্নেহ যখন আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, সে হৃদয়কে আশ্রয় দিবার ক্ষমতা ছিল একমাত্র মৃণালেরই। আমরা মৃণালকে দেখি—সমাজের নিকট কন্যার পতন কত বড় গুরুতর অপরাধ সে জানে না, অচলা অথবা সুরেশ কোন অপরাধ করিয়াছে কিনা ইহা তাহার চিন্তার বিষয় নয়। সে জানে একমাত্র পিতার ব্যথিত হৃদয়কে। সেই হৃদয়ের সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ। তাই আমরা দেখি, প্রথমদিন হইতেই বৃদ্ধের খাওয়া, স্নান, চলাফেরা, শেষ জীবনের সমস্ত প্রয়োজনগুলি মৃণাল আপন হাতেই তুলিয়া লইয়াছিল। আপন হাতেই সে আবশ্যক অনাবশ্যক সমস্ত কিছু সাজাইয়া গুছাইয়া হৃদয়ের স্নেহ দিয়া পূর্ণ করিয়া দিতেছিল। পিতৃহৃদয়ের নিবিড় শূন্যতাকে সে অপূর্ব কৌশলে ভরিয়া দিয়াছিল। কেদারবাবুর খাওয়া ভাল হয় নাই, বৃদ্ধের নিজের খেয়াল সেদিকে নাই কিন্তু মৃণালের নিকট তাহা অজানা নাই। কেদারবাবুর শরীর ভাল নাই, তিনি তাহা কাহাকেও বলেন নাই কিন্তু মৃণাল তাহা টের পাইয়াছে এবং গরম জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। কেদারবাবু একদিন মৃণালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আজ এই কথাটি আমাকে বলো দেখি মৃণাল, পরকে এমন করে সেবা করার বিদ্যেটা এইটুকু বয়সের মধ্যে কার কাছে শিখলে?" মৃণাল সেদিন সলজ্জ হাসিমুখে উত্তর করিয়াছিল, "এ আর কি শক্ত কাজ যে চেষ্টা করে শিখতে হবে? এ তো আমাদের জন্মকাল থেকে শেখা হয়ে থাকে।" শরৎচন্দ্র নারী-চরিত্রের নারী হৃদয়ের বৈশিষ্ট্যের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, ইহাই নারী-জাতির স্বভাব। শরৎ-সাহিত্য এখানে প্রকৃত নারীকেই দেখিয়াছে, ইহাতে ভুল নাই। এই সেবাপরায়ণতা, ব্যথিত হৃদয়ের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি যে স্ত্রীজাতির স্বভাব, অন্তত হিন্দু-স্ত্রীর, ইহা

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক নিমেষেই ইহারা যেন বুঝিতে পারে কাহার ব্যথা কোথায়। তাই বুকভরা সান্ত্বনা লইয়া তাহার নিকট ছুটিয়া যায়। কেদারবাবু মৃণালকে বলিয়াছিলেন—"মা, এক কথা বারবার বলেও আমার তৃপ্তি হচ্ছে না যে, তুমি ছাড়া এত বড় সংসারে আমার আপনার জন আর কেউ নেই, কেউ কোনদিন ছিল না।" সকল নারী সম্পর্কে একথা সব সময়ে এতখানি সত্য নাও হইতে পারে কিন্তু মৃণাল সম্বন্ধে এ উক্তি ব্যর্থ নয়।

কিন্তু এই সেবাপরায়ণতা, এই স্নেহশীলতাই মৃণাল-চরিত্রের একমাত্র পরিচয় নয়। তার চরিত্রের মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা আমাদিগকে বেশী আকৃষ্ট করে, বিস্মিত করে, সে তার সংসারমুক্ত মন। একমাত্র কন্যার পদস্খলন বৃদ্ধ পিতার বুকে দারুণভাবেই বাজিয়াছিল। স্নেহ ও সমাজ সেখানে বিরাট দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিল, পিতৃস্নেহ হৃদয়ে থাকিয়া কন্যাকে আকুল আবেগে ডাকিতেছিল, গভীর শূন্যতা সেখানকার নীরব হাহাকারে ভরিয়া যাইতেছিল। আবার বহির্জগতের প্রতি কর্তব্য, চিরন্তন সমাজনীতি কন্যাস্নেহকে দূরে সরাইয়া দিতেছিল। কন্যার মৃত্যু কামনার ভিতর দিয়াই বৃদ্ধ নীতির প্রতি তাহার কর্তব্য পালন করিতেছিলেন। তখন এই বাইশ বছরের মৃণালই বৃদ্ধের হৃদয়ের এই দ্বন্দ্বকে অনুভব করিতে পারিয়াছিল। বৃদ্ধকে সে এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি দিয়াছিল। এই মৃণালই কেদারবাবুকে শিখাইয়াছিল—সংসারে এমন অপরাধ অল্পই আছে ইচ্ছা করিলে যাহাকে ক্ষমা করা না যায়। কেদারবাবু ক্ষমার যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। কিন্তু মৃণাল তাঁহাকে বুঝাইয়াছিল, "যোগ্য অযোগ্য ত বিচারের কথা বাবা, তাকে ত ক্ষমা বলা চলে না।" বিধিবদ্ধ বিচার-শৃঙ্খলার কঠিন বন্ধনে পিতৃস্নেহ যখন গুমরিয়া মরিতেছিল, মৃণালই তাহাকে মুক্তি দিয়াছিল। মুক্তির আনন্দে নিমীলিত নেত্রপ্রান্ত হইতে অজস্র ধারায় অশ্রু বাহির হইয়া আসিয়াছিল। একমাত্র মৃণাল ভিন্ন আর কেহই পিতৃস্নেহকে এমন করিয়া মুক্তি দিতে পারিত না। এতখানি উদারতা, এই

বাইশ বছরের হৃদয় ছাড়া অন্য কোথায়ও ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমরা দেখি, আপনার জন্য এই অপরাধের চিন্তাও সে মহাপাপ বলিয়া মনে করিত। তাই যে সমাজের বুকে মৃণাল মানুষ হইয়াছে, কোন কিছু না শিখিয়াও সেখানে তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে, সেই সমাজের প্রতি বৃদ্ধের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা একেবারে নিরর্থক নয়। মৃণাল কেদারবাবুকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল, হিন্দু সমাজেরও দোষ আছে, অনেক ত্রুটি আছে কিন্তু কেদারবাবু তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়াছেন—"তোমাদের সমাজে থাক না দোষ, থাক না ত্রুটি কিন্তু তুমিও ত আছ। এইটিই যে আমি মাথা খুঁড়ে মলেও খুঁজে পাব না।" হিন্দু সমাজের প্রতি দরদী শরৎচন্দ্রকে আমরা এখানে দেখি। হিন্দু সমাজের দোষ-ত্রুটি তিনি দেখাইয়াছেন : এখানে রাসমণি আছে, গোলক চাটুজ্যে আছে, বেণী ঘোষাল আছে, গোবিন্দ গাঙ্গুলী আছে কিন্তু ইহারাই এই সমাজের একমাত্র পরিচয় নয়। সমাজে অন্যায় আছে, অবিচার আছে তবুও এ সমাজের সার্থকতা আছে। শরৎচন্দ্র অন্যায় অবিচারকে দূর করিতে চাহিয়াছেন কিন্তু সমাজকে কখনো ঘৃণা করেন নাই ইহাই শরৎ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

মৃণালকে আমরা দেখিলাম, তাহাকে বুঝিলাম কিন্তু সম্পূর্ণ চিনিতে পারিলাম বলিয়া মনে হয় না। অন্নদাদিদির দুঃখ দেখিয়া শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবান তাহাকে এমন করিয়া এত বড় একটা নিষ্ফল নিরর্থকতার মধ্যে ঠেলিয়া দিল ?" কিন্তু এই প্রশ্ন একটু অন্য ভাবে মৃণালের জীবন সম্বন্ধেও কি করা চলে না ? সুরেশ তাহাকে এক সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—শুধু বুড়ী শাশুড়ীর সেবা করে আর পূজো-আহ্নিক করে দীর্ঘ জীবনের বাকী সময়টা তার কাটবে কি করে ? উত্তরে মৃণাল বলিয়াছিল—"সময় কাটাবার ভার ত আমার উপর নেই ন'দা, যিনি সময় সৃষ্টি করেছেন তিনিই তার ব্যবস্থা করবেন। শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন "একটা অজানা

ভবিষ্যতের ভার সহসা অজানা ঈশ্বরের উপর দিয়া ইহারা জিতের পথেই এগিয়ে চলে।" শরৎচন্দ্র যাহাই বলুন না কেন, এই অজ্ঞাত ভবিষ্যতের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করায়ও ফাঁকি আছে। মৃণালের জীবনও তাঁহার নিকট প্রশ্ন বিহীন নয়। আমরা দেখি, অচলাকে নারী-জীবনের সার্থকতার পথ দেখাইতে, স্বামী-পুত্র সংসারের কথা বলিতে তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া যায়, মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া যায়—মৃণালের জীবনে ইহাই যথার্থ পরিচয়। আমরা বুঝি, হৃদয় তাহার ব্যথায় ভরা, তাই আপনার ব্যথা দিয়াই সে অপরের ব্যথিত হৃদয়কে অনুভব করিতে পারে। তাই ব্যথিত হৃদয়ের জন্য তাহার অন্তরের এত বেদনা, এত আকুলতা, এত আকুল ব্যগ্রতা।

ভারতী

রেঙ্গুনের এক অস্পষ্ট সন্ধ্যায় যখন আমরা ভারতীকে প্রথম দেখি, তাহার পরিচয় "পথের দাবী"তে কোন বিশিষ্ট স্থানের সন্ধান দেয় নাই সত্য, কিন্তু তাহার বিশুদ্ধ অন্তর ন্যায়-অন্যায়ের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই চলিতে চায়। ইহা আমরা সেই দিনই বুঝি। শরৎচন্দ্র তাহার পরিচয় দিয়াছেন "তাহার রঙ্ ইংরাজের মত সাদা নয় কিন্তু ফরসা। বয়স উনিশ কুড়ি কিংবা বেশী হইতে পারে এবং একটু লম্বা বলিয়াই, বোধহয় কিছু রোগা দেখাইল। উপরের ঠোঁটের নীচে সুমুখের দাঁত দুটি একটু উঁচু মনে না হইলে মুখখানা বোধকরি ভালই। পায়ে চটি জুতা, পরনে একখানা চমৎকার মাদ্রাজী শাড়ী সম্ভবত উৎসব বলিয়া,—কিন্তু ধরণটা কতক বাঙালী, কতক পার্শীদের মত"। কিন্তু ইহাই ভারতীর যথার্থ পরিচয় নয়। দুর্বৃত্ত মাতাল পিতাকে অন্যায় হইতে নিরস্ত করিতে সে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে, পিতৃ-অন্যায় স্বীকার করিয়া অজ্ঞান মাতাল পিতার জন্য অপূর্বের নিকট ক্ষমা-ভিক্ষা করিয়াছে, উৎপীড়নের ফল যথাসাধ্য প্রশমনের জন্য সাজি ভরিয়া ফল ভেট লইয়া দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অপূর্ব সেদিন তাহার ভিতরে এক ভীত রমণীর অন্তরই দেখিয়াছিল। কিন্তু আমরা জানি, অপরিচিত নিরীহের প্রতি অযথা উৎপীড়নই তাহাকে ব্যথিত করিয়াছিল এবং ভারতীর এই কাতরতা তাহারই বিরুদ্ধে যথাসাধ্য উৎকোচ। আমরা দেখি, ভারতীর এই অকুণ্ঠিত সরলতা এই ন্যায়-নিষ্ঠা সেদিন যথোচিত সমাদর পায় নাই, অপমানিত অন্তরের দুঃসহ বেদনা লইয়াই সে ফিরিয়া গিয়াছিল। একদিন এই ভারতীর নিকট হইতে তেওয়ারী জল খাইয়াছে, তাহার রাঁধা সাগু বার্লি খাইয়াছে। জাতির বিশুদ্ধতা ইহাতে ছিল কি ছিল না এ হিসাব রাখিবার তখন সময় হয়ত তাহার ছিল না।

থাকিলেও সেদিন ইহার বিরুদ্ধে গঙ্গাস্নান এবং গোবরের অভাব তাহার হয় নাই—কিন্তু ভারতীর ফলের অস্পৃশ্যতা সেদিন এই গোবর গঙ্গাস্নানকেও অতিক্রম করিয়াছিল। দীর্ঘ কয়েক শত মাইলের ব্যবধানকে তুচ্ছ করিয়া করুণাময়ীর আদেশ সুদূর বর্মা-দেশেও আপনাকে প্রচার করিল—"ওসব আমরা ছোঁই না, মেমসাহেব, তুলে নিয়ে যাও, আমি জায়গাটা ধুয়ে ফেলি।"

ইহার পর ভারতীর যে চিত্রটা আমরা দেখি তাহা আমাদের আকর্ষণ করিতে পারে না। সত্যকে ইচ্ছা করিয়া বিকৃত ও উল্টা করিয়া প্রতিপন্ন করায় প্রতিপক্ষের লাঞ্ছনা ভিন্ন নিজের কোন গৌরব নাই—একথা ভারতী যে জানিত না তাহা নহে, তবুও সে এই পথেই পা দিয়াছিল। বাদী জে. ডি. জোসেফ এবং প্রতিবাদী অপূর্ব বাঙালী ও তাহার চাকর—এই মামলার বিচার যখন নিষ্পন্ন হইয়া গেল, বিচারক রায় দিলেন, অপূর্বের কুড়ি টাকা জরিমানা।

আদালতের বিচারের নিষ্ঠুর পরিণাম সেদিন ভারতীর অগোচর ছিল না। তাই সকল লোকের অজ্ঞাতে সে বিশ-টাকা অর্থ নিজের স্কন্ধে লইয়া অন্তরকে তাহার অন্যায়ের বৃশ্চিক দংশন হইতে অব্যাহতি দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সে নিজেই ত জোসেফের পিছনে থাকিয়া এই মামলার সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিল। অপূর্বর উত্তরে জোসেফ নিজেই জানাইয়াছিল—"সমস্ত আমি মেয়ের কাছে শুনেচি।" আদালতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মেরী ভারতীর পরিচয়ের সঙ্গে অন্য একটি পরিচয়ও ভারতী রাখিয়া গেল। মিথ্যা মামলার সাক্ষী ভারতী সেদিন আদালতকে ফাঁকি দিতে গিয়াছিল। সে কাজে কতটা সফল হইয়াছিল আমরা জানি না, কিন্তু নিজেকে সে ফাঁকি দিতে পারে নাই ইহা আমরা ভাল করিয়াই জানি। ভারতীর পিছনে তাহার অপমানিত অন্তর দাঁড়াইয়া তাহাকে এই পথে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছিল। মিথ্যা আচার-নিষ্ঠার মধ্যেই সে অন্যের প্রতি ঘৃণা দেখিয়াছিল, অপমান দেখিয়াছিল। ইহার আড়ালে দাঁড়াইয়া সে মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় নাই। অপূর্বকে

আঘাত করিয়া সে ব্যর্থ হিন্দুত্বের বড়াইকেই আঘাত করিতে চাহিয়াছিল, সেইজন্যই ভারতীর দ্বারা এই কাজ সম্ভব হইয়াছিল।

ইহার পর ভারতীকে আমরা দেখি অপূর্বর গৃহেই। যাহার নিকট অপমানিত হইয়াছে, আদালতের বিচারে অপমানের প্রতিশোধও নিয়াছে, তাহারই গৃহে চোর প্রবেশ করার পরেও তালা বন্ধ করার যে অকুণ্ঠিত সাহস তাহা ভারতীতেই সম্ভব। মা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন—ইহার জন্য ভারতীর চুরির দায়ে জেল হইতেও পারে। কিন্তু অপূর্বকে সে অকপটে জানাইয়াছিল, "আমার কিন্তু সে ভয় একটুও নেই।" কিন্তু ভয় যে একেবারেই ছিল না তাহাও নয়। এই ভয় ছিল বলিয়াই অপূর্বকে সে পুলিশে খবর দিতে নিষেধ করিয়াছিল, বলিয়াছিল "এই সেদিন আপনার সঙ্গে তুমুল কাণ্ড হয়ে গেল, মুখ দেখাদেখি নেই, কথাবার্তা বন্ধ, হঠাৎ আপনার জন্য আমার এত মাথা ব্যথা পুলিশে বিশ্বাস করবে কেন?" ভারতী পুলিশের কথাই বলিয়াছিল কিন্তু আমরা দেখি অপূর্ব নিজেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। ভারতী অপূর্বকে অযাচিত সাহায্য করিতে আসিয়াছিল। ইতস্ততঃ বিন্যস্ত দ্রব্য-সামগ্রী সে নিজ হাতেই গুছাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু আমরা দেখি অপূর্ব ভারতীর এই দ্বিধাহীন ব্যবহারকেই সন্দেহ করিয়াছিল।

শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন "ভারতীর এই চুরি গোপন করিবার আগ্রহ এখন হঠাৎ কেমন তাহার খারাপ লাগিল। এই সকল অযাচিত সাহায্যকেও সে আর প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিল না এবং কি প্রকার অজানা শঠতার সংশয়ে সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার দেখিতে দেখিতে কালো হইয়া উঠিল।" কেবলমাত্র ইহাই নয়—এই চুরির মূলে যে ভারতী নিজেই এবং পুলিশে জানাইয়া তাহার শাস্তির ব্যবস্থাও সে যে করিবেই, এ ইঙ্গিতও অপূর্ব সেদিন ভারতীর নিকট করিয়াছিল। শুনিয়া ভারতীর ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিয়াছিল এবং শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, সে দাঁত দিয়া জোর করিয়া ঠোঁট চাপিতে চাপিতে ঝড়ের বেগে অপূর্বর গৃহ হইতে

বাহির হইয়া গিয়াছিল। এই চুরি কার্যটা যে ভারতীর দ্বারাই হইয়াছে, অপূর্ব ইহা নিঃসংশয়ে স্থির করিয়া নিয়াছিল। কিন্তু মেয়েদের উপর তাহার শ্রদ্ধা না থাকিলেও তাহার স্বভাবতঃ কোমল ভদ্রহৃদয় নরনারী নির্বিশেষে প্রাণীমাত্রকেই নাকি ভালবাসিত। এই দুর্বলতাই ভারতীকে অপরাধী জানিয়াও শেষপর্যন্ত শাস্তি দিতে দেয় নাই, অথচ এই নিষ্ঠুর মিথ্যাচারিণী রমণীর প্রতি তাহার বিরাগ ও বিদ্বেষের অবধি ছিল না। একথা শরৎচন্দ্রের নিকটই আমরা শুনি। ইহার পরেও ভারতী আবার অপূর্বর নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিল, অপূর্বকে তাহার চোরাই মাল উদ্ধারের সংবাদ দিয়াছিল। অপূর্বর শোওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা, তাহার হিন্দু-আচার-বিচার সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াই করিয়াছিল। একদিন অপমানের বোঝা মাথায় করিয়া ভারতী অপূর্বর গৃহত্যাগ করিয়াছিল কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই ভামো হইতে ফিরিয়া অপূর্ব তাহাকে সম্মুখে দেখিয়াছিল। আমরা দেখি, ভারতীর কোন ব্যবহারে, কোন কথা-বার্তায় তাহাদের পূর্ব সম্বন্ধের বিন্দুমাত্র আভাস প্রকাশ পায় নাই। সংসাবানভিজ্ঞ অপূর্বর বিপদাপন্ন মলিন মুখশ্রী, তাহার একান্ত অসহায় নির্ভরতা ভারতীকে অপূর্বর হৃদয়ের অত্যন্ত সন্নিকটে নিয়া গিয়াছিল। ইহার মূলে ছিল অপূর্বর প্রতি তাহার সহানুভূতি। অপূর্ব-ভারতীর পরস্পর হৃদয়াকর্ষণ একদিন যে বিরাট ঝটিকায় পরিণত হইয়া 'পথের দাবী'র সাজান বাগানকে বিপর্যস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল, তাহার প্রথম তরঙ্গটি এই সময়েই দেখা দিয়াছিল। যে লঘুমেঘ পরবর্তীকালে কালিমাময় হইয়া পথের দাবীর সমস্ত আকাশকে আবৃত করিয়াছিল তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি আকাশের গায়ে এই সময়েই সঞ্চিত হইবার আভাস দিতেছিল। আর অপূর্ব নিজেও ম্লেচ্ছদের এতদিন ঘৃণা করিয়াই আসিয়াছে। ভারতী একদিন অপূর্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—ম্লেচ্ছদের প্রতি আপনাদের ভয়ানক ঘৃণা ? অপূর্ব সেদিন ইহার কোন উত্তর দেয় নাই। কিন্তু প্রতিবাদও করে নাই। তাহার আচার-বিচার-ঘেরা মন সাগরের

পরপারে আসিয়াও হিন্দুত্বের নির্দেশ অমান্য করিতে পারে নাই। কিন্তু একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই, প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতেই অপূর্বর মন ভারতীর ম্লেচ্ছত্বকে অস্বীকার করিয়াই চলিয়াছিল। তাই একদিকে ঘৃণা করিলেও তাহারই উপর অন্যদিকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেও তাহার বাধে নাই। মনস্তত্ত্ববিদ বলেন—এই ঘৃণার মধ্যে নাকি আকর্ষণ আছে। নরনারীর প্রণয় ব্যাপারে একজন আর একজনকে ঘৃণা করিলেই নাকি অন্যপক্ষে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। তার পরে অন্যের প্রতি অবিচার যেদিন নিজের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে, প্রণয়ীর জন্য সমস্ত অন্তর তখন ব্যাকুল হইয়া উঠে। ভালবাসা দিয়া, দুঃখ সহিয়া, সমস্ত অবিচারের প্রতিকার করিবার ইচ্ছাই তখন একান্ত স্বাভাবিক হয়। অপূর্ব-ভারতীর মিলনে এই ভাব যে কোন কাজ করে নাই তাহা মনে হয় না। ভারতী জানিয়াছিল, অপূর্ব তাহাকে ঘৃণা করে। অপমানিত হইয়া সে একাধিকবার অপূর্বর গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। অপূর্ব জানিত ভারতীর জাত-বিচার নাই, সে ম্লেচ্ছ। তাহার উপর মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া সে তাহাকে বিনা অপরাধে দণ্ডিত করাইয়াছে। কিন্তু তবুও কেহই যে কাহাকেও শেষপর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে নাই তাহার কারণ ইহাই।

কিন্তু অপূর্ব-ভারতীর এই প্রণয় ব্যাপারকে শরৎচন্দ্র যে ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে অস্বাভাবিকতা যে কোথাও নাই তাহা নহে। অপূর্ব যখন রেঙ্গুন হইতে ভামো রওনা হইয়া যায় তাহার মন ছিল ভারতীর প্রতি বিদ্বেষে ভরা। ফিরিয়া বাড়ীতে পা দিয়াই সে ভারতীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে। এতদিনে ভারতীরও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ইহাও যথার্থ। তাহার মা'র মৃত্যু হইয়াছে, তাহার পালক পিতাও আর নাই। তেওয়ারীকে সে শুশ্রূষা করিয়া রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যে প্রণয় নিবেদনের ঘটা, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের যে প্রকাশাভিনয় আমরা দেখি, তাহা কতকটা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। শরৎচন্দ্র আমাদিগকে বলিয়াছেন,

অপূর্ব অসুস্থ হইয়া পড়িলে ভারতী হাতমুখ ধোয়াইয়া তাহাকে আনিয়া খাটের উপর শোয়াইয়া দিয়া গামছার অভাবে নিজের আঁচল দিয়াই তাহার হাত ও পায়ের জল মুছাইয়া দিল এবং একটি হাতপাখা তুলিয়া আনিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল—"এইবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, আপনি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত যাবো না।" শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—

অপূর্ব লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু আপনার যে এখনও খাওয়া হয়নি।"

ভারতী কহিল, "খেতে আর আপনি দিলেন কই? আপনি ঘুমোন।"

—ঘুমিয়ে পড়লে তো আপনি চলে যাবেন না?

—না, আপনার ঘুম না ভাঙ্গা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।

অপূর্ব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনাকে মিস ভারতী বলে ডাকলে কি আপনি রাগ করবেন?"

—নিশ্চয় করব। অথচ শুধু ভারতী বলে ডাকলে করব না।

—কিন্তু অন্য সকলের সামনে?

ভারতী একটু হাসিয়া কহিল, "হ'লই বা অন্য সকলের সামনে। কিন্তু একট চুপ করে ঘুমোন দিকি, আমার ঢের কাজ আছে।"

অপূর্ব বলিল, ঘুমোতে আমায় ভয় করে আপনি পাছে ফাঁকি দিয়ে চলে যান।

—কিন্তু জেগে থাকলেও যদি যাই আপনি আটকাবেন কি করে?

ইহার পরে ভারতীর পক্ষ হইতে তাহার ম্লেচ্ছ সমাজে সুনাম দুর্নাম থাক বা নাই থাক অপূর্বকে তাহা জানানো একান্তই নিরর্থক এবং অপূর্বর পক্ষে ভারতী কোন জাতের বা কোন সমাজের, তাহার নিকট জাতটকু পর্যন্ত দেওয়া যায় কিনা এবং ছোঁয়াছুঁয়ি হলে কাপড় ছাড়ার প্রয়োজন হয় কিনা এ বিচারের কোন মূল্য নাই, ইহাই আমরা বুঝি।

শরৎচন্দ্র ভারতীকে কি সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিনা। 'পথের দাবী'র গড়বার ইতিহাসে তাহার দান যতখানি, তাহার চেয়ে ইহার বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কেই তাহার আগ্রহ বেশী। এই ভারতীই একদিন পথের দাবী সম্পর্কে বলিয়াছিল—"ওই আমাদের সমিতির নাম। ওই আমাদের মন্ত্র, ওই আমাদের সাধনা।" ভারতীই অপূর্বকে পথের দাবীর সন্ধান দিয়াছিল, পথের দাবী পথিক হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিল "আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙ্গে চুরে চলবো। আমাদের পরে যারা আসবে, তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে। তাদের অবাধ মুক্ত নীতিকে কেউ যেন রোধ করতে না পারে, এই আমাদের পণ। আসবেন আমাদের দলে?" "শুধু ইহাই নয়, পথের দাবীর 'সত্যিকার কাজে' রত ভারতীকে আমরা ওয়ার্কম্যানদের নরককুণ্ডের মধ্যেও দেখি। পথের দাবীতে নবাগত অপূর্ববাবু যখন এই "পিশাচের নরককুণ্ড' হইতে বাহিরে যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছিল তখন ভারতীই তাহাকে বলিয়াছিল—"এই নরককুণ্ডে যত পাপ জমা হবে তার ভার আপনাকে পর্যন্ত স্বর্গের দোর থেকে টেনে এনে এই নরককুণ্ডে ডোবাবে। সাধ্য কি আপনার এই দুষ্কৃতির ঋণ শোধ না করে পরিত্রাণ পান।" অপূর্বকে ভারতী সেদিন জানাইয়াছিল—এই উপলব্ধিই নাকি পথের দাবীর সবচেয়ে বড় সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে ভারতী রিক্তহস্তে অগ্রসর হয় নাই অহিংসাবাদীর ন্যায় আত্মরক্ষার ভার অন্যের উপর দিয়া অগ্রসর হইতে সে শিখে নাই, একথা আমরা তাহার নিজের মুখেই শুনি। কিন্তু তবুও ডাক্তারের পথের দাবীর সঙ্গে পরিচয় যে তাহার খুব নিবিড় ছিল, ইহা একবারও আমাদের মনে হয় না। আমরা দেখি অপূর্ব দুর্বল। সব্যসাচীর পথের দাবীর সঙ্গে তাহার জীবনের প্রায় কোন দাবীরই মিল নাই। ফরার মাঠে সমবেত জনতার সম্মুখে অপূর্ব ... যে অভিনয় করিয়াছিল, তাহার পর পথের দাবীতে

তাহাকে কোন স্থান দেওয়া চলে না। অপূর্বর নিজের নিকটও ইহা যে অজ্ঞাত ছিল তাহা নয়। সুমিত্রাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ভারতী বারবার অপূর্বকে ডাকিতেছিল। অপূর্ব কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিয়াছিল—"আপনারা তো জানেন, সমিতির আমি অযোগ্য। ওখানে আমার ঠাঁই হতে-পারে না।" কিন্তু ভারতীর নিকট তখন অপূর্বর ন্যায় অন্যায়ের কোন বিচার নাই। ইহার বহু পূর্বেই সে সমস্ত হৃদয় দিয়া অপূর্বকে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতীর সমস্ত ভালমন্দের অতীত, পথের দাবীর বহু ঊর্ধ্বে তাহার হৃদয়ের দাবী। ভারতীর এই সময়ের অবস্থা দেখিলেই আমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। অপূর্ব দৃঢ়কণ্ঠে এবং সুস্পষ্টস্বরেই ভারতীকে জানাইয়া দিয়াছিল, পথের দাবীতে তাহার স্থান নাই। শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, ভারতী হঠাৎ যেন তাহার হাত ধরিতে গেল কিন্তু সামলাইয়া লইয়া এক মুহূর্তে তাহার মুখের পরে দুই চক্ষের সমগ্রদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চুপি চুপি কহিল—"পথের দাবীতে স্থান নাও থাকতে পারে কিন্তু আর একটা দাবী থেকে আপনাকে স্থানচ্যুত করতে পারে সংসারে এখন কিছু নেই অপূর্ববাবু।" "আমরা দেখি এই আর একটা দাবী"ই শেষপর্যন্ত জয়ী হইল। পথের দাবীর সমবেত শুভ ইচ্ছা অতলজলে ডুবিয়া গেল। এখান হইতেই ভারতীর পথ পশ্চাতের দিকে। সম্মুখের সকল বাধা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অগ্রসর হইবার সাহস আর তাহার মধ্যে অবশিষ্ট দেখিনা। কিন্তু ডাক্তারের প্রতি তখনও তাহার শ্রদ্ধা অপরিসীম। সে পাষাণস্তূপের মধ্যে একটি মাত্র বস্তুকে সে দেখিয়াছিল—সে জননী-জন্মভূমি। আদি নাই, অন্ত নাই, ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই। যখন পথের দাবীর প্রতি ভারতীর কোন আকর্ষণ ছিল না, তখন ডাক্তারের প্রতি এই অপরিসীম শ্রদ্ধাই সব্যসাচীর প্রতি তাহার আকর্ষণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। এই দুই বিরোধী শক্তি ভারতীর ভিতরে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিল, ভারতী তাহার অবসান চাহিয়াছিল, ভারতী চাহিয়াছিল সন্ধি। তাই

ভারতী একদিন সব্যসাচীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"আচ্ছা, ইংরেজের সঙ্গে তোমার কি কখনো সন্ধি হতে পারে না ?" ডাক্তার সুস্পষ্টভাবেই উত্তর দিয়াছিলেন—'না'। ভারতীকে ডাক্তার আরও বলিয়াছিলেন—"এই কথাটা তুমি আমার চিরদিন মনে রেখো, ভারতী, আমার দেশ গেছে বলেই আমি এদের শত্রু নই। একদিন মুসলমানের হাতেও এ দেশ গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত মনুষ্যত্বের এতবড় পরম শত্রু জগতে আর নেই। স্বার্থের দায়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদের জন্মগত সংস্কার। এই এদের মূলধন। যদি পারো, দেশের নরনারীকে শুধু এই সত্যটা শিখিয়ে দিও।" অপূর্বর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে ডাক্তারের এই কথাগুলোকে ভারতী অবিসংবাদিত সত্য বলিয়াই মানিয়া লইত। ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রশ্নই তাহার মনে উঠিত না। কিন্তু আজ আর সে ইহা পারিল না। ডাক্তারের পথের দাবীর সমস্ত দাবী উপেক্ষা করিয়া আজ অপূর্ব সেখানে দাঁড়াইয়া। তাই "আর একটা দাবী" আসিয়া আজ পথের দাবীকে তাহার শ্রদ্ধার আসন হইতে দূরে সরাইয়া দিতেছে। ঠিক এই জন্যই পথের দাবীর প্রতি ভয়ানক অন্যায়ের অনুষ্ঠানের পরেও অপূর্বর প্রতি আকর্ষণ তাহার বিন্দুমাত্র কমে নাই। ডাক্তারের নিকট একবার সে তাহার আকুল আবেদন জানাইয়াছিল—"সংসারে আমার আপনার কেউ নেই, তোমার পথের দাবী থেকে আমাকে বিদায় দিওনা, দাদা।" কিন্তু আমরা জানি, ভারতীর আকুতির মূলে ডাক্তারের প্রতি তাহার আকর্ষণ, পথের দাবীর প্রতি নয়। ডাক্তারের প্রতি ভারতীর শ্রদ্ধা আরও এক কারণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ডাক্তার অপূর্বর জীবন দিয়াছিলেন। অপূর্বর জীবন রক্ষা করিতে গিয়া ভারতীকে পথের দাবীর নিকট ছোট হইতে হইয়াছে। সবাই বুঝিয়াছে, সমিতির প্রতি যে লোক অন্যায় করিয়াছে, তাহার প্রতি এই আকর্ষণ ভারতীর পক্ষে গৌরবের বস্তু নয়। কিন্তু আমরা দেখি, এই অবস্থায়ও ভারতী তাহার অন্তরের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিতে চাহিয়াছে। নিজেকে সে

বুঝাইতে চাহিয়াছে, আসল চেষ্টা তাহার অপূর্বকে রক্ষা করিবার জন্য নয়। ইহা ছাড়া এই তুচ্ছ মানুষটাকে হত্যা করিবার অসম্মান ও ক্ষুদ্রতা হইতেই সে সমিতিকে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু আমরা জানি, ভারতী সেদিন নিজেই নিজেকে ঠকাইয়াছিল, নিজের অন্তরাত্মাকে বুঝিতে পারিয়াও তাহার সঙ্গে ছলনা করিয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার তাহাকে ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। চাউঙএ যেদিন পথের দাবীর গোপন বৈঠক বসিয়াছিল, তাহার পর দিন ভারতী ডাক্তারকে বলিয়াছিল—অপূর্ববাবু যে মস্ত লোক এভুল আমি একদিনও করিনি কিন্তু তিনি যে এত সামান্য, এত তুচ্ছ—এ ধারণাও আমার ছিল না। শুনিয়া ডাক্তার তাহাকে বলিয়াছিলেন—"কিন্তু আমি জানিতাম। লোকটা এত তুচ্ছ না হ'লে কি এতবড় ভালবাসা তোমার এত তুচ্ছ কারণেই যায়? যাক, বাঁচা গেল ভাই, কাকে কি ভেবে মিথ্যে দুঃখ পাচ্ছিলে বৈত নয়।" ডাক্তারের কথায় তামাসার সুর ছিল কিন্তু ভারতী ইহার পরে তাঁহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিল—যেন অপূর্বর প্রতি এই মোহ তাহার চিরদিনের জন্য কাটিয়া যায় এবং সমস্ত দেহমন তাহার দেশের কাজে আবার নিয়োগ করিতে পারে। কিন্তু শরৎচন্দ্র আমাদিগকে বলিয়াছেন, ডাক্তারের ওষ্ঠাধর চাপা হাসিতে বিকশিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন—"তোমার মুখের ভাষাটা যে মোহ কাটাবার মতোই তাতে আমার সন্দেহ নেই কিন্তু মুস্কিল এই যে কণ্ঠস্বরে তার আভাসটুকু পর্যন্ত নেই। তা' সে যাই হোক, ভারতী, তোমাকে দিয়ে আমার দেশের কাজ কিন্তু এক তিলও এগোবে না। তার চেয়ে তোমার অপূর্বই ঢের ভালো। দেনা পাওনার চুলচেরা হিসাব করতে করতে বোঝাপড়া একদিন তোমাদের হয়ে যেতেও পারে। বরঞ্চ তাই করোতো।" ডাক্তার তাহাকে ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। তাই ভারতীকে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার পানে চাইলেই মনে হয় এসবের জন্য তুমি নও, এর মধ্যে টেনে এনে তোমাকে ভাল কাজ হয় নি।" আমরা বুঝি, ডাক্তার ভারতীকে সত্য কথাই জানাইয়াছিলেন। ভারতীর সৃষ্টি পথের

দাবীর জন্ম হয় নাই, পথের দাবীর বন্ধুর ভূমিতে ভারতী বা অপূর্বর এইজন্যই বিকাশ নাই। পথের দাবীর কঠোর আবেষ্টনীর মধ্যে ভারতী বাঁচিতে পারে না। তবুও ডাক্তারের প্রতি তাহার অপরিসীম শ্রদ্ধা, ডাক্তারের অসামান্য দেশপ্রেম, তাহার আত্মত্যাগ তাহাকে পথের দাবীতে এক সময় হয়ত যথার্থ আসনই দিতে পারিত কিন্তু তাহার হৃদয়ের সমস্ত শুভেচ্ছার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল অপূর্ব। ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও ডাক্তারের পথের দাবী ভাঙ্গিয়া গেল।

ইহা ভিন্ন অন্য কারণেও পথের দাবীতে ভারতীর স্থান হইতে পারে না। যে বিদ্বেষ এবং যে ভয়ানক অগ্নি পথের দাবীর ইন্ধন, ভারতীর অন্তরে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতী নিজেই একদিন ডাক্তারের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল,—আমি ক্রিশ্চান, শিশুকাল থেকে ইংরেজকেই আত্মীয় জেনে, বন্ধু জেনে বড় হয়ে উঠেছি; তাদের প্রতি ঘৃণায় মন পূর্ণ করে তুলতে আমার ভারী কষ্ট হয়।" সেইজন্য 'পথের দাবী'র দাবীর সঙ্গে তাহার অন্তরের মিল হইলেও ইহার পথের সঙ্গে অন্তর তাহার কোন দিনই মিল খুঁজিয়া পায় নাই। সে বলিয়াছিল,—"ভারতের মুক্তি আমরা চাই, অকপটে, অসঙ্কোচে, মুক্তকণ্ঠে চাই। দুর্বল, পীড়িত, ক্ষুধিত ভারতবাসীর অন্নবস্ত্র চাই। মনুষ্যজন্ম নিয়া মানুষের একমাত্র কাম্য স্বাধীনতায় আনন্দ উপলব্ধি করতে চাই।" কিন্তু তবুও সে ডাক্তারকে পর্যন্ত পথের দাবীর রক্তাক্ত পথ ছাড়িতে বলিয়াছিল, বিপ্লববাদের নির্মম পথে মন তাহার ডাক্তারকেও যাইতে দিতে চাহে নাই। তাই এই বারম্বার চলা পথের বাহিরে, রক্তরেখার পথ ছাড়া ভিন্ন পথের সন্ধান নিতেই তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল।

অপূর্ব দলের প্রতি অন্যায় করিয়াছিল, দেশের প্রতি অন্যায় করিয়াছিল। তাহার অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ডাক্তারের প্রতিও সে অন্যায় করিয়াছিল। ইহার পরেও ডাক্তার ভারতীর মুখের

দিকে চাহিয়াই পথের দাবীর সমবেত মতের বিরুদ্ধে তাহার প্রাণ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা দেখি, বর্মা ত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে একটি কৃতজ্ঞতার কথাও অপূর্বর মুখ হইতে বাহির হয় নাই। যাইবার সময়ে শুধুমাত্র বড় চাকুরী ও হাতের দাগটাই তাহার সমস্ত মন জুড়িয়া রহিল, ইহা মনে করিয়া ভারতী পর্যন্ত লজ্জিত না হইয়া পারে নাই। নিজের প্রাণ বাঁচাইতে কোন শিক্ষিত লোক যে এতবড় হীনতা স্বীকার করিতে পারে ইহা মনে করিয়াই ভারতী দুঃখিত হইয়াছিল। তাই ডাক্তারের নিকট বার বার ইহা উচ্চারণ করিয়া ইহার মধ্যে সে একপ্রকার সান্ত্বনাই খুঁজিয়াছিল। ডাক্তারের নিকট ভারতী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—মানুষ হয়ে মনুষ্য-জন্মের কোন বালাই নেই, এমন কি করে হয় দাদা? শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, বলিতে বলিতে ভারতীর দুই চোখের কোণ বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহার কারণ অপূর্বকে সে ভালবাসিয়াছিল, তাই কেহ তাহাকে ক্ষুদ্র মনে করে, কেহ তাহাকে ঘৃণা করে, ইহা সে সহ্য করিতে পারে নাই।

ভারতীর প্রতি অপূর্ব উদাসীন থাকিবে, ইহাও সে সহ্য করিতে পারে নাই। ডাক্তারের নিকট তাহার মনের এই অবস্থা ভারতী প্রকাশ করিয়াই বলিয়াছিল। সুমিত্রার প্রতি ডাক্তারের ব্যবহারের প্রসঙ্গে ভারতী তাহাকে বলিয়াছিল—"তুমি বলবে, সুমিত্রাদি'কে তুমি ভালবাসো না। নাই বাস্‌লে। তোমাদের পুরুষ মানুষের ভালোবাসার দাম কতটুকু, দাদা, যা আজ আছে, কাল নেই। অপূর্ববাবুও আমাকে ভালবাসতে পারেন নি, কিন্তু আমি তো পেরেছি। আমার পারাই যা কিছু সব।" বোলতার মধু সঞ্চয়ের শক্তি নাই বলিয়া ভারতী কাহারও সঙ্গে তাই নিয়ে ঝগড়া করিতে যাইবে না, ইহা সে সুস্পষ্টভাবেই ডাক্তারকে বলিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এইসঙ্গে ডাক্তারকে সে ইহাও জানাইয়া দিয়াছিল যে বিশ্ব বিধানের প্রভু যদি কেহ থাকেন, নারী হৃদয়ের প্রেমের ঋণ শুধবার জন্য তিনি অপূর্বকে নিশ্চয়ই আনিয়া ভারতীর হাতে সঁপিয়া দিবেন।

আর একদিন ভারতীর সঙ্গে ডাক্তারের এই কথাই হইয়াছিল। দুইজনে শশী-নবতারার বিবাহ দেখিতে গিয়াছিল। নৌকায় বসিয়া ভারতী ডাক্তারকে প্রশ্ন করিয়াছিল—তুমি চলে গেলে আমি দাঁড়াবো কোথায়? কি আশ্রয় করে থাকবো? ডাক্তার উত্তর করিয়াছিলেন,—ভাগ্যবতী মেয়েরা যা আশ্রয় করে থাকে—স্বামী, ছেলে-পুলে, বিষয়-আশয়, ঘর-দোর। ভারতী তখন রাগ করিয়াই বলিয়াছিল,—"আমি যে অপূর্ববাবুকে একান্তভাবেই ভালবেসেছিলাম, এ সত্য তোমার কাছে গোপন করিনি। তাঁকে পেলে একদিন যে আমার সমস্ত জীবন ধন্য হয়ে যেত একথাও তুমি জানো। তোমার কাছে কিছু লুকানো যায় না। কিন্তু তাই বলে আমাকে তুমি অপমান করবে কিসের জন্যে?" ভারতী ডাক্তারের বিরুদ্ধে সেদিন মিথ্যা অভিযোগই করিয়াছিল। ডাক্তার অপূর্বর প্রতি ভারতীর ভালবাসার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন এবং এই ভালবাসাই অপূর্বকে আবার বর্মাদেশে টানিয়া আনিবে, ইহাই তিনি জানাইতে চাহিয়াছিবেন। আমরা জানি, শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের কথাই সত্য হইয়াছিল। নিরন্ন, নিরক্ষর, নিরুপায় মৃত্যুপথযাত্রী কৃষককুলের অপূর্বর দ্বারা কতটুকু কল্যাণ হইল এবং সেই কল্যাণে ভারতীর দান কতখানি, সে সন্ধান শরৎচন্দ্র আমাদের দেন নাই কিন্তু পথের দাবীর চলার পথের বাহিরে আসিয়া অপূর্ব-ভারতীর পরস্পর মিলন যে ইহার পর সহজ ও বাধাহীন হইয়াছিল ইহা আমরা ভাল করিয়াই বুঝি। ডাক্তার একদিন ভারতীকে বলিয়াছিলেন, "স্নেহের আয়োজন, করুণার প্রতিষ্ঠান জগতে অনেক খুঁজে পাবে, পাবেনা শুধু পথের দাবী।" কিন্তু ভারতী কোনদিন অন্তরের সহিত পথের দাবীকে চাহে নাই। ডাক্তারকে সে সুস্পষ্টভাবেই জানাইয়াছিল,—তোমার এই দয়াহীন, নিষ্ঠুর পথে কিছুতে কল্যাণ নাই। আমার স্নেহের পথ, করুণার পথ, ধর্মবিশ্বাসের পথ,—সেই পথই আমার শ্রেয়, সেই পথই আমার সত্য।" ডাক্তারের পথের দাবীর পথ যে মানবের পরম কল্যাণের

পথ নয়, একথা তিনি বহুবারই ভারতীকে জানাইয়াছিলেন এবং অপূর্ব ভারতীর চলার পথ যে ইহার বাহিরে তাহাও তিনি জানাইতে দ্বিধা করেন নাই। আমরাও দেখি, পথের দাবীর নিষ্ঠুর গণ্ডীর মধ্য হইতে মুক্তি পাইয়াই ভারতী তাহার সহজ জীবনের সন্ধান পাইয়াছিল, সংসারে তাহার নিজের স্থান খুঁজিয়া পাইয়াছিল। ইহার পর আর যাহাই হোক না কেন, ডাক্তারের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা আর কোন দিনই যে সে করিবে না, তাহা আমরা বুঝি।

রমা

শরৎ-সাহিত্যে আমরা দেখি সমাজের সঙ্গে হৃদয়ের দ্বন্দ্ব। সমাজ এখানে আদর্শ নয়; যাহাদের মঙ্গলের জন্য সমাজের সৃষ্টি, তাহাদেরই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সমাজের সমগ্র না হইলেও অধিকাংশ সময় ব্যয় হইতেছে।

শরৎ-সাহিত্যে সমাজ সক্রিয়, শক্তিশালী। আর হৃদয় অধিকাংশক্ষেত্রেই দুর্বল। তাই, এই অসম যুদ্ধে হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত হইয়াই বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। সমাজের বিরুদ্ধে জয় তাহার ভাগ্যে আমরা শরৎ-সাহিত্যে দেখি না। সমাজের সঙ্গে হৃদয়ের দ্বন্দ্ব আমরা বঙ্কিম উপন্যাসেও দেখিয়াছি। শৈবলিনী প্রতাপকে চাহিয়াছিল এবং প্রতাপের হৃদয়ও শৈবলিনীকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল সমাজ। আমরা দেখিয়াছি, রোহিণীর জীবনে যে সার্থকতা দেয় নাই। সে সমাজ। কৃষ্ণকান্তের পরিবারের সমস্ত হাহাকারের মূলে সমাজ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে সমাজকে ভালমন্দের বিচার হইতে দূরে রাখিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্কিত প্রতাপ-শৈবলিনীকেই আমরা দেখি, কিন্তু যে সমাজের ছায়ায় তাহারা পরিপুষ্ট, সে সমাজকে উপন্যাসে আমরা দেখিতে পাই না। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজকে বিচার ক্ষেত্রে টানিয়া আনেন নাই, তাই বিচার করিয়াছেন প্রতাপ ও শৈবলিনীকে। বঙ্কিম-সাহিত্যে পাঠকের সমাজের সঙ্গে পরিচয় হয় না। সমাজ পরোক্ষে থাকিয়া তাহার কাজ করে। তাই তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন করা চলে না। সমাজের আদেশ এবং উপদেশ নির্বিরোধ চিত্তেই সকলকে মানিতে হইবে, ইহাই যেন বঙ্কিম-সাহিত্যের নির্দেশ। ইহারই উপর নির্ভর করিয়া এখানে উপন্যাসের চরিত্রের বিচার চলে। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে এই

বিচার নাই। শরৎচন্দ্র সমাজকেও এই দ্বন্দ্বের জন্য সমানভাবেই দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু তবুও সমাজের সাধারণ গতিপথের বিরোধিতা না করিয়া হৃদয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বে শরৎচন্দ্রও সমাজের কণ্ঠেই জয়ের মালা পরাইয়া দিয়াছেন। সমাজের জন্য তিনি হৃদয়কে বলি দিয়াছেন। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, হৃদয়ে সত্য আছে, ধর্ম আছে, তবুও স্বাভাবিক নিয়মেই সমাজের যূপকাষ্ঠে হৃদয়কে আত্মবলি দিতে হইবে। তবে ইহার পরিণতি চির কল্যাণময় চির মঙ্গলময় কি না, সে সম্পর্কে তাহার সন্দেহ ছিল। এই জন্যই সমাজের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের অভিযোগ ছিল। শরৎ-চন্দ্রের উপন্যাসে সর্বত্রই ইহা আমরা দেখিতে পাই। অন্নদা দিদি সমাজের বিরুদ্ধে কখনও দাঁড়াইয়া ছিলেন কি না আমরা জানি না, কিন্তু সমাজের বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহার বিধিবদ্ধ নিয়মকে তিনিও উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পরিণতি সম্বন্ধে সমাজ কখনও বিচার করে নাই, অনুসন্ধান করে নাই। তবুও দেখি, দণ্ড তাহাকে নিতেই হইল, সমস্ত জীবন সমাজের গণ্ডীর বাহিরে অদৃশ্য অজ্ঞাত জীবন যাপন করিতে হইল। সমাজগৃহে একটু স্থান পাইবার জন্য রাজলক্ষ্মীর আকুল আবেদন, তাহার প্রাণের ব্যাকুল বেদনা আমরা দেখি। হতভাগ্য দেবদাসের অসংযমী চরিত্রের জন্য শরৎচন্দ্র পাঠককে একটু প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন। ইহার কারণ, তিনি জানেন সমাজ ইহাতে বাধা দিবে না। কিন্তু পার্বতীর কোন সংবাদই তিনি দিতে পারিলেন না। শরৎ-সাহিত্যের সর্বত্রই এই রীতি। সর্বত্রই সমাজ আপন শক্তিতে হৃদয়ের স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দ্বন্দ্ব এবং ইহার পরিণতি সর্বাপেক্ষা করুণ হইয়া দেখা দিয়াছে রমার জীবনে। পল্লী-সমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারে সর্বাঙ্গে ক্ষত বিক্ষত হইয়াই তাহাকে চিরদিনের মত সমাজ হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতে হইল। আমরা দেখি পল্লী-সমাজের দণ্ড সে নীরবেই সহ্য করিয়াছিল, আপনার একান্ত অভীষ্টকে সে অকাতরেই বলি দিয়াছিল। তাই সমস্ত অন্যায়

দণ্ড মাথায় নিয়া বিদায়ের সময়ে কাহারও সহানুভূতিই সে আশা করিতে পারে নাই। রমার জীবনে ইহাই সর্বাপেক্ষা করুণ। কাশী যাত্রার পূর্বে জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরী তাহার সম্বন্ধে রমেশকে বলিয়াছিলেন, "সংসারে তার স্থান নেই বাছা, তাই তাকে ভগবানের পায়ের নীচেই নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে গিয়েও সে বাঁচে কিনা জানিনে।"

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, শৈশবপ্রেমে অভিশাপ আছে। ইহার সত্যমিথ্যা নির্ধারণ সম্ভব নহে। কিন্তু রমা ও রমেশের জীবন সম্পর্কে ইহা যে নির্ভুল ইহা অন্ততঃ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। শীতলাতলা পাঠশালায় বাগদেবী তাহাদিগকে কতখানি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু মীনকেতু কন্দর্পদেবতা এই দুইটি শৈশব হৃদয়ের জন্য এক গভীর দুঃখই লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। রমা সকল কিছুই রমেশের সঙ্গে ভাগ করিতে পারিত, এমন কি মাতৃস্নেহ পর্যন্ত। খুড়িমার হৃদয়েও যদু মুখুয্যের কন্যার জন্য একটু বিশেষ স্নেহই সঞ্চিত ছিল কিন্তু তবুও ঘোষাল-গৃহে তাহাকে বধূভাবে গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। তারপর দীর্ঘ অদর্শন, এবং ইতিমধ্যে উভয়েরই জীবনে বিরাট ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে রমা রমেশ উভয়েই হয়ত উভয়কে কতকটা ভুলিয়াছিল। অন্ততঃ শৈশব প্রেমের সেই তীব্র অনুভূতি যে ছিল না তাহা নিশ্চয়। সেই জন্যই দেখি, রমেশকে পুনর্বার দেখিবার আগে রমা তার বেণীদার নিকট বলিয়াছিল—'উত্তর দেবে বাইরে দরোয়ান।' তখন সে মিথ্যার ভাণ করে নাই। কিন্তু তখনও সে বুঝিতে পারে নাই, একটু পরেই যে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে তারিণী ঘোষালের পুত্রই তাহার একমাত্র পরিচয় নয়। শীতলাতলাকে রমা ভুলিয়াছিল কিন্তু রমেশ যে আবার সেই শৈশব স্মৃতিটাই বহন করিয়া আনিবে ইহা সে বুঝিতে পারে নাই। ইহার পরমুহূর্তেই রমেশ আসিয়া যখন ডাকিল—"রাণী কইরে!" রমার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, তাহার সমস্ত সংকল্পই ওলটপালট

হইয়া গেল। রমা দেখিল, এ তাহারই রমেশদা, যার নিকট তার 'রাণীর' মর্যাদা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। আমরা বুঝি, হৃদয় তাহার তখনই রমেশের নিকট ছুটিয়া যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বাধা দিল পল্লীসমাজ। তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তখন পল্লীসমাজের একনিষ্ঠ পরিচালক বেণী ঘোষাল, যার কাছে একটু আগেও রমা পল্লী-সমাজের নিকট আপন অকুণ্ঠ আনুগত্য জানাইয়াছে। যথাসময়ে মাসীর আগমনে পল্লীসমাজের অন্তরালে রমা আত্মরক্ষা ও আত্মগোপনের ভাণ করিয়া বাঁচিল কিন্তু ইহার বেণী ঘোষাল পরিচালিত পল্লীসমাজের গৌরব যে পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইল, হৃদয়ের নিকট রমার আপন হীনতা ততই প্রকাশ পাইল এবং হৃদয় তাহার সেই পরিমাণেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। এইখানেই পল্লীসমাজের সঙ্গে রমার হৃদয়ের দ্বন্দ্বের আরম্ভ এবং এইখানেই তাহার পরাজয়ের সূচনা। ইহার পর যদু মুখুজ্যের এই কন্যাটির হৃদয় রমেশের নিকট দুর্বোধ্য হেঁয়ালিতে পরিণত হইয়া গেল। মাসী তাহার পল্লীসমাজকে কেবল রমেশের অত্যাচার হইতেই রক্ষা করে নাই, বিশ্বেশ্বরীর আপন গৃহে গিয়া সেখানেও পল্লীসমাজের শক্তি ও সামর্থ্য দেখাইয়া আসিয়াছিল। জ্যাঠাইমার, বিশ্বেশ্বরীর জন্য যাহাতে পল্লীসমাজের সম্মান ও মর্যাদা হানি হইতে না পারে সে-ভারও মাসীই নিয়াছিল। কিন্তু এখানেও রমেশ রমার ইঙ্গিতই দেখিয়াছিল।

কিন্তু ইহা ছাড়াও রমেশ রমার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিল। মাষ্টার মহাশয়ের নিকট সে শুনিয়াছিল, যদু মুখুজ্যের কন্যা সতী-লক্ষ্মী। একমাত্র তাহার দয়ায়ই স্কুলটি টিকিয়া আছে। শুনিয়া রমেশের চিত্ত প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাই মাছের ভাগের জন্য সে ভজুয়াকে পাঠাইয়াছিল রমার কাছেই। কিন্তু রমা যে কত নিরুপায়, তাহার নারীহৃদয় যে পল্লীসমাজের সঙ্গে নিয়ত দ্বন্দ্বে নিরত এবং অনবরতই যে রমা সেই যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে এ খবর রমেশ রাখিত না। তার দেওয়া সম্মান যে রমার পক্ষে কত বড়

আঘাত, ইহা জানিবার সুযোগও রমেশের ছিল না। জানিলে কখনই সে ভজুয়ার নিকট বলিয়া পাঠাইত না—আমি নিশ্চয় জানি, মা-জীর জবান থেকে কখনও ঝুটা বাত বা'র হবে না। রমেশ জানিত না, পল্লীসমাজের সম্মান, সত্যই হউক অথবা মিথ্যা হউক, রমাকে রাখিতেই হইবে। তাই তাহার আপন বিশ্বাস সে হৃদয়ের নিকট গিয়া নিষ্ফল আঘাত করিবে, ব্যথা দিবে, বেদনা দিবে কিন্তু প্রতিষ্ঠা পাইবে না। এই প্রতিষ্ঠা না পাওয়া রমেশের নিকট যাহাই হউক না কেন, ইহার আঘাত যে রমার নিকট কত বড় ইহাও রমেশ অনুভব করে নাই। রমার ভয় ছিল, রমেশের জন্য কোন প্রকার সহানুভূতির ফাঁক দিয়া তাহার আপন গোপন অন্তরটি কোন ক্রমে লোকচক্ষুর নিকট প্রকাশ হইয়া না পড়ে। তাই সমস্ত দিক সে শক্ত করিয়াই বাঁধিতে চাহিয়াছিল। মাছ ভাগ ভজুয়ার আসার আগেই হইয়া গিয়াছিল সুতরাং কোনরূপেই রমেশের হইয়া মাছ ভাগের অনুরোধ সে আর করিতে পারে না। তাই সে যাহা পাকে না বলিয়া রমেশের বিশ্বাস, যাহা সম্ভব নয় বলিয়া তাহার নিজেরও বিশ্বাস তাহাই সম্ভব হইল। সে মিথ্যার আশ্রয় লইয়াই পল্লীসমাজের মর্যাদা রক্ষা করিল। তাহার আপন গৌরব, তাহার আপন হৃদয়, তাহারই পায়ের নীচে লুটাইয়া গেল। হয়ত একটা দীর্ঘশ্বাসই তাহার এই সময়ের অন্তরের চিরসাক্ষী হইয়া রহিল। এই একান্ত অনভিপ্রেত মিথ্যা তাহাকে কত তীব্রভাবে বিদ্ধ করিল, তাহা তাহার আপন অন্তর ভিন্ন অন্য কেহই দেখিল না। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন,—'ভজুয়ার কথা শুনিয়া তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি পলকের জন্য রাঙা হইয়াই এমনি সাদা হইয়া গিয়াছিল, যেন কোথাও এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নাই।' বিশ্বেশ্বরীও তাহাকে একদিন এই কথাই বলিয়াছিলেন। জ্যাঠাইমা তাহাকে জানাইয়াছিলেন—সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদ সত্ত্বেও রমার উপরে রমেশের অপরিসীম বিশ্বাস রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন,—বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করার দাম যতই হোক না, রমেশের এ প্রাণটার দাম তার

চেয়ে অনেক বেশী।" রমেশের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে তিনি প্রকারান্তরে রমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বরী সেদিন বুঝিতে পারেন নাই, রমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কত বড় মিথ্যা। ন্যায়পরায়ণ মাতৃস্নেহসিক্ত হৃদয় ন্যায়ের সম্মান রক্ষার জন্য যাঁহাকে অত্যাচাররূপে দেখিতেছিলেন, তাহারই অন্তরালে আর একটি নারী হৃদয় যে ততোধিক অত্যাচারে অত্যাচারিত হইতেছে, তাহা তিনি দেখিতে পান নাই। তাই নারীহৃদয়ের প্রতি অত্যাচারের উপর অবিচারের বোঝাই তিনি চাপাইতেছিলেন। বিশ্বেশ্বরীর প্রত্যেকটি কথাই রমার হৃদয়ের কথা। আমরা জানি, ইহা অপেক্ষা কাম্য তাহার জীবনে কিছুই নাই। হৃদয় যাহার জন্য কাঁদে, যাহার সামান্য দুঃখ দূর করিতে চরম আত্মবিসর্জন তাহার নিকট তুচ্ছ, তাহার সর্বনাশের মুহূর্তে সে পাশে গিয়া দাঁড়াইতে পারিল না, তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। শুধু ইহাই নহে। তাহার দুঃখের মাত্রা সে নিজেই বাড়াইয়া দিতেছে। ইহা অপেক্ষা বড় অভিসম্পাত জীবনে তাহার কি হইতে পারে? তাই ঘটনাচক্র অত্যন্ত নির্মম হইয়াই তাহাকে আঘাত করিতেছিল। জগৎ জানিল, রমাই রমেশের সকল সর্বনাশের মূল। রমেশ নিজেও জানিল, রমা অপেক্ষা জীবনে তাহার বড় অমঙ্গল আর কিছুই নাই। কিন্তু রমা নিজে জানে ইহা অপেক্ষা অধিক মিথ্যা আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু সে নিরুপায়। তাই আমরা দেখি, সমাজ রমাকে আঘাত করে, বিশ্বেশ্বরীর উপদেশ তাহাকে আঘাত করে। রমেশের বিশ্বাস তাহাকে আঘাত করে। এইরূপ অবস্থার মধ্যে আমরা বিজয়াকেও দেখিয়াছিলাম। একান্ত অনভিপ্রেতভাবেই নরেনের সমস্ত অমঙ্গল ঘটিতেছিল তাহার দ্বারা। কিন্তু সেখানে তাহার বিরুদ্ধ শক্তি ছিল রাসবিহারী। পল্লীসমাজের নিষ্ঠুররূপ বিজয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নাই। তাই শেষ পর্যন্ত বিজয়ার অন্তরের কামনাই জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু রমার হৃদয়ের দ্বন্দ্ব প্রধানতঃ পল্লীসমাজের সঙ্গে, সুতরাং জয়ের আশা সে কোনমতেই করিতে পারে না। সেই জন্যই এই

যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া এবং পল্লীসমাজের নিকট পরাজয়ের গ্লানিকেই মানিয়া এই সমাজ হইতে রমাকে বিদায় লইতে দেখি।

তারকেশ্বরে রমেশের সঙ্গে রমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রমেশ রমাকে চিনিতে পারে নাই কিন্তু রমা তাহাকে চিনিয়াছিল। তাই সঙ্গে করিয়া তাহাকে আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় রমেশকে সে পথেই আপন পরিচয় দিয়াছিল। রমেশও রমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিল। রমেশের মুখেই রমা শুনিয়াছিল, তারকেশ্বরে তাহার কোন আশ্রয় নাই, একটা দিন কোনমতে কোথাও অপেক্ষা করিয়া তাহাকে থাকিতেই হইবে। তাই অসহায় অবস্থায় রমা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া তারকেশ্বরে পল্লীসমাজ ছিল না। অন্ততঃ সে সমাজের জন্য রমেশের কোন ভয় ছিল না। তাই ভোজ্য এবং পেয় নিতান্ত সাধারণ হইলেও এই অল্পতার ত্রুটি সে আপন যত্ন দিয়াই পূর্ণ করিতে পারিয়াছিল। রমা নিজেকে নিজে বুঝাইয়াছে, এই যত্ন করা তাহার কর্তব্য; কারণ, তাহার ভাবনা ছিল, পাছে অতিথির খাওয়া না হয় এবং সেইজন্য পরের কাছে তাহার নিন্দা হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"খাওয়া না হইবার দুর্ভাবনা যে তাহার নিজেরই কত আপনার এবং সে যে তাহার অন্তরের অন্তরতম গহ্বর হইতে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়া তাহার সর্ববিধ দ্বিধা সঙ্কোচ ছিনাইয়া লইয়া, এই খাওয়ার জায়গায় তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল, একথা কেমন করিয়া আজ সে নিজের কাছে লুকাইয়া রাখিবে?" কিন্তু ইহার পরেই একবার রমেশ তাহাকে বলিয়াছিল—'আমি ত তোমার কেউ নই রমা, বরং তোমার পথের কাঁটা। তবু প্রতিবেশী হিসেবে আজ তোমার কাছে যে যত্ন পেলুম' সংসারে ঢুকে এ যত্ন যারা আপনার লোকের কাছে নিত্য পায়, আমার ত মনে হয় পরের দুঃখ কষ্ট দেখলে তারা পাগল হয়ে ছোটে।' খাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে সে কথা রমেশ সেইদিন প্রথম জানিয়াছিল এবং সে কথা সে রমার নিকট মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকার

করিয়াছিল। শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, কথা শুনিয়া রমার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া বারংবার শিহরিয়া উঠিয়াছিল। হৃদয় হয়ত তাহার আকুল আবেগে বলিয়া উঠিতে চাহিয়াছিল—ইহাই তাহার জীবনের মধুরতম ক্ষণ। এমন সময় আর হয়ত আসিবে না। রমেশ তাহাকে জানাইয়াছিল,—দিনটা তাহার নিন্দা সুখ্যাতির বাহিরে। রমেশের পক্ষে ইহা প্রাণভরা পরিতৃপ্তির বাণী ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তীক্ষ্ণ শরের মতই ইহা এক নিরীহ প্রাণকে আঘাত করিবে ইহা সে বুঝিতে পারে নাই। এই নীরব আঘাত, এই মধুর বিষাক্ত শর রমা নীরবেই সহ্য করিয়াছিল। নির্জন গৃহের মধ্যে তাহার নীরব অশ্রুপাতের কোন সাক্ষীই ছিল না। জীবনে সে অভিশপ্ত, তাই যাহা কিছু প্রিয়, মধুর তাহাই তাহার নিকট বিষ।

রমার জীবনে আঘাত একদিক হইতেই আসে নাই। পল্লী-সমাজের নিষ্ঠুর তূণীরে তাহার জন্য ইহা অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ এবং বিষাক্ত তীর আরও সঞ্চিত ছিল। তারকেশ্বরে রমেশকে কাছে বসাইয়া খাওয়াই পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিবার সুযোগ সে পাইয়াছিল। হয়ত এই দিনটিকে যে স্মৃতিতে আঁকিয়া রাখিতে পারিত, নীরব অশ্রু দিয়াই হয়ত দিনটিকে সে পূজা করিত কিন্তু এখানেও তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল সমাজ। খাওয়ার পরে যে রমেশের পরিতৃপ্তির বাণী রমার কর্ণে মধু বর্ষণ করিয়াছিল, মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে তাহাকে জেলে পুরিতে হইল। পল্লীসমাজের কঠোর শাসনে ইহা না করিয়া রমার উপায় ছিল না। কারণ, তাহা না হইলে তাহার মহামায়ার পূজায় কেহ আসিবে না, ছোট ভাই যতীনের উপনয়নে তাহার বাড়ীতে কেহ অন্ন গ্রহণ করিবে না। পল্লীসমাজের কোলে পালিত এবং বর্ধিত এক অসহায় রমণীর পক্ষে এই ভীতি যে কত ভয়ানক তাহা উপলব্ধি করা সহজ নহে। তবুও হয়ত ইহাও সে উপেক্ষা করিতে পারিত, যদি পল্লীসমাজ তাহার নারীত্বকে সহানুভূতির চক্ষে দেখিত, যদি আপন ন্যায়ের দণ্ডে সমাজকে মানিতে গিয়া নারীত্বের অবমাননার

সম্ভাবনা না থাকিত। রমা পল্লীসমাজকে জানিত। বেণী ঘোষাল এবং গোবিন্দ গাঙ্গুলিকে সে চিনিয়াছিল। তাই ইহাদের কাছে সে সুবিচার আশা করে নাই। আপন স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগিলে ইহারা কিরূপ উদ্ধত রূপ ধারণ করে তাহা অজ্ঞাত ছিলনা। সেই জন্যই সে পল্লীসমাজের আদেশ স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

তবে পল্লীসমাজের নিকট এই পরাজয় স্বীকারে রমা নিজেও যে আংশিকভাবে দায়ী নয় তাহা নহে। রমার অন্তরে যদি পার্বতীর শক্তি থাকিত তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে হয়ত এইরূপ শোচনীয় পরাজয় ঘটিত না। আপন চিন্তাধারায় রমা কখনও পল্লীসমাজকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার ন্যায় অন্যায়ের বিচারের মাপকাঠিও কখনই পল্লীসমাজকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেইজন্য সে না পারিয়াছে রমেশকে উপেক্ষা করিতে, না পারিয়াছে পল্লীসমাজকে উপেক্ষা করিতে। তাই দুইদিক হইতেই সে কেবল আঘাতের পর আঘাত সহ্য করিয়াছে। তাহার অন্তরের দুর্বলতাই ইহার জন্য দায়ী। তবুও রমা যে রমা, সে যে পার্বতী নয়, ইহা ক্ষোভের কারণ নয়। কারণ, পল্লীসমাজের বিরুদ্ধ প্রতিবেশের মধ্যে পার্বতীর সন্ধান অধিক মিলেনা। তাহা ছাড়া কোন নারীই অদ্ভুত শক্তিশালী না হইলে সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারে না। জগৎ তাহার নিকট সীমাবদ্ধ। নারী চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছে তাহার দোষগুণের বিচারক অন্য ব্যক্তি। সে পরমুখাপেক্ষী, এবং পরনির্ভরশীল। সম্মান অসম্মান যতটা তাহার নিজের কৃতকার্যের জন্য নয়, তাহার চেয়ে বেশী নির্ভর করে অন্যের প্রশংসা অপ্রশংসার উপর! তাই রমার হৃদয়ের এই দুর্বলতা খুব স্বাভাবিক। পল্লী-সমাজের নিকট তাহার পরাজয়ে অসম্ভব কিছুই নাই।

রমা রমেশকে জেলে দিয়াছিল মিথ্যা সাক্ষীর জোরে, লাঠিয়াল আকবরকে পাঠাইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে বাঁধ কাটিতে এবং মাসীও ছোট খাটো কাজে তাহাকে সাহায্যই করিতেছিল। তাই বাহিরের দিক হইতে দেখিলে পল্লীসমাজের সঙ্গে রমার কোন দ্বন্দ্ব

ছিল না বলিয়াই মনে হয়। পল্লীসমাজের মর্যাদা রমা সম্পূর্ণভাবেই রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু দ্বন্দ্ব বাহিরে নয়, দ্বন্দ্ব ছিল রমার অন্তরে। সে অন্তরকে একমাত্র জ্যাঠাইমা ভিন্ন আর কেহই দেখিতে পায় নাই, বুঝিতে পারে নাই। বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলি পরিচালিত পল্লীসমাজ তাহাকে জানিবার প্রয়োজনও কখনও অনুভব করে নাই। পল্লীসমাজের প্রতি রমার ভয় কত প্রবল, আমরা তাহা দেখি যতীনের সঙ্গে তাহার কথাবার্তায় তাহার নিজের মাসীও সেই পল্লীসমাজেরই অঙ্গ। তাই মাসীর সামনে রমেশের নাম উচ্চারণের শক্তি রমার ছিল না। তা সে যতীনের সঙ্গেই হউক বা অন্য যে ব্যক্তির সঙ্গেই হউক, বিষয়বস্তু তাহার স্কুলই হউক অথবা অন্য কিছুই হউক।

অনেকে হয়ত বলিবেন, ইহা রমার হৃদয়ের দুর্বলতা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। এই দুর্বল হৃদয়ের জন্যই যেখানে ভয়ের কোন কারণ ছিলনা, সেখানেও সে ভয়ই দেখিয়াছিল। কিন্তু পল্লীসমাজে যে ভয়ের কোন কারণ ছিল না, তাহা মাসীকে দেখিলেই মনে করিবার মতো যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তবুও রমেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, রমেশের প্রতি তাহার হৃদয়ের প্রকৃত মনোভাব নিপীড়িত রমেশের পাশে দাঁড়াইতে তাহাকে কখনই যে প্ররোচিত করে নাই তাহা নয় ; রমা বেণী ঘোষালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—'আচ্ছা বড়দা, রমেশদা যদি জেলে যান, সেকি আমাদের নিজেদের ভারী কলঙ্কের কথা নয়? আমরা জানি, রমার অন্তর সেদিন আরও কিছু বলিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু পল্লী-সমাজের ভয়ে সে হৃদয় প্রকাশ করিবার তাহার কোন উপায় ছিল না। সমাজের নিষ্ঠুরতা রমার নিকট অজানা ছিল না, নিষ্ঠুর সমাজকে সে চিনিত। সমাজ তাহার অন্তরের কল্যাণ কামনাকে দেখিবে না ইহা সে জানিত। তবুও দেখি, রমেশকে পল্লীসমাজের বিরুদ্ধে এবং সেই সঙ্গে তার আপনার বিরুদ্ধে সাবধান করিবার জন্য রমা গোপনে রমেশের নিকট গিয়াছিল। পল্লীসমাজের বিরুদ্ধে

রমা প্রকাশ্য বিদ্রোহে সাহসী হয় নাই, তবুও তার হীন ষড়যন্ত্র হইতে রমেশকে রক্ষা করাই ছিল তাহার অভিপ্রায়। সেদিন হঠাৎ পুলিশ আসিয়া পড়িলে বিপদের মুখে রমেশকে একাকী ফেলিয়া সে পলাইতে পারে নাই। রমেশের বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া সে আপনার বিপদ ভুলিয়া গিয়াছিল। রমেশ তাহাকে কালবিলম্ব না করিয়া বাহির হইয়া যাইতে বলিয়াছিল। রমা কাঁদিয়া বলিয়াছিল—"আমি যাবো না।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রমা থাকিতে পারে নাই। রমেশ জোর করিয়াই দুটি ভাই বোনকে খিড়কির পথে বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়াছিল। আমরা দেখি, রমা এখানে পল্লীসমাজকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু পারে নাই। পল্লীসমাজে তাহার কত ভয়, সে তাহার কান্না দেখিয়াই আমরা বুঝি। তবু একদিন সে পল্লী-সমাজকে সম্পূর্ণই উপেক্ষা করিয়াছিল। লক্ষ্মীর কথার প্রতিবাদ জানাইয়া সে বলিয়াছিল—"লক্ষ্মী, ওঁর মত লোকের হাতে মরতে পাওয়াও ভাগ্যের কথা; আজ মারা গেলে তোমার বাবা স্বর্গে যেতে পারত।" আমরা জানি, ইহাই রমার হৃদয়ের গভীর সত্য। গভীর উত্তেজনার বশেই সেদিন এই সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু পল্লীসমাজের একান্ত অনুগত হইয়াও রমা শেষ পর্যন্ত তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। পল্লীসমাজের নিকট সে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল কিন্তু ইহা সত্ত্বেও একদিন তাহাকে পল্লীসমাজ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সমাজ তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিল। একমাত্র বিশ্বেশ্বরীর নিকটই হৃদয় তাহার প্রকাশ পাইয়াছিল, একমাত্র জ্যেঠাইমা-ই বুঝিয়াছিলেন তাহার নিদারুণ আঘাতের পরিমাণ কত। বিশ্বেশ্বরীর হৃদয়ই ছিল রমার একমাত্র সান্ত্বনার স্থান। তাই তাঁহারই নিকট রমা তাহার নিভৃত হৃদয়ের গোপন কথা বলিয়াছিল। মৃত্যুর পর সে রমেশের নিকট জানাইতে বলিয়াছিল—যত মন্দ বলিয়া রমেশ তাহাকে জানিয়াছিল, তত মন্দ সে ছিল না, যত দুঃখ সে রমেশকে দিয়াছে, তাহার অনেক বেশী দুঃখ সে নিজেও পাইয়াছে। বিশ্বেশ্বরীই

রমাকে চিনিয়াছিলেন। তাই রমার কথা শুনিয়া সেদিন তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। কাশীধাম যাত্রার পূর্বে তাঁর মুখে একটি মাত্র প্রশ্ন আমরা শুনি—"কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এতবড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন? এ কি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা?"

আমরা জানি, এ প্রশ্ন শুধু বিশ্বেশ্বরীর একার নয়, সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের পাঠক-সমাজেরও এই একই প্রশ্ন।

বন্দনা

শরৎসাহিত্যে আমরা সাবিত্রী, বিজয়া, ললিতা, পার্বতী, রাজলক্ষ্মী, অন্নদা দিদি প্রভৃতি অনেক নারীরই সাক্ষাৎ পাই কিন্তু বন্দনা ইহাদের কাহারও সমগোত্রীয় বা সমশ্রেণীর নয়। যে পারিবারিক দুঃখের ভিতর দিয়া পার্বতী, বিজয়া, জ্ঞানদা, সরযূ প্রভৃতিকে আত্মপরিচয় দিতে হইয়াছে, বন্দনার জীবনে সে ধরণের দুঃখ কখনও উপস্থিত হয় নাই। জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে তাহাকেও যুদ্ধ করিতে হইয়াছে কিন্তু সে সমস্যা শরৎসাহিত্যের সকল নারীর সাধারণ সমস্যা নয়।

আমরা নারী-হৃদয়ের এক সমস্যার সম্মুখীন হইতে দেখিয়াছিলাম অচলাকে, কিন্তু অচলার সমস্যাও বন্দনা-জীবনের সমস্যা নয়। শিক্ষিতা অচলা ব্রাহ্মমহিলা, বন্দনাও শিক্ষিতা এবং বিদুষী কিন্তু সুরেশ-মহিমের আকর্ষণ-বিকর্ষণ অচলার আপন সমাজেরও সাধারণ সমস্যা নয়। অবস্থা সঙ্কটে অচলার জীবনে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাই বলিয়া সেই সমাজের অন্য সকলের পক্ষে ইহা সত্য হইবে তাহা নয়। কিন্তু বন্দনাকে আমরা সেভাবে দেখিতে পারি না। বন্দনা শিক্ষিতা কুমারী; মুখুজ্যে পরিবারে পদার্পণের পূর্বে বাঙ্গালী সাধারণ সমাজের সঙ্গে তাহার কোন পরিচয়ই ছিল না। বোম্বাইএ বা বম্বে নামক স্থানে ভালবাসার কলের টানাপোড়েন দেখিয়াই তাহার জীবন কাটিতেছিল। সেখান হইতে বাংলাদেশের সাধারণ বাঙ্গালী অথবা সহরের শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজকেও দেখিবার কোন সুযোগ তাহার ছিল না। তাই বাহির হইতে এই সমাজের বিরুদ্ধে নানা কল্পিত অভিযোগই সে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল।

যে-মুখুয্যে পরিবার পরবর্তীকালে বন্দনার এতবড় আকর্ষণের বস্তু হইয়াছিল, সমস্ত কুসংস্কার সত্ত্বেও যাহার মোহ সে জীবনে কাটাইতে পারিল না, যেখানে সে বিপ্রদাসকে পাইয়াছিল, দয়াময়ীকে পাইয়াছিল,

দ্বিজদাসকে পাইয়াছিল, বাসুকে পাইয়াছিল, অন্নদাকে পাইয়াছিল, সেই গৃহেরই প্রথম আতিথ্য তাহাকে উপবাসের মধ্যদিয়া গ্রহণ করিতে হইল কেন? কেন অমন আঘাত করিয়া এবং আঘাত সহিয়াই এই গৃহের সঙ্গে তাহার প্রথম পরিচয় ঘটিল? ইহার কারণ বন্দনা বোম্বাই-বাঙ্গালীসমাজের এক কঠিন দুর্ভেদ্য চশমা পরিয়া আসিয়াছিল। তাহার ভিতর দিয়া সে মুখুয্যে-পরিবারের কোমল অন্তরটিকে দেখিতে পায় নাই। তারপরে বিপ্রদাসের নিকট হইতেই সে এই পরিবারের পরিচয় একদিন পাইয়াছিল। বিপ্রদাসকে দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল, যে আত্মমর্যাদাবোধ শুধু অহঙ্কারের নেশা জাগাইয়া দেয়, অন্যকে আঘাত করিয়া তাহারই মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজে, তাহা কত মিথ্যা, কত অসার। বিপ্রদাসের মুখে বন্দনা শুনিয়াছিল, মুখুয্যে-পরিবারের যে-মাকে সে অপমান করিয়া তাহার আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, বিপ্রদাসের সেই মায়ের আত্মমর্যাদাবোধ কাহারও অপেক্ষা কম নহে। 'মা না হয়ে, পরের ছেলের মা হয়ে' দয়াময়ী এই পরিবারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সবাই সেদিন দেখিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে সদ্য মাতৃহারা বিপ্রদাসের আশু অমঙ্গল। কিন্তু দয়াময়ী বিষের বদলে অমৃত সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। বিপ্রদাস সেখানে যে মাতৃ-হৃদয়কে পাইয়াছিল, দ্বিজদাস তাহার আপন মায়ের মধ্যে একদিনের জন্যও তাহা পায় নাই। বিপ্রদাসের নিকট হইতেই বন্দনা ইহা শুনিয়াছিল। শুনিয়া এই পরিবারের প্রতি তাহার গায়েপড়া অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সে লজ্জিতই হইয়াছিল। বিপ্রদাসের নিকট সে বলরামপুরে ফিরিয়া যাইবার যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার কারণও ইহাই।

আমরা দেখি, শেষ পর্যন্ত বন্দনা এই মুখুয্যে পরিবারেই প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু এই গৃহের সদর দরজার পথ কখনই উন্মুক্ত হয় নাই। মেজদি সতী এবং শাশুড়ী দয়াময়ী এই গৃহের বধূরূপে তাহাকে কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কল্পনার অসারতাও তাহাদের নিকট অগোচর ছিল না। মেজদিদির চিঠির ভিতর দিয়া বহু পূর্বেই বন্দনা দ্বিজদাসের পরিচয় পাইয়াছিল। কিন্তু সে পরিচয় মুখুয্যে পরিবারের

আচার নিষ্ঠার পরিচয় নয়, ছোঁয়াছুঁয়ির দোষ গুণ তাহার মধ্যে ছিল না। বিশেষ করিয়া দ্বিজদাসের চরিত্রের আকর্ষণীয় দিকটাই সে-পত্রে উদ্‌ঘাটিত হইত। তাই প্রথম দর্শনেই যে দ্বিজদাসের পাশে দাঁড়াইবার ইচ্ছা বন্দনার মনে জাগিয়াছিল তাহার সঙ্গে মুখুয্যে পরিবারের কোন সম্পর্কই ছিল না। শরৎসাহিত্যের অন্যান্য নারীচরিত্রের সঙ্গে বন্দনার পার্থক্য এইখানেই।

শরৎচন্দ্রের সকল নারীরই সমাজ আছে, জীবন তাহাদের আপন আপন সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। অনেক ক্ষেত্রে সমাজ তাহার সকল শক্তি লইয়া নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবনে তাহার দুঃখের বন্যা বহাইয়াছে। কিন্তু বন্দনার জীবনে সে-সমাজের কোন প্রভাব পড়ে নাই। বম্বের প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের প্রভাব সে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল সত্য কিন্তু কলিকাতার মাটিতে শিকড় গাড়িবার পূর্বেই তাহা শুকাইয়া গিয়াছিল। আপন মাসীর বাড়িতে বন্দনা সেই প্রবাসী বোম্বাই সমাজের সঙ্গেই মিশিয়াছিল সত্য কিন্তু ততক্ষণে মুখুয্যে পরিবারের পারিবারিক মর্যাদার ভাবধারা তাহার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই কলিকাতার কোথাও বন্দনা আপন স্থান খুঁজিয়া পায় নাই।

জীবনের শেষভাগে প্রকাশিত উপন্যাসগুলিতে শরৎচন্দ্র যে অনুর্বর বুদ্ধিবৃত্তির আলোচনাকে স্থান দিয়াছেন তাহার বেশীর ভাগই শুষ্ক। পাঠকহৃদয়ের অনুভূতির রসসঞ্চারে তাহা সঞ্জীবিত হইয়া উঠে না। সেখানে দয়াময়ী আছে কিন্তু তাহার নিকটে কল্যাণীও আছে। বিপ্রদাসের মাতার কর্তব্যবুদ্ধি থাকিলেও জ্যাঠাইমার প্রাণ সেখানে নাই। অন্নদা সেখানে অনুদি হইলেও শ্রীকান্তর অন্নদা দিদির আসনে বসিবার স্পর্ধা সে কোন মতেই করতে পারে না। এক কথায়, যে প্রাণশক্তিতে শরৎসাহিত্যের অন্যান্য চরিত্রগুলি ভরপুর, এখানে তাহার একান্তভাবেই অভাব।

বিপ্রদাস উপন্যাসে বন্দনা আমাদের সম্মুখে আসিয়াছে তাহার নারীহৃদয়ের এক সমস্যা লইয়া। নরনারীর পারস্পরিক ভালবাসা

শাশ্বত বস্তু কিনা তারই উত্তর হয়ত আমরা বন্দনার জীবনে পাই। খুব স্পষ্ট না হইলেও বন্দনা-চরিত্রের ভিতর দিয়া শরৎচন্দ্র এই উত্তর দিবার চেষ্টা যে করেন নাই তাহা নয়। হৃদয়ের এই আকর্ষণে যদিও বন্দনা স্বীয় সমাজের প্রভাবকেই সঙ্গে লইয়া চলিয়াছিল এবং শরৎচন্দ্রের এই ইঙ্গিত এই দিক দিয়া খুব অস্পষ্টও নয়। তবুও নরনারীর হৃদয়ের চিরন্তন সমস্যা যে এখানে উঁকি মারে না তাহা নয়।

বন্দনা ভালবাসার পাত্রকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু পায় নাই। শেষে মন তাহার ভাগ্যের ঘাটে আসিয়া নোঙর করিয়া বাঁচিয়াছিল। ভালবাসাবাসি প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণভাবে এড়াইয়া গিয়া তাহার আপন ভবিষ্যৎ জীবন নিরুদ্দেশের সন্ধানেই চলিয়াছিল। ভালবাসার মোহে জীবন তাহার বহু ঘাটে আসিয়াই বোঝা নামাইয়াছিল কিন্তু একবারও সে বুঝিতে পারে নাই সন্ধান করিয়া, বিচার করিয়া ভালবাসা মিলে না। ইহাই হয় ত শরৎচন্দ্রের বলিবার অভিপ্রায় ছিল।

মাসিমার বাড়ী হইতে ফিরিয়া সেখানকার সমাজ সম্বন্ধে বন্দনা বিপ্রদাসকে জানাইয়াছিল—"ওদের শুধু শাড়ী গাড়ী আর মিথ্যে ভালবাসার গল্প। কোথায় নৈনি আর মুসোরীর হোটেল আমি জানিওনে কিন্তু এদের নোঙরা চাপা ইঙ্গিত শুনতে শুনতে ইচ্ছে হোত কোথাও যেন ছুটে পালিয়ে যাই।" আজ এ সমাজকে বন্দনা চায় না, ইহার স্মৃতি তাহার মনকে বিষাইয়া তোলে কিন্তু একদিন এই সমাজই ছিল তাহার আদর্শ, এই সমাজই ছিল তাহার নিজের সমাজ। কিন্তু এই সমাজ সম্বন্ধে আজ তাহার নিজের অভিমত আমরা শুনি—"জ্ঞানের আস্ফালনে মুখের মধু তাদের বিষ হয়ে উঠেছে। জানে তারা আমার মেজদির মতো সবাইকে ভালবাসতে? জানে না।" আজ বন্দনা জানে, মাসিমার বাড়ীর এই সমাজে তাহার মেজদির ভক্তির কোন স্থান নাই। সে-সমাজে আছে পরস্পরবিদ্বেষ, আছে পরস্পর প্রতিদ্বান্দ্বতা কিন্তু বন্ধুত্ব নাই। বাহিরের নানা জাঁকজমক দিয়া ভিতরের অভাবটাকেই তাহারা অনবরত ঢাকিতে চায়। অন্যদিকে বিপ্রদাসের

বাড়িতে বন্দনা দেখিয়াছিল, সেখানে প্রাণ আছে, ক্ষুদ্রতা হীনতার বহু উর্ধ্বে এখানে প্রত্যেকের আসন। অন্নদা বা অন্নুদি, বিপ্রদাস বা বিপিন, দ্বিজদাস বা দ্বিজু, সতী বা বড়বউ, দয়াময়ী বা মা,—ইহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইলেও কেহ কাহারও নিকট অবোধ্য বা দুর্বোধ্য নয়। বন্দনা দেখিয়াছিল, দ্বিজদাসের দারুণ অবাধ্যতা এখানে কোন কাজেই বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। সমগ্র গৃহপরিবেশে স্নেহ ও সহানুভূতির এমন একটি স্থান আছে, দ্বিজদাসের অবাধ্যতা যত কঠিনই হোক না কেন, সেখানে গিয়া তাহা গলিয়া যাইতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। এই জন্যই বিপ্রদাসের এই পরিবার বন্দনাকে অমন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল।

কিন্তু তবুও এই পরিবারের অন্তরের সঙ্গে বন্দনার কোন পরিচয় ছিল না। সে ইহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বন্দনা দূরে থাকিয়া ইহার প্রাণশক্তি দেখিয়া কিছুটা অভিভূত হইয়াছে এবং দূর হইতেই ইহার আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে। তাই সে ইহার আচার-নিষ্ঠাকেই প্রাণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল।

বিপ্রদাসের সেবায় রত বন্দনাকে আমরা দেখি। শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"মিনিট দশেকের মধ্যে সে স্নান করিয়া প্রস্তুত হইয়া একটি জলপূর্ণ ঘটি লইয়া প্রবেশ করিল। ঘরের যে দিকটায় খোলা জানালা দিয়া পূবের রোদ আসিয়া পড়িয়াছে, সে স্থানটা জল দিয়া মার্জনা করিয়া নিজের আঁচল দিয়া মুছিয়া লইল, পূজার ঘর হইতে আসন কোশাকুশি প্রভৃতি আনিয়া সাজাইল, ধূপদানি আনিয়া ধূপ জ্বালাইল।" শুধু ইহাই নয়।
পূজা আহ্নিকের আয়োজন করিতে বন্দনার এখন দ্বিতীয়বার স্নানেরও প্রয়োজন হয়, কেবলমাত্র আপন মনের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য হইলেও ইহা করিতে হয়। কিন্তু তবুও এসবের সঙ্গে তাহার অন্তরের যে কোন যোগ নাই তাহাও আমরা বুঝি। তাহা যদি থাকিত তবে মুখুয্যেমশাইএর কাছে বিশ্বাসের বর চাইবার কোন প্রশ্নই তাহার মনে উঠিত না। আঘাতের বদলে আঘাত করিবার জন্যই বন্দনা একদিন

বিপ্রদাসকে বলিয়াছিল,—"এদিক দিয়া সত্যই আমার একটা মস্ত ভুল ভেঙ্গে গেছে। এখানে আপনাদের সংসারে এসে ভেবেছিলুম, এই সব আচার বিচার বুঝি সত্যিই ভালো। খাওয়া ছোঁয়া নিয়ম মেনে চলা, ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, পুজোর সাজগোছ করা, আরও কত কি খুঁটিনাটি; মনে হ'ত এসব বুঝি সত্যিই মানুষকে পবিত্র করে তোলে, কিন্তু এবার মাসীমার বাড়িতে গিয়ে এ মূঢ়তা ঘুচেছে। দিন কয়েক কি পাগলামিই না করেছিলুম মুখুয্যেমশাই। যেন সত্যিই এ বিশ্বাস করি, যেন আমাদের শিক্ষায়, আমাদের সংস্কারে কোথাও এর থেকে প্রভেদ নেই।" কিন্তু আমরা জানি, এসবে বিশ্বাস বন্দনার কোন দিনই ছিল না। যে শিক্ষা ও সংস্কার সে বম্বে হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছে, তাহার হৃদয়ের অনুরূপ ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহাই তাহাকে মুখুয্যে পরিবারের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। বিশ্বাস যদি সত্যিই সে করিতে পারিত, তাহা হইলে বিপ্রদাসকে ব্যর্থ আঘাত করিবার প্রলোভন কোনদিন তাহার হইত না।

এই জন্যই বন্দনাকে যে অবস্থায় আমরা দেখি, তাহার সমাজ নাই, স্থিতি নাই, শিক্ষা এবং সংস্কার তাহার আপন হৃদয়ের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত। এ অবস্থায় বন্দনা নারীজীবনের কোন প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর কিনা, তাহাও আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

বন্দনা নারীর সাধারণ চিত্র নয়। কোন বিশেষ অবস্থায় যে কোন নারী এরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া নারীজীবনের কোন ইঙ্গিতই যে বন্দনার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তাহাও নহে। শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, বলরামপুরে পদার্পণ করিবার আগে বন্দনা ভালবাসিয়াছিল সুধীরকে এবং তাহাকেই সে আপন অন্তরের সুস্থির কামনা বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাই সুধীরের সঙ্গে তাহার বিবাহ যখন স্থির হইয়া গিয়াছিল, বন্দনার নিজের অন্তরে ইহার বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ অথবা অভিযোগ ছিল না। সুধীর সেদিন তাহার হৃদয়ের এমন একটি স্থান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছিল, যেখানে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা সন্দেহ-সঙ্কোচ পৌঁছাইতে

পারে না। অন্ততঃ বন্দনা সেদিন ইহাই বিশ্বাস করিয়াছিল। কিন্তু ইহার পরেই তাহার জীবনে আসিল এক অনাস্বাদিতপূর্ব পরিবর্তন। বন্দনার এই অস্থির চঞ্চল জীবন, বিপ্রদাস যাহাকে 'মানুষ খোঁজা' আখ্যা দিয়াছেন, আর বন্দনা নিজেও যাহাকে 'শূন্যে হাত বাড়িয়ে মানুষ খোঁজা' বলিয়াছে, ইহা সত্যিই নারীপ্রকৃতি অথবা বিশেষ কোন শিক্ষা বা সংস্কারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ অথবা বিশেষ কোন বয়সের ধর্ম, এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর শরৎচন্দ্র দেন নাই। বিপ্রদাসের প্রশ্নের উত্তরে বন্দনা তাহাকে বলিয়াছিল, "আপনি জানতে চাইলেন কোনদিন সুধীরকে ভালবেসেছিলুম কিনা। সেদিন তো ভাবতুম সত্যিই ভালবাসি। কিন্তু তারপরেই আর একজন পড়লো চোখে, সুধীর গেল মিলিয়ে। এখন দেখি, সেও গেছে মিলিয়ে। শুনে হয়ত আপনার ঘৃণা হবে, মনে হবে এমন তরল মন ত দেখিনি।" বন্দনার মনের এই তরলতা, ইহাই নারীপ্রকৃতি, না বন্দনারই একান্ত নিজস্ব? জীবনের জয়যাত্রার পথে যে সুধীরকে সঙ্গীরূপে কল্পনা করিয়া একদিন সে আনন্দে অধীর হইত, তাহাকেই কোন অজানা অচেনা হেমনলিনী রায়ের জিম্মাতে রাখিয়া আসিতে তাহার এতটুকু বাধিল না কেন? যাহার মুখটেপা হাসির বহর এবং গায়েপড়া মন্তব্যের উত্তর দিতেও তাহার ইচ্ছা হয় নাই, সেই একান্ত অবাঞ্ছিতের নিকট তাহার এতদিনের ভালবাসাকে দলিত মথিত করিয়াও তাহার চোখে এক ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল না কেন? বলরামপুরে আসিয়া বন্দনা সুধীরের স্থানে দ্বিজদাসকে বসাইতে চাহিয়াছিল। তাই দ্বিজদাসের পূর্ণচন্দ্র যখন রাহুগ্রস্থ হয়, দয়াময়ীর স্বর্ণলঙ্কা যখন পবনপুত্রের পরিবর্তে সুধীরচন্দ্র দ্বারাই ভস্মীভূত হইতেছিল, হাসিমুখে বন্দনাই তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল, "সোনার লঙ্কার সবটা তো পোড়েনি, দ্বিজবাবু, অশোক কাননটা রক্ষে পেয়েছিল।" তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিল, দ্বিজদাস হতভাগ্য হইলেও বন্দনা হতভাগিনী নয়। দ্বিজদাসকে বন্দনা জানাইয়াছিল, বলরামপুরে তাহার পরিচয় মাত্র এক বেলার হইলেও বন্দনার জীবনে ইহার অর্থ এতটুকু অস্পষ্ট নয়। কিন্তু অর্থের এই একান্ত স্পষ্টতা সত্ত্বেও বন্দনার আকাশে

দ্বিজদাস কিছু দিন শরতের হালকা মেঘের মতই ভাসিতে লাগিল। তারপরে বন্দনার একান্ত অগোচরে দ্বিজদাসকে সেখান হইতে সরাইয়া দিয়া আর একজন আসিয়া আসন পাতিয়া বসিল। বিপ্রদাসকে বন্দনা ভালবাসিয়াছিল, তাহার কারণ বন্দনার তখন প্রয়োজন ছিল আশ্রয়। অস্থির চঞ্চলতা জীবনকে তাহার নানা ঘাটে আনিয়া ঠেকাইয়াছিল, কিন্তু কোনখানেই সে নিশ্চিন্ত নির্ভরতা পায় নাই। একমাত্র বিপ্রদাসের মধ্যেই সে ইহা দেখিয়াছিল, এখানেই সে তাহার প্রয়োজনীয় আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছিল।

আমরা জানি, বিপ্রদাসের ভালবাসা সুধীর কিম্বা দ্বিজদাসের ভালবাসা নয়। সতী তাহার সমস্ত স্বামীভক্তি সত্ত্বেও সেই সীমাহীন সমুদ্রের কিনারায় পৌঁছিতে পারে নাই। বন্দনার মার্জিত বুদ্ধি ও কুণ্ঠা-হীন ব্যবহার বিপ্রদাসের ভালবাসা পাইয়াছিল কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিবার সাধ্য তাহার ছিল না। বন্দনা বুঝিয়াছিল, বিপ্রদাসকে ভালবাসা তাহার স্বামী খুঁজিয়া লইবার অভিযান নয়। অথচ রহস্য কৌতুকে, আব্দারে আহ্লাদে নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় বৌদির প্রতি দ্বিজদাসের অসীম ভালবাসাও তাহারই মতো শ্রদ্ধায় আসিয়া মিলিতে পারে না। তাই আমরা দেখি, বন্দনা অকূলে কূল পায় না। দিশেহারা নারী অন্ধকারেই হাত বাড়াইয়া খুঁজিয়া মরে এবং শেষ পর্যন্ত অশোকের নিকট আসিয়া মন তাহার ভাগ্যের পরেই আত্মসমর্পণ করিয়া কোনক্রমে বাঁচিতে চায়।

আমরা জানি, বন্দনা অশোককে ভালবাসিতে পারে নাই। ভাল-বাসার নামেই বন্দনা অশোকের নিকট হইতে দূরে পলাইতে চাহিয়া-ছিল। দ্বিজদাস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—কেউ ভালবাসার ধার দিয়েও যাবে না, এই বুঝি আপনার সঙ্কল্প? বন্দনা উত্তর করিয়াছিল—হাঁ, এই আমার প্রতিজ্ঞা। বিয়ে যদি কখনও করি, মস্ত সুখের আশায় যেন মস্ত বিড়ম্বনায় না পা দিই। নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া বন্দনা সেদিন মাসীর ইচ্ছাকেই পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিল। পিতাকে সে সুস্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছিল-- আমি

ভাগ্যকেই বিশ্বাস করবো বাবা। স্বার্থস্নেহমুগ্ধ মাসী তাহাকে জানাইয়াছিল, সে বড় হইয়াছে, নিজের ভালমন্দর দায়িত্ব তাহার নিজের. তাহার মেজদির মতো চোখ বুজে ভাগ্যের খেলা তাহার সাজে না। উত্তরে বন্দনা তাহাকে কহিয়াছিল—"সাজে কি সাজেনা জানি না মাসিমা কিন্তু তাঁর মতো তেমনি করেই ভাগ্যকে আমি প্রসন্নমনে মেনে নেবো।" বন্দনার এই 'নূতন রিলিজন' তাহার পিতা এবং মাসীর সমাজে ছিল সমান ভাবেই দুর্বোধ্য। বাংলা থেকে সে যে একটি বস্তুকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, পিতার স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টিকে তাহা ফাঁকি দিতে পারে নাই। একটি অজানা ভবিষ্যতের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পনের অভিনয় বন্দনাকে এই পুরাতন সমাজে অপরিচিত এবং অনাত্মীয়ই করিয়াছিল। তবু বিপ্রদাসের সঙ্গে পরিচয়ের পরে ইহা ভিন্ন বন্দনা আর কোন উপায় ছিল না। বিপ্রদাসকে ভালবাসিয়া বিপ্রদাসের ভালবাসা পাওয়ার পর আর বন্দনার পক্ষে অশোককে ভালবাসা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। বিরাট বটবৃক্ষের ছায়া যে উপভোগ করিয়াছে, তাল তেঁতুলের ছায়ায় উপবেশনের মনোবৃত্তি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক বা সুস্থ নয়। সুতরাং এ অবস্থায় ভাগ্যই ছিল বন্দনার একমাত্র অবলম্বন। শুধু নিজের জন্য নয়, দ্বিজদাসকে সে এই পথেরই সন্ধান দিয়াছিল। বন্দনা দ্বিজদাসকে বলিয়াছিল বিবাহ করিতে। দ্বিজদাস তাহার নিকট জানিতে চাহিয়াছিল, ভালো না বেসে সে বিবাহ করিবে কেমন করিয়া। বন্দনা আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিয়াছিল—"একি বলছেন দ্বিজবাবু? এ ছলনা ছেড়ে দিন।" আমরা দেখি, দ্বিজদাসের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বন্দনা তর্ক করে না, তত্ত্ব অন্বেষণ এবং তত্ত্ব সন্ধান করিয়া সুখ আবিষ্কারের চেষ্টা তাহাব নিকট বৃথা কিন্তু তবুও দ্বিজবাবুর নিকট তাহার সনির্বন্ধ অনুরোধ—"আমি বলি, ও ফাঁদে পা দিয়ে কাজ নেই দ্বিজবাবু। ভালবাসার বনের মায়ামৃগ যে-বনে ইচ্ছা চরিয়া বেড়াক, মুখুয্যে-পরিবারের শান্তিপূর্ণ আশ্রমে তাহাকে টানিয়া আনিয়া সেখানকার শান্তি কেহ যেন নষ্ট না করে," ইহাই ছিল তাহার আন্তরিক ইচ্ছা এবং ইহাই ছিল দ্বিজদাসের নিকট তাহার অনুরোধ।

আমরা জানি, এই সমস্যা বন্দনাজীবনের ব্যক্তিগত সমস্যা নয়। ইহা নারীজীবনের সাধারণ সমস্যা। নিজের মনকে বন্দনা বুঝাইতে চাহিয়াছিল, হয়ত এই তাহার স্বভাব, হয়ত এ তাহার বয়সের ধর্ম। অন্তর শূন্য থাকিতে চায় না, হাতড়ে বেড়ায় চারিদিকে। কিন্তু ইহা যে নারীজাতিরই সাধারণ ধর্ম তাহাও আমরা বন্দনার কথায়ই বুঝি। বন্দনা বিপ্রদাসকে কহিয়াছিল—"আমি জানি, মেয়েদের এ লজ্জাকর কথা, কোন মেয়েই এ স্বীকার করতে চায় না, এ যেন আমার চরিত্রকেই কলুষ করে দেয়।" কিন্তু ইহার পরেই তাহাকে বলিতে শুনি—কিম্বা এমনিই হয়ত সকল মেয়েরই প্রকৃতি, ভালবাসার পাত্রটিকে সমস্ত জীবন ধরিয়া খুঁজিয়া পায় না।"

কিন্তু এখানেও বন্দনা ভুল করিয়াছিল। ভালোবাসার পাত্রকে খুঁজিয়া বেড়ানোর অভ্যাস মানুষের চিরন্তন হইলেও আজীবনই কেহ খুঁজিয়া বেড়াইতে পারে না। আজ যাহাকে সে একান্ত আপনার বলিয়া মনে করে, কাল তাহার মন সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া পড়িল কেন—কারণ অনুসন্ধান করিয়া ইহার উত্তর পাওয়া যায় না। আমরা দেখিয়াছি, বিজয়ার জীবনেও এমন এক সময় ছিল, যখন হাসিমুখে বিলাসের গলায় বরমাল্য দেওয়াকে সে আপনার সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিত। কিন্তু নরেন্দ্রের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই জীবনে তাহার এমন বিপর্যয় ঘটিল যে শত চেষ্টায়ও সে আপন চিন্তা ও ভাবনা হইতে নরেন্দ্রকে সরাইয়া দিয়া সেখানে বিলাসকে আর বসাইতে পারিল না। কিন্তু চির অস্থিরতাই নারীজীবনের পরিচয় নয়। বন্দনার নিজের জীবন দেখিলেই ইহা আমরা বুঝি। ভালোবাসার পাত্র অন্বেষণে বন্দনার মন বহুঘাটে আসিয়া ঠেকিয়াছিল সত্য এবং প্রতিবারই মোহ তাহার ছুটিয়াছিল নূতনের আকর্ষণে, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তবুও তরী তাহার বিপ্রদাসের সন্ধান এই যাত্রাপথেই পাইয়াছিল এবং সেখান হইতে সে যদি অন্য ঘাটে আবার গিয়া থাকে, তবে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই গিয়াছিল। আসলে, খোঁজা-খুঁজির পালা তাহার বিপ্রদাসের নিকট আসিয়াই শেষ হইয়াছিল।

কেহ হয়ত বলিবে, বিপ্রদাসের পরেও তো বন্দনা অশোকের গলায় বরমাল্য দিতে গিয়াছিল, দ্বিজদাসের জীবনসঙ্গী বরণ করিতে তাহার ভিতরে এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু সঙ্কোচ ত আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু আমরা জানি, ভাগ্য যদি বন্দনাকে অশোকেরই গললগ্ন করিত, সেখানেও বিপ্রদাসের প্রতি ভালোবাসাই তাহার জয়ী হইত। বিপ্রদাসকে ভালবাসিয়াই বন্দনা আপন ইচ্ছাকে বিসর্জন দিতে শিখিয়াছিল, ভোগ অপেক্ষা ত্যাগকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করিয়াছিল। মাসীকেও সে এই কথাই জানাইয়াছিল। বিপ্রদাসকে ভালবাসিবার সময় বন্দনা আর সুখের সন্ধান করে নাই, অশোককে বিবাহ করিয়া সে এক নির্লিপ্ত উদাসীনতাকেই জীবনে বরণ করিতে চাহিয়াছিল। এখানেই বিপ্রদাসের জয়। বিপ্রদাসের প্রতি ভালোবাসা বন্দনার জীবনে ব্যর্থ হয় নাই সুধীর বা দ্বিজদাসের মতো বিপ্রদাস কখনও বন্দনার জীবনে মিলাইয়া যাইবে না তাহা আমরা বুঝি।

শেষ পর্যন্ত বন্দনা দ্বিজদাসকেই বিবাহ করিল, ভাগ্যস্রোতে তাহার জীবনতরী দ্বিজদাসের ঘাটে আসিয়াই নোঙর করিল। কিন্তু এখানেও বিপ্রদাসেরই জয়। আমরা জানি, কেবল দ্বিজদাসের জন্যই মুখুয্যে-গৃহে আসা বন্দনার পক্ষে সম্ভব ছিল না। শুধু এই জন্যই অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ পথে সবার অলক্ষ্যে সে এ বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিল। বলরামপুরের বিরাট জমিদারগৃহে নববধূ আসিল, কিন্তু নহবৎ বাজিল না, মেয়েরা উলু দিল অস্ফুটে, শাঁখ বাজিল চাপা সুরে, বাসর গৃহ রহিল স্তব্ধ মৌন। আমরা জানি, ইহাই বন্দনার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, ইহার দ্বারাই বিপ্রদাসের ভালোবাসাকে বন্দনা একান্ত অন্তরের বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। এই পথেই বন্দনা পাইয়াছিল মুখুয্যে-পরিবারের মাকে এবং বড়দাকে। আমরা জানি, বাসুকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে মানুষ করিবার ভার লইতে এই বন্দনাই পারে, বিলাতযাত্রা-প্রয়াসী সাহেবের কন্যা সেদিন দ্বিজদাসের পত্নী হইলে ইহা পারিত না।

বন্দনার সঙ্গে তুলনা করিবার জন্যই শরৎচন্দ্র মৈত্রেয়ীকে এখানে আনিয়াছেন। শিক্ষা এবং সংস্কারে মুখুয্যেপরিবারের সঙ্গে মৈত্রেয়ীর

সম্বন্ধ বন্দনা অপেক্ষা অধিক। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে সে উদাসীন নয়। অভুক্ত দ্বিজদাসকে জোর করিয়া খাওয়াইবার শক্তি তাহার আছে, দয়াময়ী সম্বন্ধেও তাহার কর্তব্য ইহারই মধ্যে বুঝিয়া লইয়াছে। কিন্তু দয়াময়ী ও সতীবিহীন মুখুয্যে-গৃহে তাহাকে কোনমতেই মানাইত না। শ্বাশুড়ী এবং জা'এর বর্তমানে সে নববধূরূপে এই গৃহে আসিতে পারিত, আদরে আবদারে চিরদিন বধূজীবন যাপন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মুখুয্যেগৃহে সেদিন বন্দনারই প্রয়োজন ছিল, নববধূর নয়। স্বামী-শ্বাশুড়ীর বাহিরে এই বৃহৎ পরিবারে অন্নদি, সরকারমশাই, পূজা আহ্নিক, রাধাগোবিন্দজী সকলেরই সন্ধান বন্দনা রাখে। সেদিন এ'গৃহে লোক প্রয়োজন ছিল ভার বহিবার জন্য নয়, ভালবাসা পাইবার জন্য নয়, ভালবাসা বিতরণ করিবার জন্য। আমরা জানি, ভালোবাসার আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া বন্দনা খাঁটি হইয়াছিল, বিপ্রদাসের ভালোবাসার নিকষ পাথরে তাহার পরীক্ষা হইয়াছিল। তাই আমরা জানি, মুখুয্যেপরিবারে বন্দনা যদি একবিন্দু ভালোবাসা আর না পায়, তাহা হইলেও সে অভিযোগ করিবে না। কারণ, ভালোবাসার ভাণ্ডার তাহার পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল বিপ্রদাস, সেই অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে বন্দনা দ্বিজদাসকে, অন্নদিকে, বাসুকে এবং অন্য সকলকেই তাহা দান করিতে পারিবে।

ভৈরবী ষোড়শী না অলকা ?

নারীজনমের সার্থকতা কি এবং কোথায় এ প্রশ্ন বহুবার উঠিয়াছে। দেশবিদেশের বিভিন্ন মনীষী আপন আপন কাল ও দেশোচিত নানা উত্তরে সে সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা দেখি, বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণীও এই প্রশ্নেরই উত্তর। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, যে সার্থকতা নারী তাহার দেবীরাণীত্বে পায় নাই তাহা পাইয়াছিল সে ব্রজেশ্বরের হেঁসেলে। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইয়াছেন, নারীর গৌরব 'দেবীরাণীকী জয়ের' মধ্যে নাই কিন্তু আছে তাহার ক্ষুদ্র গৃহের গৃহিণীপনায়। নারীর জয় তাহার প্রভুত্বে নয়, কর্তৃত্বে নয়, নারীজয় একান্ত আত্মসমর্পণে। দেবীরাণীর ঐশ্বর্য ছিল, সামর্থ ছিল, শক্তি ছিল কিন্তু তবুও ইহার মধ্যে সে আপনাকে খুঁজিয়া পায় নাই। তাই স্বেচ্ছায় সকল প্রভুত্ব ছাড়িয়াই সে হরবল্লভের গৃহে প্রবেশ করিল। আমরা দেখি, ব্রজঠাকুরাণী যেখানে রূপকথা কয়, সাগর যেখানে বাসন মাজে, প্রফুল্ল তাহারই পাশে তাহার নিজের সঠিক স্থানটি করিয়া লইল। এবারে সে হয়ত সানন্দচিত্তেই মাজা বাসনগুলি থরে থরে সাজাইয়া রাখিবে। দেবীরাণীর কর্তৃত্বের নামগন্ধও এখানে নাই। কিন্তু তবুও সে ইহাই চাহিয়াছিল, ইহারই মধ্যে প্রফুল্ল তাহার নারীজনমের সার্থকতা দেখিতে পাইয়াছিল।

এই একই উত্তর আমরা শরৎচন্দ্রের ষোড়শীর জীবনেও দেখি। চণ্ডীর ভৈরবীর দায়িত্ব, কর্তৃত্ব, সম্পদ বিপদ লইয়া ভাগ্যনির্দিষ্ট এক পরিচিত খাদের মধ্য দিয়া ষোড়শী জীবনের কুড়িটা বছর প্রবাহিত হইয়া গিয়াছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে একদিনের জন্যও আপনার জীবন সম্পর্কে মনে তাহার কোন প্রশ্ন জাগে নাই। একদিনের জন্যও এখানে সে আপনাকে বেমানান বা খাপছাড়া মনে করে নাই। ইহার পরিণতি একদিন কি হইবে সে সম্পর্কেও তাহার মনে কোনদিন বিন্দু-মাত্র সন্দেহ জাগে নাই। হয়ত জীবনের বাকী দিনগুলিও এই ভাবেই

তাহার কাটিয়া যাইত। কখনও পূজাসাধন, কখনও বা পরোপকার করিয়া, সাগর, হরিহর, বিপিন, দিগম্বরের ভক্তি-ভালবাসার ভিতর দিয়াই হয় ত তাহার ভৈরবী-জীবনে যবনিকাপাত ঘটিত। কিন্তু তাহার এই সহজ সরল এবং নির্বিরোধ জীবনের চলার পথে একদিন এক প্রচণ্ড বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল। বীজগাঁও-এর জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী চণ্ডীগড়ের শান্তিকুঞ্জে এক অশান্তির ঝড় বহন করিয়া আনিলেন। সেদিন চণ্ডীগড়ের উপর দিয়া এক বিপ্লবের বিভীষিকা বহিয়া গেল। বিশ বছর আগে যে অলকা একদিন মরিয়াছিল সে-ই আসিয়া চিরন্তন নারীর পক্ষ হইয়া ভৈরবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। নারীত্বের সেই জয়-যাত্রার গতিকে ভৈরবীর দায়িত্ব, কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব কিছুই প্রতিরোধ করিতে পারিল না।

ষোড়শী ভৈরবী শুনিয়াছিল, জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী মন্দিরে খাসি বলি দিয়াছে। চণ্ডীর ভৈরবী সে। মন্দিরের সম্মান বা মর্যাদা তাহাকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। তাই অবমাননার প্রবল তাড়নায় পরিণামভয়হীন নারী উন্মাদিনীর ন্যায় শান্তিকুঞ্জে ছুটিয়া গিয়াছিল। আমার বুঝি, কি করিয়া মন্দিরের সম্মান রক্ষা করিতে হইবে এই চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা তখন তাহার মনে স্থান পায় নাই।

কিন্তু পরদিন আবার এই পথেই সে ফিরিয়া আসিয়াছিল। একটি মাত্র রাত্রি ইহার মধ্যে অতীত হইয়াছে। কিন্তু এই একটি রাত্রিই ষোড়শীর জীবনে কতই না বৈচিত্র, কতই না পার্থক্য আনিয়া দিয়াছে। সে আর সম্পূর্ণ ষোড়শী নাই, তাহার মধ্যে অলকা জাগিয়া উঠিয়াছিল। বিশ বছর আগে তাহারই মধ্যে এক অলকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া সে যেন উঠিয়া বসিল। এই ষোড়শীজীবন, এই চণ্ডীর ভৈরবীগিরি সকলই যেন তাহার স্বপ্ন। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন,—"জীবানন্দর মুখে অলকার নাম, তাহার সলজ্জ ক্ষমাভিক্ষা, তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা এমনি কত কি—যেন একটি ভুলিয়া যাওয়া কবিতার ভাঙা-চোরা চরণের মত রহিয়া রহিয়া তাহার মনের ভিতর আনাগোনা করিতে লাগিল।" জীবানন্দ ষোড়শীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—ছেলে-

বেলায় তোমার নাম অলকা ছিল না? শুনিয়া ষোড়শীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে উত্তর করিয়াছিল—আমার নাম ষোড়শী। ইহার বেশী আর কিছুই সে বলে নাই। তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তরের কারণ আমরা জানি। অলকা আসিয়া তখন তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। ইহার বেশী উত্তর দেওয়ার সাধ্যই তাহার ছিল না। নিজে সে তাহার ষোড়শী পরিচয় দিলেও জীবানন্দ মুখে অলকা নামকে সে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। জীবানন্দ তাহাকে ডাকিয়াছিল—অলকা। সে উত্তর দিয়াছিল—আজ্ঞে। জীবানন্দ যখন তাহাদের বিবাহের কথা তুলিয়াছিল, ষোড়শী কহিয়াছিল—"বিয়ে তো হয় নি। সে তো মিথ্যে। তা ছাড়া সে সমস্যা অলকার আমার নয়।" কিন্তু সত্যই কি তাই? সমস্যা কি শুধু অলকারই? ষোড়শীর ভৈরবীজীবনকে কি তাহা একটুও স্পর্শ করে নাই? কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। ষোড়শী মুখেই একথা বলিয়াছিল। অন্তর তাহার ইহাতে বিন্দুমাত্র সায় দেয় নাই। আমরা জানি, এ সমস্তই তাহার অভিমানের কথা। তাহা না হইলে কিসের জোরে সে একটি দিনরাত্রি শান্তিকুঞ্জে রোগীর শুশ্রূষা করিয়া কাটাইল? শান্তিকুঞ্জ হইতে ফিরিবার পরে সে দেবীপূজা করিতে অস্বীকার করিল কেন? কিসের জোরে সমস্ত লোকের সম্মুখে পিতার বিরুদ্ধে সে বলিতে পারিল,—'আমি এখানে নিজে এসেছি।' ষোড়শী ইহার পরিণাম যে জানিত না তাহা নয়। ষোড়শী বুঝিয়াছিল, কথাটা প্রচার হওয়া মাত্র চারিদিক হইতে কলঙ্ক তাহার মাথায় আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু তবুও ইহা ভিন্ন তখন তাহার উপায় ছিল না। সে তখন আর ষোড়শী নয়। যে ভৈরবী জীবানন্দের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিত সে তখন মরিতেছিল। তাহার অন্তরের সদ্য জাগ্রত অলকা বুঝিয়াছিল,—এই পথই তাহার গৌরবের পথ, ইহা তাহার নারীত্বের বিকাশের পথ। হেমকে ষোড়শী একদিন কহিয়াছিল,—মেয়েমানুষের এমন অনেক জিনিস থাকে যা বাপের চেয়েও বড়। আমরা জানি, সেদিন তাহার অন্তরে অলকাই কথা কহিয়াছিল। জীবানন্দ নিজের কাছেও একথা অজ্ঞাত ছিল না। সেই জন্যই একদিন তিনি ষোড়শীকে

নাই। জীবানন্দকে আমরা ইহার পরে দেখি—তিনি আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট, মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছেন, পরের উপকারের জন্য তিনি নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করিতে উদ্যত। আসলে জীবানন্দর ভিতরে এই সমস্ত সৎপ্রকৃতির যতই বিকাশ হইতে লাগিল, তাহার এই নিখুঁত অন্তরটা ষোড়শীর অন্তরের অলকার সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য স্নেহের বন্ধনে ততই জড়িত হইতে লাগিল। জীবানন্দর মুখে অলকা নাম ষোড়শীর নিকট কেবলমাত্র পূর্বের স্মৃতিই ফিরাইয়া আনিত না, তাহাকে অলকা-জীবনে প্রত্যাবর্তনেও প্রলুব্ধ করিত। শরৎচন্দ্রও আমাদের এই কথাই জানাইয়াছেন—জীবানন্দর মুখে এই অলকা নাম ছিল ষোড়শীর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। তিন অক্ষরের এই ছোট্ট কথাটি তাহার কোনখানে গিয়া যে আঘাত করিত সে ভাবিয়া পাইত না।

ইহার পরও ষোড়শী যে তাহার ভৈরবী জীবনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, আমরা জানি, সে তাহার মিথ্যা মাতৃত্বের মিথ্যা গৌরব লইয়া। ষোড়শী চণ্ডীগড়ের ভৈরবী। শরৎচন্দ্র আমাদের জানাইয়াছেন, এতবড় সম্মানিতা গরীয়সী নারী এ-প্রদেশে আর কেহ নাই। কত লোকের কত প্রকারের সুখ দুঃখ, কত প্রকারের আশা-ভরসা, কত ব্যর্থতা, কত অপরূপ আকাশ-কুসুমের সে নির্বাক ও নির্বিকার সাক্ষী। শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, "মন্দিরের অনতিদূরবর্তী দুস্থ ও দুরন্ত লোকগুলিকে সে শিশুকাল হইতেই ভালবাসিত। বড় হইয়া তাহাদের দুঃখ দুর্দশার চিহ্ন যতই বেশী করিয়া তাহার চোখে পড়িতে লাগিল, ততই তাহার স্নেহ সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহের ন্যায় দৃঢ় ও গভীর হইয়া উঠিতে লাগিল।" তাই মন্দিরের ভৈরবীগিরি তাহার নিকট আজ যতই তুচ্ছ হউক না কেন, এই স্নেহের বন্ধন কাটানো ষোড়শীর পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু নবজাগ্রত, নবজীবনে সঞ্জীবিত অলকা চণ্ডীগড়ে ভৈরবী জীবনে যে দুর্দম বন্যায় প্রবল বেগ আনিয়া দিল, তাহার নিকট এ সমস্তই ছিল বালির বাঁধ। এ যে কত বড় মিথ্যা, ষোড়শী তাহা সেইদিন বুঝিল, যেদিন হরিহর এবং সাগর ভিন্ন তাহার আর সকল প্রজাই জমিদারের

কাছারীতে তাহার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিতে মিলিত হইল। ইহার পরে চণ্ডীগড়ের ভৈরবীগিরিতে ষোড়শীর যে আর কোন আকর্ষণ থাকিতে পারে না, তাহা আমরা বুঝি। এই জন্যই ষোড়শীকে আমরা বলিতে শুনি—"দেবীর ভৈরবী পদের মধ্যে কি আছে যে এমন করে আঁকড়িয়ে থাকব? যে কেহ নিক না, কি আমার আসে যায়?" কিন্তু মনে আমাদের প্রশ্ন জাগে, চণ্ডীগড়ের ভৈরবীগিরি ত্যাগ করিয়া ষোড়শী এত বড় একটা মিথ্যা দুর্নাম মাথায় লইল কেন? হৈমর শ্বশুরের তলোয়ারের খাপের মতোই তাহার নিজের খাপখানাকেও কেন সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল না? ষোড়শী যদি দেবীপূজা হইতে অবসর গ্রহণ না করিত, কোন কলঙ্কই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তবুও কেন সে এই পথ গ্রহণ করিল? কিন্তু আমরা জানি, ইহা ভিন্ন ষোড়শীর তখন অন্য কোন উপায় ছিল না। শিশুকাল হইতে সে দেবীপূজা করিয়া আসিয়াছে। সে জানে, ভৈরবীকে স্বামীস্পর্শ করিতে নাই। সুতরাং তাহার এক রাত্রির শান্তিকুঞ্জ-জীবনের পরে তাহার দ্বারা আর দেবীপূজা চলিতে পারে না, এ সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ।

এ অবস্থায় ষোড়শীর একমাত্র উপায় ছিল পূর্ব ইতিহাস প্রকাশ করিয়া বলা। কিন্তু তাহার নিকট তখন এ পথও খুব সহজ ও সুগম ছিল না। প্রথমতঃ সে জানে, সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহার মায়ের দুর্নামের অন্ত থাকিবে না। ইহাও হয়ত সে উপেক্ষা করিতে পারিত, যদি সে জানিত, ইহা দ্বারা তাহার নারীত্বের মর্যাদা লজ্বিত হইবে না। কিন্তু যে জীবানন্দ একদিন তাহাদের বিবাহের ঘটনাটাকে কেবলমাত্র একটা পরিহাস বলিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন, আজ যদি আবার সমস্ত ইতিহাসকে সে একটা নিছক গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেয়, তখন এই মর্যাদাহীন নারীত্বের বোঝা লইয়া সে দাঁড়াইবে কোথায়? সমস্ত জগতের মিথ্যা কলঙ্ক আসিয়া তাহার অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে পর্যন্ত ডুবাইয়া দিবে, তাহা সে রোধ করিবে কি দিয়া? কে তাহাকে বিশ্বাস করিবে? তাই এই মিথ্যা দুর্নামের ভার বহন করা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ই তাহার ছিল না।

হেমকে সে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিল,—দুর্নাম যদি মিথ্যাই হয়, তবে সইবে না কেন? আমরা দেখি, ভৈরবী ষোড়শীর সম্মুখ ও পশ্চাতের পথ দুই দিকই রুদ্ধ। তাই সে ধরিল ফকির সাহেবের সঙ্গে শৈবালদীঘির পথ। কিন্তু তাহার অন্তরের অলকা সেদিন ইহাতে সায় দিয়াছিল কিনা আমরা জানি না। চণ্ডীগড় হইতে শৈবালদীঘির পথ সহজ হইতে পারে, কিন্তু এ পথ অলকার জন্য নয়, ইহা নারীত্বের স্বাভাবিক পরিণতির পথ নহে। এ পথে ষোড়শী ভৈরবীই চলিতে পারিত কিন্তু আজ সে মৃত। সার্থকতা তাহার—যেমন চণ্ডীগড়ের ভৈরবীগিরিতে নাই, তেমনি শৈবালদীঘির কুষ্ঠাশ্রমের দাসীত্বেও নাই।

তাই এখান হইতেও অলকাকে ফিরিতে হইল। শরৎচন্দ্র জানাইয়াছেন, তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল হৈম পিতার জন্য। কিন্তু আমরা জানি, ষোড়শী সেদিন ফিরিয়াছিল নিজের জন্যই। হৈম যদি সেদিন উপস্থিত না হইত, তবুও ফিরিতে তাহাকে হইতই। শৈবালদীঘিতে কত জল ছিল আমরা জানি না, কিন্তু সে জলে অলকার জীবন যে বাঁচিতে পারে না, তাহা আমরা বুঝি। তাই শৈবালদীঘি হইতে ফিরিয়াই অলকা তাহার স্বাভাবিক স্থানটি খুঁজিয়া পাইল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "সে হেঁট হইয়া মাথাটা তাহার জীবানন্দের বুকের উপর রাখিয়া স্থির হইয়া রহিল। বহুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না, একজনের বক্ষস্পন্দন আর একজন নিঃশব্দে অনুভব করিতে লাগিল।"

পার্বতী

এ সংসারে ভাগ্য নিয়া জন্মিয়াছিল রাজলক্ষ্মী। একছড়া বৈঁচির মালার মূল্যে যে শ্রীকান্ত-স্নেহ একদিন সে কিনিয়াছিল, নিজের ও অপরের জীবনের বহু ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যেও তাহা তেমনি অক্ষয় এবং তেমনি অটুট হইয়া রহিল। শ্রীকান্তের কঠোর উদাসীনতাকেও এক একসময়ে তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। শৈশবের সেই মালা বিনিময়ের বহুপরে। পাটনায় ধনীগৃহে পিয়ারী বাঈজী শ্রীকান্তের একবার মাত্র দর্শন পাইয়াই আপন সহজ, সরল রাজলক্ষ্মীরূপে ফিরিয়া গেল। নানা পরিবর্তনের মধ্যেও রাজলক্ষ্মী তাহার বহুদিন আগের ভুলিয়া যাওয়া এই রূপটি কখনও হারাইয়া ফেলে নাই। কিন্তু আমরা নীলকণ্ঠ চক্রবর্তীর কন্যা পার্বতীকেও এই শরৎ-সাহিত্যেই দেখি। আমরা দেখি, নিতান্ত অকারণেই স্বাভাবিক সমস্ত অধিকার কি জানি কেন তাহার হস্তচ্যুত হইয়া যায়। ভাগ্য তাহাকে কেবল পরাজয়ের খাদের মধ্যেই ঠেলিয়া দেয়। আমরা দেখি, সংসারে কেবলমাত্র অভিনয়ই তাহার ভাগ্যে ঘটে। সমস্ত জীবন ধরিয়া পার্বতী শুধু অভিনয় করিয়া গেল, মুহূর্তের জন্যও সে তাহার নিজের জীবনকে আর দশজনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে পারিল না। সমস্ত জীবন ধরিয়া পার্বতী তীব্রতম অভিশাপ বহন করিল, তাহার অব্যক্ত হৃদয়ের অসহ্য দুঃখদহন কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবার তাহার উপায় ছিল না। এই কল্যাণহীন, অভিশপ্ত জীবনকে স্মরণ করিয়া কেহ একবিন্দু অশ্রুমোচন করিয়া তাহার দুঃখের ভার লাঘব করিল না।

পার্বতী আশৈশব জানিয়া আসিয়াছে দেবদাস তাহার। ইহাই সে একান্তভাবে বিশ্বাস করিয়াছে। তাহার সাধ ছিল, একদিন সে এই দেবদাসের পাত্র হইয়া তাহার সমস্ত ভালমন্দ, মঙ্গল এবং সুখ-দুঃখ

নিজের হাতে তুলিয়া লইবে। কিন্তু হঠাৎ ঝড় উঠিল এবং তাহার সমস্ত আশালতা ছিন্নভিন্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল। চক্রবর্তী গৃহিণীর তেরো বছরের 'পারু' অকস্মাৎ একদিনেই পার্বতী সাজিয়া বসিল। তেরো বছর বয়সেই হঠাৎ একদিন সে দেখিল, মহেন তাহার বি, এ, পাশ করা ছেলে, স্বামীপুত্রকন্যাসহ যশোমতী তাহার মেয়ে। সে বুঝিল, এই অভিনয় তাহার শুধু একদিন নয়, সমস্ত জীবনভর করিতে হইবে। আমরা আশ্চর্য হই, মনে মনে প্রশ্ন করি, কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল? দেবদাস একদিন হাসিতে হাসিতে এই কথাই পার্বতীকে বলিয়াছিল—বড় হাসি পায়, ছিলি তুই এতটুকু কতবড় হলি! শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, শুনিয়া পার্বতী একটু হাসিয়াছিল। কিন্তু দেবদাস তাহার এই হাসিকেই দেখিয়াছিল, কিন্তু ইহার অন্তরালে যে গোপন অশ্রু লুকাইয়াছিল, দেবদাস তাহা দেখিতে পায় নাই। আমরা জানি, হৃদয়ের এই গোপন ব্যথাই তাহার এই নূতন জীবনে নূতন অভিনয়ে সফলতা দিয়াছিল। শরৎচন্দ্র আমাদের জানাইয়াছেন, অবস্থার নানা বিবর্তন পার্বতীকে তাহার বয়সের বেলায়ও অনেকখানি পরিপক্ক করিয়া তুলিয়াছিল। দেবদাসও বাহির হইতে পার্বতীর এই পরিপক্কতাই দেখিয়াছিল কিন্তু তখনও সে বুঝিতে পারে নাই পার্বতী জীবনের বাহিরের এই মিলটাই তাহার অন্তরের প্রতিচ্ছবি নয়। অন্তরে তাহার যে ঝড় বহিতেছিল, এই সামঞ্জস্যের অভিনয় তাহাকেই প্রকাশ হইতে দূরে রাখিতেছিল।

আমরা দেখি, পারুর পিতা নীলকণ্ঠ চক্রবর্তী মধ্যবিত্ত গৃহী, আর তাহার 'দেবদা' জমিদার নারায়ণ মুখুয্যের পুত্র। দুইটি বাল্যহৃদয় একই পথ বাহিয়া চলিতেছিল, সামাজিক অবস্থার বৈষম্য সম্বন্ধে তাহাদের কাহারও কোন ধারণা ছিল না। পার্বতীর বয়স আট আর দেবদাসের বয়স বারো। কিন্তু ইহারই মধ্যে উভয়ের উপর উভয়ের অধিকার সম্বন্ধে কাহারও মনেই কোন সন্দেহ ছিলনা। শিশুসুলভ অপরাধ করিয়া দেবদাস তাড়নার ভয়ে আমবাগানে ঢুকিয়া পড়ে এবং অনাহারে হুকাকল্কিমাত্র ভরসা করিয়া সেখানেই পড়িয়া থাকে। তখন

দেবদা-পরায়ণ পারুই তাহাকে মুড়ি যোগায় এবং মুড়ির সঙ্গে সন্দেশ ও জল আনার মতো সামান্য বুদ্ধিটুকু না থাকার জন্য প্রহারও খায়। রাগের মাথায় পারু আসিয়া তাহার দেবদার নামে নালিশ করে কিন্তু একটু পরেই তাহার মনে পড়ে ইহার ফল কি হইবে। আমরা দেখি, পার্বতী বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে থাকে, রাত্রে তাহার আহার হয় না, সমস্ত রাত্রি তাহার ঘুম হয় না। আর পরের দিন পারুর গায়ে আপন প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া দেবদার মুখ হইতেও আহাসূচক দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া যায়। পারু জানিত, দেবদার অর্থে তাহার অবাধ অধিকার, তাই মণ-কষা না জানা তিন ভিক্ষুককে তিনটাকা দিয়াই সে তাহাদের ভাগাভাগির সমস্যার সমাধান করে। তাহার দেবদা যে মণ-কষা জানে, সে তাহারই গৌরব, সমস্ত শিশুহৃদয় দিয়াই সে এই গৌরবকে অনুভব করে।

শৈশবহৃদয় দেনাপাওনা হিসাব রাখিত না। পারু জানিত দেবদা একান্তভাবেই তাহার আর দেবদাসও জানিত পার্বতী তাহারই পারু। পারু জানিত, তাহার দেবদা এমনি করিয়াই চিরদিন টাকা আনিয়া দিবে এবং সেও এমনি করিয়া যেমন খুশী তাহা ব্যয় করিবে। দেবদা জানিত, পারু চিরদিনই আমবাগানে তাহাকে মুড়ি যোগাইবে এবং ইহাই তাহার কাজ। কিন্তু কঠিন শাসনদণ্ড হাতে লইয়া সমাজশক্তি যে রুদ্রমূর্তিতে দুইজনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ভ্রূকুটি করিতেছে, দুইজনের একজনেও তাহাকে সেদিন দেখিতে পায় নাই। দুইটি বাল্যহৃদয় একে অপরকে একান্ত নিবিড় করিয়াই ভালবাসিয়াছিল। পারু জানিত, দেবদা না হইলে তাহার একমুহূর্তও চলিবে না এবং পারুকে এক মুহূর্ত না দেখিলে দেবদাসকেও এক ভাঙা ঘরের জানালার নীচে আসিয়া "পারু! ও পারু!" বলিয়া ডাকিতে হইত। অজ্ঞান শিশুহৃদয় ভাবিয়াছিল এই ভাবেই তাহাদের জীবন চিরদিন চলিতে থকিবে। মিলনের এই নিবিড় আনন্দ বিচ্ছেদের ছায়াপাতে কোনদিনই যে মলিন হইতে পারে তাহার সম্ভাবনা তাহাদের কাহারও মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, সংসারের এক স্বাভাবিক নিয়মেই

এই মিলনে ছেদ পড়ে, স্বাভাবিক নিয়মেই শিশুহৃদয় বড় হয়, নানা পরিবর্তনের মধ্যদিয়া জীবনের সুর, কখনও খাদে কখনও চড়', বাজিতে থাকে, আর ইহারই ফলে তাল-মান-লয় তাহারা সমস্তই হারাইয়া ফেলে।

আমরা দেখি, এই স্বাভাবিক নিয়মের বসেই পারুর দেবদা তালসোনাপুরের আমবাগানের মায়া কাটাইয়া একদিন রাজধানী কলিকাতার শহুরে জীব দেবদাস হইয়া পড়িল। রাজধানীর রাজনীতি সভ-সমিতি, ক্রিকেট ও ফুটবল রাজ্য অতিক্রম করিয়া দেবদাসের কিশোর মন আর তালসোনাপুরের আমবাগানে অথবা চাঁপা ফুলে ভরা চাঁপার গাছে পৌঁছাইতে পারে না। আর আমবাগান ও চাঁপা-গাছের কোন পরিবর্তন না হইলেও আট বছরের পার্বতী একদিন বারোতে পা দেয় এবং দেহশ্রী তাহার মনে এক অনিশ্চিত ভাবনা আনিয়া দেয়। আমরা জানি, তবুও এই দীর্ঘদিন ধরিয়া পার্বতী তাহার দেবদা'রই ধ্যান করিয়া আসিয়াছে। সে জানে, রূপের বাজারে সে একেবারে দেউলিয়া নয়, আর ইহা জানে বলিয়াই সে হয়ত একটু গর্বও অনুভব করে। এই পার্বতীই একদিন দেবদাসকে বলিয়াছিল, "তোমার রূপ আছে গুণ নাই। আমার রূপও আছে গুণও আছে।" আমরা দেখি, আসন্ন বিচ্ছেদের আগে শেষদিন পার্বতীকে আহত করিয়া দেবদাস বলিয়াছিল, "শোন পার্বতী, অতটা রূপ থাকা ভাল নয়, অহঙ্কার বেড়ে যায়।" তবুও পার্বতীর হৃদয় সেদিন যাহা ছিল তাহা অহঙ্কার নয়, যা ছিল তাহা তাহার শুধু হৃদয়ের অভিমান মাত্র। দেবদা তাহার অন্তরে মর্যাদা দেয় নাই, অভিমান তাহার কেবল এই জন্যই নয়। তাহার সর্বত্র প্রশংসিত রূপও আজ দেবদাসের পায়ের কাছে শুকাইয়া গেল। অভিমান তাহার এজন্যও হইতে পারে।

আমরা দেখি, দেবদাসের মন তালসোনাপুরের সন্ধান না রাখিলেও পার্বতীর মন সর্বক্ষণই এক অজানা কলিকাতায় পড়িয়া থাকিত। ইহার মধ্যেও সে যে দুই একবার দেবদাসের সন্ধান পায় নাই তাহা নয়। কিন্তু সে দেবদাস তাহার তালসোনাপুরের আমবাগানের দেবদা

নয়। কলিকাতা হইতে নূতন আমদানী জুতা, জামা, কাপড়, ছড়ি, ঘড়ি এবং বোতাম ভেদ করিয়া তাহার সেই একান্ত অভীষ্ট স্থানে আর পৌঁছিতে পারে না। এখন পারু বোঝে, দেবদাকে দেখিলেই প্রণাম করিতে হয় আর পারুকে দেখিলেও দেবদাসেরও কি জানি কেন লজ্জা করে। আমরা দেখি, এই ব্যবধান তাহাদের মধ্যে আরও বাড়িয়া গেল, বিবাহের প্রস্তাব তাহাদের নারায়ণ মুখুয্যের দরবারে হঠাৎ একদিন উঠিয়াই চিরদিনের মত যখন চাপা পড়িয়া গেল। সকলেই বুঝিল, এই একদিনে যাহা অগ্রাহ্য হইল, পুনরায় তাহা উত্থাপনের যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই নাই। এই বিরোধের ফলে দেবদাসের মন আপনা হইতেই হয়ত একদিন পার্বতীর সন্ধানে ফিরিয়া আসিত কিন্তু সে পথ বন্ধ করিল পার্বতী নিজে। আমরা জানি, পার্বতীর পক্ষেও ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না। দেবদাসকে সে একান্তভাবেই অবলম্বন করিয়াছিল, কিছু না বুঝিয়াই সে তাহার নিকটই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। দেবদাসের শহুরে মন যখন তালসোনাপুরের প্রতি বিমুখ হইয়া অন্যত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তখনও এই দেবদাসই ছিল পার্বতীর সমস্ত আকর্ষণ। শৈশবে যে দেবদা মণকষা জানিত বলিয়া গর্ব হইত, সেই দেবদা আজও তাহার গর্বের বস্তু। শরৎচন্দ্র আটবছরের পার্বতীর কথাই আমাদের জানাইয়াছেন; কলিকাতা হইতে যেদিন পার্বতীর নামে দেবদাসের চিঠি আসে সেদিনটি পার্বতীর বড় সুখের দিন। সিঁড়ির ঘরে চৌকাঠের উপরে কাগজখানি হাতে লইয়া সারাদিন তাহাই পড়িতে থাকে। আমরা জানি, আটবছরের বালিকা সেদিন তাহার দেবদার চিঠিই পড়িতনা, এই চিঠির পথ ধরিয়া ধ্যানমগ্ন মন তাহার সুদূর কলিকাতায় দেবদারই পাশে চলিয়া যাইত॥ শৈশব জীবনের দীর্ঘ তেরোটা বছর পার্বতীর দেবদার ধ্যানেই কাটিয়াছে জীবনে এতদিন যাহাকে জল ও বাতাসের মতোই সহজ মনে করিয়া আসিয়াছে, প্রয়োজন যাহার ছিল জল ও বাতাসের মতোই, তাহাকেই আজ সে হারাইতে বসিয়াছে। মন তাহার অকুণ্ঠিতভাবে কেমন করিয়া ইহা মানিয়া লইবে? শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—"প্রথমেও সে ঠিকমত

কিছু বুঝিতে পারে নাই, অজ্ঞাতসারে অশান্তমন দিনে দিনে এই অধিকারটি এমন নিঃশব্দে অথচ এতই দৃঢ় করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিল যে বাহিরে যদিও বাহ্যপ্রকৃতি এতদিন ধরিয়া তাহার চোখে পড়ে নাই কিন্তু আজ হারানোর কথা উঠিতেই তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া একটা ভয়ানক তুফান উঠিতে লাগিল।

আমরা জানি, হৃদয়ের এই উত্তাল তরঙ্গই জমিদারের দেউড়ি পার হইয়া পার্বতীকে গভীর রাত্রে দেবদাসের কক্ষে লইয়া গিয়াছিল। এখানেও পার্বতীকে আমরা প্রেমে একনিষ্ঠ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠই দেখি। সখী মনোরমা একার্যে তাহার সঙ্গে একমত হইতে পারে নাই। কিন্তু পার্বতী তাহাকে কহিয়াছিল,—'তুমি সই' তুমি আপনার কিন্তু তিনি কি পর? যে কথা তোমাকে বলতে পারি সে কথা কি তাকে বলা যায় না? পার্বতীর দৃষ্টিতে দেবদাস কি ছিল, আমরা এইখানেই তাহা বুঝি পারি। কোনদিনই পার্বতী আপনাকে দেবদাস হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পারে নাই। পার্বতীর কথা শুনিয়া মনোরমা অবাক হইয়াছিল, অবাক হইয়া সে পার্বতীর মুখের পানে চাহিয়াছিল। কিন্তু পার্বতী সেদিন দৃঢ়কণ্ঠেই তাহাকে বলিয়াছিল, "মনোদিদি, তুই মিছামিছি মাথায় সিঁদুর পরিস। কাকে স্বামী বলে তাই জানিসনে।" শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—কথাটা সত্য। ইহারা অনর্থক সিঁদুর পরে, হাতে নোয়া দেয়। মনোদিদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তোর বরের বয়স কত? পার্বতী উত্তর করিয়াছিল—উনিশ-কুড়ি। উত্তর শুনিয়া মনোরমা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু আমরা জানি, একমাত্র দেবদাসই পার্বতীর অন্তর বাহির চিরদিন পূর্ণ করিয়াছিল, কোন ভুবন মুখুয্যে একদিনের জন্যও সেখানে ঠাঁই পায় নাই। কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেমের এই দিকটা যতই উজ্জ্বল এবং যতই গৌরবময় হউক না কেন, অযাচিত এবং অপ্রার্থিত বাহ্যসমর্পণ কোন কালেই মিলনের গৌরবে পৌঁছিতে পারে না। হৃদয় চায় হৃদয়কে জয় করিতে, অযাচিত দানকে কোনকালেই সে প্রতিষ্ঠা দেয় না। তাহা ছাড়া, বাহিরের নানা আকর্ষণে দেবদাসের মন পার্বতী হইতে বহুদূর চলিয়া গিয়াছিল।

মোহগ্রস্থ সুপ্ত মনকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য এক সজোর আঘাতেরই প্রয়োজন ছিল এবং সে আঘাতও দেবদাসের পিতার নিকট হইতে আসিয়াছিল। কিন্তু যথাসময়ে পার্বতীর স্নেহ প্রলেপে আবার তাহা ঘুমাইয়া পড়িল। পার্বতী তাহাকে সজাগ করিতে গিয়াছিল। কিন্তু যাত্রা তাহার সময়োচিত হয় নাই বলিয়াই বিফল হইয়াই তাহাকে ফিরিতে হইল। নদীতে জল কত তাহা আমরা জানি না, পার্বতীর কলঙ্ক যে জল চাপা পড়িল কিনা সে সন্ধানও আমরা রাখি না। কিন্তু তরঙ্গ তাহার দেবদাসের সুপ্তহৃদয়ে পৌঁছিতে পারিল না ইহাই আমরা দেখি। অযাচিত দান প্রত্যাখ্যানরূপেই পার্বতীর নিকট দেখা দিল, দেবদাস পার্বতীর নিকট হইতে আরও দূরে চলিয়া গেল। জীবনের অতিবড় মিথ্যাকে দেবদাস একমাত্র সত্য বলিয়া ঘোষণা করিল। কলিকাতা হইতে সে পার্বতীকে জানাইল—"তোমাকে যে আমি বড় ভালবাসিতাম, তাহা আমার কোনদিন মনে হয় নাই।"

আমরা জানি, দেবদাস কোনদিন আপন হৃদয়কে অনুসন্ধান করিয়া দেখে নাই। পার্বতী ছিল দেবদাসের নিকট জল ও বাতাসের মতোই অনায়াস লভ্য। তাই তাকে অনুসন্ধানের প্রয়োজনও সে কখন অনুভব করে নাই। তারপরে বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পরে পার্বতী যখন তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল, তখন হয়ত এই প্রয়োজন সে অনুভব করিত। কিন্তু পার্বতীর অযাচিত আত্মদান সে-পথও রুদ্ধ করিল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, দেবদাস যে প্রকৃতির লোক, তাহাদের কোনকিছু বেশীক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিবার ধৈর্য থাকেনা। কোন কিছু হাতে পড়িবামাত্র স্থির করিয়া ফেলে, ইহা ভাল কিম্বা মন্দ, উলটাইয়া দেখিবার পরিশ্রমটুকু ইহারা বিশ্বাসের জোরে চালাইয়া দেয়। তাই আমরা দেখি, চিঠি লিখিবার আগে পার্বতীর প্রতি যে মনোভাব সে পোষণ করিতেছিল, চিঠি ডাকে দিয়াই তাদের সেই উদাসীন ভাব কাটিয়া গেল। কিন্তু যে ঢিল সে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, তাহার প্রতি চাহিয়া থাকা ভিন্ন তখন আর তাহার কোন উপায় নাই। পারুর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াই সে পারুর প্রতি তাহার প্রবল স্নেহের

আকর্ষণ অনুভব করিল। পত্র তাহার পারুকে কি নিদারুণ আঘাত করিবে সে বুঝিয়াছিল। তাই কলিকাতা হইতে একেবারে সে তাল-সোনাপুরের বাঁধের পারে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তখন সময় অতীত হইয়াছে। পার্বতী দেবদাসের নিকট হইতে কঠিন আঘাত সহ্য করিয়াছিল। তাই প্রত্যাঘাতেই এবারে উত্তর দিল তাহার অন্তরে অভিমানী নারীহৃদয়। ফলে চাঁদের কলঙ্কের দাগ লইয়াই সেদিন তাহাকে গৃহে ফিরিতে হইল এবং পরিণামরূপে নববধূসাজে পার্বতীকে তালসোনাপুর ছাড়িয়া হাতীপোতা গ্রামে আশ্রয় লইতে হইল।

বাহিরের দিক দিয়া পার্বতী দেবদাসের বিচ্ছেদ পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু এই আঘাতের ভিতর দিয়াই একটি হৃদয় যেন আর একটা হৃদয়ের সঙ্গে আরও জড়িত হইয়া পড়িল। বিদায় নিবার সময়ে পার্বতী দেবদাসকে কহিয়াছিল—"দেবদা, মাপ করো আমাকে।" দেবদাস উত্তর কিরিয়াছিল—'তা তোকে বলতে হবে না ভাই। কবে তোর উপর রাগ করেছিলাম?" পার্বতীকে সে আরও বলিয়াছিল,—"তুমি তো জানো, আমি বেশী ভেবে চিন্তে কাজ করতে পারি না।" আমরা জানি, ইহাই তাহাদের অন্তরের কথা। দুই কিশোর হৃদয়ের কি ঐক্যই না ইহার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তবুও বাহিরের বিচ্ছেদই সত্য হইল। হৃদয়ের অকৃত্রিম সত্য কোন রূপেই মিলনের নিবিড়তায় পৌঁছিতে পারিল না। দেবদার পারু একদিন সত্যসত্যই জমিদার গৃহিনী সাজিয়া পালকী চড়িয়া হাতীপোতা গ্রামে চলিয়া গেল। যাবার আগে সে মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—একবার ডেকে আনতে পারা যায় না? একবার পায়ের ধূলা নেব, আজ যাব কিনা।" পার্বতী সেদিন আত্মবিসর্জন করিতে যাইতেছিল। তাই হৃদয় তাহার বিদায় চাহিতেছিল, তাহারই দেবতার নিকট। হৃদয়ের গোপনতম গুহার এই কয়টি কথা তাহার চিরদিনই গুমরিয়া মরিল, কিন্তু বাহিরে জগতের কাছে সে চিরদিনই জমিদার গৃহিনী রহিয়া গেল।

তেরো বছরের পারু যখন একদিনেই চল্লিশ বছরের জমিদার গৃহিনী

সাজিয়া বসিল, তাহাকে দেখিয়া দেবদাস বোধহয় একটু হাসিয়াছিল। তাই সে চন্দ্রমুখীর নিকটে বসিয়া অমন করিয়া তিলে তিলে আত্মহত্যা করিয়াছে। আমরা দেখি, চন্দ্রমুখীকে সে কোনদিনই ভালবাসে নাই বরং প্রাণ ভরিয়া ঘৃণা করিয়াছ। সর্বক্ষণই সে তাহার স্পর্শ এড়াইয়া চলিয়াছ। চন্দ্রমুখীর নিকট দেবদাস বলিয়াছিল— স্ত্রীলোকের মন বড় চঞ্চল, বড় অবিশ্বাসী। হয়ত দেবদাস একথা পার্বতীকে মনে করিয়াই সেদিন কহিয়াছিল। কিন্তু দেবদাস সেদিন পার্বতীর বাহিরের জমিদার গৃহিণীকেই দেখিয়াছিল, তাহার অন্তরের পারুকে দেখিতে পায় নাই। তালসোনাপুর গ্রামের মাটিতে পড়িয়া পার্বতী একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে দেবদাসের নিকট কহিয়াছিল—"দেবদা, আমার যে বড় কষ্ট, আমি যে মরে যাচ্ছি, কখনও তোমার সেবা করতে পেলাম না—আমার যে অন্তরের সাধ।" অন্ধকারে চোখ মুছিয়া দেবদাস বলিয়াছিল—তারও সময় আছে। হয়ত সেদিনও পার্বতীর মুখের এই কথাগুলিকে দেবদাস সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। সেইজন্যই তাহার নিজের উত্তরের ভিতরেও আন্তরিকতার অভাব ছিল অনেকখানি। আমরা জানি, নিজের হৃদয় যে দেবদাস কোন দিনই দেখিতে পায় নাই। তাই সে পার্বতীর চঞ্চল চিত্তকেই দেখিতেছিল। কিন্তু চন্দ্রমুখীর নিকট সে শুনিয়াছিল—চঞ্চল এবং অস্থির চিত্ত বলিয়া স্ত্রীলোকের যত অখ্যাতি, ততখানি অখ্যাতির তারা পাত্রী নয়। চন্দ্রমুখীর জন্যই দেবদাসের পরিচয় হইয়াছিল পার্বতীর অন্তরের সঙ্গে। চন্দ্রমুখী তাহাকে বলিয়াছিল, কর্তব্য এবং ধর্মাধর্ম আছে বলিয়াই যে যথার্থ ভালবাসে, সে সহ্য করিয়া থাকে। চন্দ্রমুখীর নিকটই দেবদাস শুনিয়াছিল—"শুধু অন্তরে ভালবেসে যে কত সুখ, কত তৃপ্তি যে টের পায়, সে নিরর্থক সংসারের মাঝে দুঃখ অশান্তি আনতে চায় না।" চন্দ্রমুখীর কথায় দেবদাস বুঝিয়াছিল—পার্বতী তাহাকে ঠকায় নাই, দেবদাসই নিজেকে ঠকাইয়াছে। দেবদাস সেদিন ঠিকই বুঝিয়াছিল। তাই ইহার পরে সে আর চন্দ্রমুখীকেও ঘৃণা করিতে পারে নাই।

হাতীপোতা গ্রামেও আমরা পার্বতীকে দেখি—সেখানে সে অন্নপূর্ণা।

কাজ করিয়া, মিষ্ট কথা কহিয়া, পরোপকার এবং সেবাশুশ্রূষা করিয়া তাহার দিন কাটে। তবুও মাঝে মাঝে তালসোনাপুরের জীবনের কথা মনে করিয়াই হয়ত এক ফোঁটা চোখের জল তাহার টপ্ করিয়া কোথায় জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। কিন্তু ধীর স্থির সেই অতল স্নেহ জলধিতে সামান্য তরঙ্গও বাহির হইতে পরিলক্ষিত হয় না। দেবদাসের অধঃপতনের সংবাদ তাহাকে হাতীপোতা হইতে তাল-সোনাপুরে টানিয়া আনিয়াছিল। মনোরমা সেদিনও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—বলিস কি, লজ্জা করতো না?" পার্বতী উত্তর করিয়াছিল—"লজ্জা আবার কাকে? নিজের জিনিস নিজে নিয়ে যাবো তাতে লজ্জা কি? মনোরমা সেদিন পার্বতীকে ছি ছি করিয়াছিল কিন্তু আমরা জানি, মনোরমা ও পার্বতীতে কত প্রভেদ। পার্বতীর এই নিঃস্বার্থ আত্মবোধই শেষের দিন দেবদাসকে হাতীপোতা গ্রামের অশ্বত্থতলায় টানিয়া আনিয়া ছিল। সময় এবং সুযোগ পাইলে পার্বতীর এই নিঃস্বার্থ প্রেম হয়ত গৌরবের পথেই দেবদাসকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত, কিন্তু মনোরমার দ্বারা কোন দিনই ইহা সম্ভব হইত না।

পোড়াকাঠ ভামিনী

জগতে এমন বস্তুর অভাব নাই, বাহিরের আকৃতি তাহার যত কর্কশ, যত কুরূপই হউক না অন্তর তাহার চিরদিনই উজ্জ্বল এবং সরস। বাহিরের রূপ দিয়া ইহাদের বিচার চলে না। বিচারক সেখানে ইহার সম্বন্ধে ভুল করিবে, বিচারের নামে অন্যায় অবিচারই ইহার স্কন্ধে চাপাইয়া দিবে। শরৎ-সাহিত্যের নারী চরিত্রে আমরা এই জিনিসটিই বেশী লক্ষ্য করি। নারী সুরূপা হইতে পারে, কুরূপা হইতে পারে, তাহার প্রতিবেশ, তাহার চতুষ্পার্শ্ব তাহাকে কঠিন করিয়া তুলিতে পারে, কিন্তু অন্তরে তাহার গোপন ফল্গু ধারার মত চিরন্তন নারীপ্রকৃতিই বাস করে। তাহার স্নেহ-মন্দাকিনীর অমৃত-ধারা কোন দিনই একেবারে শুকাইয়া যায় না, প্রত্যাখ্যানের বঞ্চনা লইয়া কেহই সেখান হইতে ফিরিয়া আসে না। নারী চরিত্র-অঙ্কনে শরৎচন্দ্র নারীর এই অন্তরকেই রূপ দিয়াছেন। তাই শরৎ-সাহিত্যে নারীর বাহিরের কোন আকৃতির কোন প্রভাব নাই। হরিপালের শম্ভু চাটুয্যের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় শরৎচন্দ্রই ঘটাইয়াছেন। "পোড়া কাঠের" আকৃতি—দেখিলে যে কেহ তাহাকে প্রেতলোকের অধিবাসিনী ভিন্ন মানবী মনে করিবে না, ইহা শরৎচন্দ্র কেন আমরাও বুঝি। কিন্তু সেই শুষ্ক দগ্ধ পোড়াকাঠের মধ্যে হরিপালের ম্যালোয়ারীর ডিপোতেও স্নেহ সহানুভূতির সুধাধারার অভাব হয় নাই।

পোড়াকাঠের সঙ্গে পরিচয় আমাদের বেশীক্ষণের জন্য নয়। শরতের এক ঝাপসা সন্ধ্যায় স্বামীহারা দুর্গামণি ততোধিক দুর্ভাগা কন্যার হাত ধরিয়া হরিপালের ভাই-এর নিকট আপন দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে—আশ্রয় লইতে আসিয়াছিল। ইহাই আমাদের পোড়াকাঠের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। তারপরে মাঘ মাসের এক দুপুর বেলা এই

ম্যালোয়ারীর ডিপো হইতে সেখানকার অকৃত্রিম সঙ্গীকে একমাত্র সাথী করিয়া মা মেয়ে বিদায় লইয়াছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে— পোড়াকাঠও আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইল কিন্তু এই অনতি-কালের মধ্যেই আমাদের নিকট যে পরিচয়টি সে রাখিয়া গেল তাহা মুছিয়া ফেলিবার নয়। বাইরের সৌন্দর্যে নারী অনেকখানি সহানুভূতিই আকর্ষণ করে কিন্তু পোড়াকাঠ ভগবানের সে আশীর্বাদ হইতেও বঞ্চিত, ততটুকু সৌভাগ্য নিয়াও সে সংসারে আসে নাই। কিন্তু শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন; এই বলিয়াই সে যে সমস্ত সৌভাগ্য বঞ্চিত তাহা নয়। তাহার অন্তরকে তাই অকাতরে সকল সম্পদ বিতরণ করিতে তাঁহার কোন কার্পণ্যই আমরা দেখিনা।

দুর্ভাগ্যকে আশ্রয় করিয়াই দুর্গামণি ভাইয়ের গৃহে পা দিয়াছিল। সুতরাং সেখানে তাহার অভ্যর্থনা কালোচিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সদরে ভাই-এর নিকটে লম্বা চৌড়া একদফা অভিনন্দন শুনিয়া দুর্গামণি তাহাকে অনুসরণ করিয়া অন্দরে ঢুকিতেছিল। দ্বিতীয় পক্ষের ভ্রাতৃ-বধূর নিকট হইতে ইহা অপেক্ষাও বেশী কিছু তখন আশা করিতেছিল। ভাগ্যহীন জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল ভাই এর নিকট আপন অভ্যর্থনার ঘটা দেখিয়া, তাহারই দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর কথা ভাবিয়া হৃদয়ের কোমলতার সামান্য বাষ্পটুকুও বোধহয় শুকাইয়া গিয়াছিল।

শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন, বৌ-এর নাম ভামিনী। সে মেদিনীপুর জেলার মেয়ে। তার কথাগুলো একটু বাঁকা বাঁকা। বৌয়ের কথা-বার্তা একটু দূর হইতে শুনিলে ঝগড়া বলিয়া মনে হইত। তাহার উপর সে যেমন মুখরা তেমনি যুদ্ধবিশারদ। কিন্তু আমরা জানি ইহাই তাহার আসল রূপ নয়। হরিপালে পা দিয়াই দুর্গামণি বুঝিয়া-ছিল, সে এখন পরের অনুগ্রহপ্রার্থী। তাই সময়োচিত কর্তব্য পালনের জন্য নিজেই উপযাচক হইয়া ভ্রাতৃবধূর গৃহকর্মে সাহায্য করিতে গিয়াছিল। কিন্তু ভামিনী তাহাকে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিল, তুমি দুইদিনের জন্য এসেছ ঠাকুরঝি, তোমাকে কাজ করতে হবেনা। রান্না-ঘর ভাড়াঘর আমি কাউকে দিতে পারবোনা। ভামিনী কেবলমাত্র

ঠাকুরঝির প্রতি কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই এ কথা বলে নাই। ইহাদ্বারা তাহার মধ্যে বাঙ্গালী গৃহিণীর সাধারণ অধিকারবোধও সূচিত হইতেছে। পুত্রকন্যার লালন পালন, হেঁসেল ভাড়ার ঘর ইহা লইয়াই বাঙ্গালী পল্লীগৃহিণীর গৃহিণীপনা, ইহা লইয়াই তাহার রাজত্ব। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, বাহিরে পোড়াকাঠই হউক, কয়লাই হউক, বাঙ্গালী নারীর অন্তঃপ্রকৃতি এই অধিকারের জোরেই বাঁচিয়া থাকে। ভামিনীও একথা জানে। এই একমাত্র অধিকার ছাড়িয়া দিয়া এ সংসারে তাহার একদিনের জন্যও দাঁড়াইবার জায়গা নাই।

শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, পোড়াকাঠ নিজের ধরনে জ্ঞানদাকে তাহার স্বাভাবিক মাধুর্যের জন্যই ভালবাসিয়াছিল। তাই একান্ত স্নেহবশেই সে এই পিতৃহারা দুর্ভাগ্য বালিকার সেবা করিতে গিয়াছিল। পোড়াকাঠের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে কিন্তু তাহার অন্তরের নারীপ্রকৃতির ইহাই সরল সহজ অভিব্যক্তি। দুর্গামণির আহত অন্তর ইহারই ভিতরে একটা উৎকট স্বার্থের গন্ধ পাইয়াছিল। তাই মন তাহার এই পোড়াকাঠ তাড়কা রাক্ষসীর প্রতি কখনই সুবিচার করিতে পারে নাই। কারণ, সে জানিত নবীন এই পোড়াকাঠেরই ভাই। ভ্রাতৃবধূর অতি সাধারণ স্নেহের প্রকাশকেও মন তাহার এই দিক দিয়াই অর্থ করিতে বলিত, ভামিনীর উপর এই সন্দেহ একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ একেই রূপের দিক দিয়া সে বঞ্চিত, তার উপর নারীত্বের স্বাভাবিক বিকাশের পথে সমাজ তাহাকে বিন্দুমাত্র অনুগ্রহ দেখায় নাই। সুতরাং সকলেই তাহাকে ভুল বুঝিবে ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? কিন্তু তবুও নিজের ভুল দুর্গামণিকে শেষ পর্যন্ত বুঝিতে হইয়াছিল। তাই বিদায়ের দিনে গরুর গাড়ীতে উঠিতে গিয়া পোড়াকাঠের দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া দুর্গা তাহাকে অশ্রুজলে ভিজাইয়া দিয়াছিল। সেদিনও তাহার প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধবিশারদ মূর্তিই প্রকাশ পাইয়াছিল বেশী তবু ইহারই পশ্চাতে ছিল এক বিদ্রোহী নারী। ন্যায়ের নামে, স্নেহের নামে নারীর প্রতি অত্যাচার দেখিয়া তাহার নারীর অন্তরই সেদিন ব্যথিত হইয়াছিল, তাই ইহারই বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ জানাইতে আসিয়াছিল।

শিক্ষার অভাবে, সংস্কারের অভাবেই তাহার অন্তরের সুষ্ঠু ও সুসংযত রূপটি সেদিন ফুটিতে পারে নাই এইমাত্র। তবুও এক নারীই সেদিন বিদ্রোহ করিয়াছিল আর এক নারীর পক্ষ হইয়া। পোড়াকাঠ জানিত—তাহার আপনার রূপ নাই। তবুও নারীত্বের অমন এক সুন্দর প্রতিমাকে কেমন করিয়া সে এক বাঁদরের হাতে সমর্পণ করিবে? স্বামী শম্ভু চাটুয্যে বলিয়াছিল, 'নবীন সুপাত্তর'। কিন্তু ভামিনী উত্তর করিয়াছিল, 'সুপাত্তর বটে, আমার নিজের দাদা আমি জানিনে? তাড়ি গাঁজা খেয়ে পাঁচ ছেলের মা বৌটাকে আট মাসের পেটের ওপরে লাথি মেরে যে হত্যা করতে পারে' ভাই হইলেও তাহারই নিকটে নারী হইয়া আর একটি নারীকে কেমন করিয়া সে বলি দিবে? একান্ত উত্তেজনাবশেই তাহার একমাত্র অলঙ্কার, রূপার গোটছড়াটি হারানোর কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। পোড়াকাঠ তাহার স্নেহার্দ্র হৃদয়ের এই দিকটা আমাদের নিকট গোপন করিতে চাহিয়াছিল। বলিবার ইচ্ছা যে তাহার ছিল না, ইহা তাহার কথার ভঙ্গিতেই প্রকাশ পায়। দুর্গামণিকে সে বলিয়াছিল, 'বললে তুমি মনে কষ্ট করবে, আমি বলতাম না ঠাকুরঝি। দুর্গাও সেদিন তাহার ভুল গভীর অনুশোচনার সঙ্গেই বুঝিয়াছিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে সে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিয়াছিল, 'না বুঝে অনেক অপরাধই তোমার চরণে করে গেলাম বৌ। সে সব আমায় মাপ করো। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, পোড়াকাঠ আজ আর সমস্ত মাড়ি বিকশিত করিয়া হাসিল না, বড় বৌ, বলিয়া এক ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া লইয়া কহিল, 'পোড়া কপাল! অপরাধ ত সব আমাদেরই হল ঠাকুরঝি। ওগো গেনি শোন্, মামা-মামীর উপর রাগটাগ করিসনে যেন, এই বলিয়া তাহার গেনি-মাকেই সে আসছে বছর আম কাঁঠালের দিনে জামাইসহ নিমন্ত্রণ করিয়া হাতের পিঠ দিয়া আর দু-ফোঁটা চোখের জল মুছিল। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, হৃদয়ের এই স্নেহ মাধুর্যেই নারীর স্বাভাবিক বিকাশ। ইহা দ্বারাই সে হৃদয়ের সমস্ত সৌন্দর্যকে আকর্ষণ করে, রূপের স্বভাব এ' পথে তাহার কোন বিঘ্নই সৃষ্টি করিতে পারে না।

বিজয়া

নলিনী, মনোরমা, ললিতা প্রভৃতি নামের যখন কোন অভাব ছিল না তখন বনমালী তাহার একমাত্র কন্যার নাম বিজয়া কেন রাখিলেন, এ প্রশ্ন একেবারে অবান্তর নয়। কারণ একে ত বিজয়া নামটি সমাজে অপ্রচলিত, ইহার উপর হিন্দু দেবদেবীর নামের সঙ্গে ব্রাহ্মকুমারীর নামের এই যোগ যোগটাই বেশ মানানসই বলিয়া মনে হয় না। তবুও এই ব্রাহ্মকুমারীর জীবনের সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করিলে শরৎবাবুর দেওয়া এই বিজয়া নাম সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে। এই বিজয়াকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতেই হউক, বিজয়াকে সত্যসত্যই বিজয়ারূপে আমরা দেখি। ঘটনাপরম্পরা যখন তাহার বিরুদ্ধে কেবল বিদ্রোহই করিতেছিল; সমস্ত প্রতিবেশ যখন একসঙ্গে বিরুদ্ধতা করিয়া তাহাকে পরাজয়ের খাদেই ঠেলিয়া দিতেছিল, তখন সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং বহির্দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিয়া সে তাহার বিজয়া নামই সার্থক করিয়াছে। দত্তার সমস্ত ঘটনাই বাহিরে বিজয়ার এই জয়ের ইতিহাস। মনে হয়, এই বিজয়া নাম শরৎচন্দ্রের সজাগ এবং সচেতন মনেরই সৃষ্টি। মন্দিরের আচার্য দয়াল বারবার তাহাকে মা বলিয়া ডাকিত। কিন্তু যেদিন তাহার সকল বিরোধের অবসান হইল, দ্বিধাদ্বন্দ্ব চুকিয়া গেল, বৃদ্ধ মাতৃ সম্বোধনে আর ততটা আনন্দ পাইল না যতটা পাইল সে তাহাকে বিজয়া বলিয়া ডাকিয়া। বৃদ্ধের মুখে সেই দিনই আমরা প্রথম শুনি—"আজ যে তোমাদের বিবাহ বিজয়া।"

শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, এমন একদিন ছিল যখন বিলাসের হাতে আত্মসমর্পণ করা বিজয়ার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। মৃত্যুর পূর্বে মুমূর্ষু পিতা তাহাকে জগদীশের ছেলের কথা বলিয়াছিলেন এবং এই

সঙ্গে ইহাও জানাইয়াছিলেন যে বিজয়ার জন্মের পূর্বেই জগদীশের ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহে তিনি মনের কথাই দিয়াছিলেন। কিন্তু পিতার ইচ্ছা সেদিন বিজয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই, হয়ত সে ইহাকে বার্ধক্যের খেয়াল বলিয়াই মনে করিয়াছিল। মরণোন্মুখ বৃদ্ধ পিতার নিকট কন্যাস্নেহ খুবই মধুর ছিল কিন্তু তাহার এই অন্তিম ইচ্ছার উপেক্ষায় জরাজীর্ণ বক্ষ ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসই বাহির হইয়া আসিয়াছিল। বিজয়ার লক্ষ্য সেদিকেও ছিল না। শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, ঠিক এই সময়েই বিলাসের আগমন সংবাদে কন্যার মুখের উপর যে আরক্ত আভাসটুকু দেখা দিয়াছিল, বৃদ্ধকে তাহা ব্যথাই দিয়াছিল ; আমরা জানি, ইচ্ছা করিয়াই বিজয়া সেদিন পিতার মনোভাবটি জানিয়া লয় নাই। সেদিনই তাহার ভয় ছিল ; পিতার ঐ অন্তিম ইচ্ছা বিলাসের সঙ্গে তাহার মিলনকে বাধা দিবে ইহা হয়ত তাহার চিরদুঃখেরই কারণ হইবে। পিতার মৃত্যুর পরে তাহার নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের ধারাটা যে বিলাসবিহারীর সহিত সম্মিলিত হইয়াই প্রবাহিত হইবে ইহা সে একপ্রকার স্থির করিয়াই ফেলিয়াছিল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, 'কোন মতেই যে ইহার ব্যত্যয় ঘটিতে পারে এ সম্ভাবনার কল্পনাও কোনদিন তাহার মনে উদয় হয় নাই।' এ চিন্তায় হয়ত সেদিন সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত, সমস্ত শক্তি দিয়া দুই হাতে ইহাকে দূরে ঠেলিতেই চাহিত। কিন্তু যে অনাসক্ত উদাসীন লোকটি তাহার আকাশে ধূমকেতুর মত সহসা উদিত হইয়া তাহার গতিপথের সুনির্দিষ্ট রেখাটি পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিল, প্রথম সাক্ষাতে সে তাহাকে পূর্ণবাবুর ভাগিনেয় বলিয়াই চিনিল। যাহাকে সে চেনে না, অতীত যাহার উহার পূর্বে কোন দিনই কেহ আসিয়া তাহার সম্মুখে ধরে নাই, হঠাৎ একদিন তাহারই আবির্ভাবে বিজয়ার সমস্ত ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এতদিনের সুচিন্তিত জীবনচিত্র হঠাৎ লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। সেদিন সে ভাবিয়া পায় নাই, সেই বিশাল আবর্তের মধ্য হইতে কি করিয়া তাহার কূলের সন্ধান মিলিবে।

প্রথম দিনের সামান্য পরিচয়ের পরেই সেই অজ্ঞাত লোকটি চলিয়া গেল। একমাত্র পূর্ণবাবুর ভাগিনেয় ভিন্ন অন্য কোন পরিচয় সে রাখিয়া গেল না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মুখে আমরা শুনি, বিজয়া মিনিট-খানেক অন্যমনস্ক ও নীরব থাকিয়া সহসা চকিত মুখ তুলিতেই, নিতান্ত অকারণেই তাহার কপালের উপর একটা ক্ষীণ আরক্ত আভা দেখা দিল। বিকালে বেড়াইবার পথে এই লোকটির সঙ্গেই বিজয়ার আর একবার দেখা হইয়াছিল, তাহার গৌরবর্ণের মুখখানি কি জানি কেন তখনও রাঙা হইয়া গিয়াছিল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, তখন বিজয়ার মুখের উপর সূর্যকিরণ আসিয়া পড়িল কিনা জানি না। শরৎচন্দ্র নাই জানুন তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু আমরা জানি কারণ ইহা সূর্যরশ্মি নয়। তাই বৃদ্ধ কানাই সিং যখন আপনার স্নেহের দাবীতে বিজয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'এ বাবুটি কে মাইজী?' বিজয়া এতই বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল যে বৃদ্ধের প্রশ্ন তাহার কানেই পৌঁছিল না। সেই প্রায়ান্ধকার নদীতটের সমস্ত মাধুর্য উপেক্ষা করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত শুধু এই কথাই ভাবিতেছিল লোকটি কে এবং আবার কবে দেখা হইবে। এই সকল কথা আমরা শরৎবাবুর নিকটই শুনি।

একদিন বিলাসের নিকট হইতেই এই অজ্ঞাত লোকটির প্রকৃত পরিচয় বিজয়া পাইল, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নিজেরই দ্বারা ইহার গৃহত্যাগের ইতিহাসটিও বিলাসই যখন শুনাইয়া দিল তখন বিজয়ার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। হয়ত পিতার শেষ ইচ্ছাটিও এই সময়েই একবার তাহার মনের কোণে উঁকি মারিয়াছিল, নিজ হাতেই জল সিঞ্চনে তাহাকে বর্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ সেই বৃক্ষে ফল ফলিতেছে, সে ছাড়া আর ইহা ভোগ করিবে কে? তাই হৃদয় তাহার যতই দুর্নিবার বেগে আজ নরেন্দ্রের পানে ছুটিয়া চলিতেছিল, ঘটনা ততই তাহাকে ততোধিক বেগে সেখান হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতেছিল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, এক সময়ে সে নিজেই বিলাসকে পছন্দ করিয়াছিল এবং তাহারই সহিত একযোগে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নরেন্দ্রের সর্বনাশ কামনা করিয়াছিল। সেই কামনাই আজ

তাহার সমস্ত শুভ ইচ্ছাকে পরাভূত করিয়া জয়লাভ করিতেছে মনে করিয়া তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। সে বারবার বলিতে লাগিল স্নেহে অন্ধ হইয়া কেন পিতা এই সর্বনাশের মূল স্বহস্তে উন্মূলিত করিয়া গেলেন না। সকলেই জানে তাহার আপনার বলিতে আজ রাসবিহারী ভিন্ন আর কেহই নাই। তিনিই বন্ধু, তিনিই বান্ধব, তিনিই অভিভাবক। কিন্তু সে নিজে জানে—এই ধূর্ত ক্রূর লোকটাই আজ সংসারে তাহার সবচেয়ে বড় শত্রু। অথচ দুঃখ এই—এই কথা মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট বলিবার তাহার উপায় নাই। বৃদ্ধের বিনয়, স্নেহ, সরস মঙ্গলেচ্ছার অন্তরালে দাঁড়াইয়া সে স্বার্থপরতার উদগ্র মূর্তি অকুণ্ঠ চিত্তে আপনার সমস্ত স্বার্থ অকপটে সমাধা করিতেছিল তাহাকে চিনিতে বিজয়ার বাকী ছিল না। বিদেশযাত্রায় বৃদ্ধ নরেন্দ্রকে অযাচিত সাহায্য দান করিয়াছিল, আপন গৃহে বিজয়াকে আহারের নিমন্ত্রণের ফাঁদ পাতিয়া সম্মানিত অতিথিদের সম্মুখে বিলাসের সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব সে পাকা করিয়া লইয়াছিল, সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও বিজয়ার সলজ্জ নীরবতার অর্থ মৌন-সম্মতি বলিয়া সে নিঃসংশয়ে প্রচার করিয়াছিল। আমরা জানি, রাসবিহারী অত্যন্ত সহজ ও অবলীলাক্রমে এই সকল করিয়া যাইতেছিল। তবুও এই সমস্ত শাণিত অস্ত্রের প্রত্যেকটি যে এক অসহায় রমণীকে আঘাত করিতেছিল ইহা তাহার অগোচর ছিল না। আপন শঠতা ও ক্রূরতার তূণীর হইতে সমস্ত বাছা বাছা অস্ত্র প্রয়োগে এই ভূলুণ্ঠিত রমণীকে আহত করিয়া সে স্বার্থপরতার হাসিই হাসিতেছিল। কারণ রাসবিহারী যে প্রকৃতির লোক তাহাতে তাহার নিজের প্রয়োজনই জগতের প্রয়োজন। ইহার অতিরিক্ত কাহারও ভালমন্দ, সুখদুঃখের অস্তিত্ব সে স্বীকার করিবে কেন? তাই আমরা বিজয়াকে দেখি—সে পাশবিদ্ধা হরিণীর মত উদ্ধার পাইবার আশায় যতই ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, জাল যেন ততই তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিতেছিল। রাসবিহারী এবং বিলাস তাহাকে পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার গৌরবের প্রলোভন দেখাইয়াছিল, নরেন্দ্রর বাসভূমি ত তাহারা এই

মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই বিজয়ার জন্য গ্রহণ করিয়াছিল। বিজয়া সকলই জানে কিন্তু তবুও এই মন্দির প্রতিষ্ঠার আগের দিন সমস্ত রাত্রির মধ্যে মুহূর্তের জন্য সে ঘুমাইতে পারিল না। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, বিজয়া তাহার পরলোকগত পিতাকে বারংবার ডাকিয়া কেবলই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, বাবা, তুমিত এদের চিনতে পেরেছিলে, তবে কেন আমাকে এমন করে এদের মুখের মধ্যে সঁপে দিয়ে গেলে ?

বিজয়াকে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবার জন্যই যেন বৃদ্ধ দয়াল ধারা মন্দিরের আচার্যরূপে এই সময়ে কৃষ্ণপুরে পদার্পণ করিলেন। জীবনযুদ্ধে বিজয়াকে একান্ত অসহায় দেখিয়াই শরৎচন্দ্র বোধহয় তাহার জন্য এই ব্যবস্থা করিলেন। আমরা দেখি, প্রথম পরিচয়ের দিনেই বৃদ্ধ বিজয়াকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, আর বিজয়ারও বোধহয় কৃষ্ণপুরের নিঃসঙ্গ জীবনে ইহার প্রয়োজন ছিল। তাই তাহার পরিচিত অপরিচিত সকলকে বাদ দিয়া সে সেদিন এই বৃদ্ধের পাশেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কি জানি, হয়ত সেদিন তাহার মৃত পিতাকেই মনে পড়িয়াছিল, হয়ত ভাবিয়া ছিল, পিতা জীবিত থাকিলে তিনিও তাহাকে এইরূপ আদরেই সম্বোধন করিতেন, এমনই সকল সঙ্কট হইতে আড়াল করিয়া দাঁড়াইতেন। শত্রুবেষ্টিত পুরীতে সেদিন এই বৃদ্ধকেই অকৃত্রিম সুহৃদ বলিয়া বিজয়ার মনে হইয়াছিল। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটা মস্ত বড় নামের অন্তরালে থাকিয়া বিলাস তাহার হৃদয়ের অত্যন্ত ব্যথার স্থানেই আঘাত করিয়াছিল কিন্তু বৃদ্ধ দয়াল ধারার ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ব্যাখ্যার মধ্যে সে ইহার বিরুদ্ধে একটা অহেতুক সান্ত্বনার সুর খুঁজিয়া পাইল। আমরা জানি, বৃদ্ধের প্রতি বিজয়ার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাই ইহার কারণ। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, তাহার মনে হইতে লাগিল, বিলাস হয়ত বাস্তবিকই ক্রূর নয়, তাহার কঠোরতা হয়ত ধর্মানুরক্তির একটা প্রকাশমাত্র। কিন্তু ইহা যে কতবড় ফাঁকি, সেদিন তাহা বিজয়ার নিকট ধরা পড়ে নাই। কারণ, তাহার মনের যা একান্ত চাওয়া, তাহার সফলতার, পথ তখন

সকল দিক দিয়াই রুদ্ধ। যতদূর দৃষ্টি চলে, গোলকধাঁধার মধ্য হইতে বহির্গমনের পথের সামান্য রেখাটিও তাহার চোখে পড়ে না। তাই বিজয়া সেদিন বাধ্য হইয়াই পারিপার্শ্বিকের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল এবং শারীরিক অসুস্থতার কথা ঘোষণা করিয়া সে নিজেকেই নিজে প্রবঞ্চিত করিয়াছিল।

শুধু ইহাই নয়। এই দিক হইতে বিজয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। আজ সে নিজেকে বুঝাইতে চাহিল, বিলাসের সঙ্গে তাহার এই মিলন তাহার সুখের জন্য নয়। তাহার নিজের হৃদয়ের কামনা বাসনা হয়ত ইহার দ্বারা পূর্ণ হইবেনা, কিন্তু ধর্মের জন্য তাহার পক্ষে তো ইহাই কাম্য। মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পল্লীঅঞ্চলে ব্রাহ্ম-ধর্ম সম্প্রসারণের আনন্দ এবং উৎসাহ তাহার হৃদয়কে এমন ভাবে অধিকার করিয়াছিল যে সে আপনাকে আপনি কেবলই বলিতে লাগিল পার্থিব সুখই একমাত্র সুখ নয়, বরঞ্চ ধর্মের জন্য, পরের জন্য সুখ বলি দেওয়াই একমাত্র শ্রেয়।" কিন্তু বিজয়ার হৃদয়ের পক্ষে ইহা যে কতবড় আত্ম প্রবঞ্চনা এবং আত্মনিগ্রহ, তাহা অল্পদিনেই মধ্যেই বিজয়া বুঝিতে পারিল। জ্বরের বিকার ঘোরেই হৃদয়ের সহজ সরল এবং গোপন সত্যটি সেদিন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য রাসবিহারীর নিকট আগেও ইহা গোপন ছিলনা। বিজয়া তাহার নিজের সম্পর্কে যতখানি জানিত না, তাহার বেশী জানিত এই ক্রূর এবং স্বার্থান্ধ বৃদ্ধ। তাই এই অসহায় রমণীকে যত সত্বর সম্ভব আপন স্বার্থের যূপ-কাষ্ঠে বলি দিবার প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটিই আমরা তাহার দিক হইতে দেখি না। ইহারই জন্য একদিকে যেমন সে বিজয়াকে জালবদ্ধ মীনের মত নিজের দিকে টানিতেছিল; মিথ্যা, অর্ধসত্য অথবা অসত্যের আশ্রয় লইয়া নরেন্দ্রকে ততই সে দূরে ঠেলিয়া দিতেছিল। নরেনের অনাসক্ত উদাসীন মন যখন বিজয়ের নিকট হইতে এই আকর্ষণ বিকর্ষণের প্রকৃত হেতুটি বৃথাই খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, রাসবিহারীর ধূর্ত স্বার্থান্বেষী হৃদয় তাহার এই অজ্ঞতার সুযোগ পূর্ণমাত্রায়ই গ্রহণ করিতেছিল। তাহারই জন্য নরেন্দ্র একদিন জানিল, বিলাসই এ-বাড়ীর ভবিষ্যৎ ভাগ্যবিধাতা,

তাহার অমতে এ-বাড়ীর কিছুই হইতে পারে না, আর বিজয়ার স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কিছুই এ-বাড়ীতে নাই।

রাসবিহারী পূর্বেই সাবধান হইতে গিয়াছিলেন কিন্তু তাহার অতি সাবধানতার ফল ফলিল বিপরীত। বিজ্ঞানের ঘুবপাকে আবদ্ধ নরেন্দ্রের মন এতদিন তাহার স্বাভাবিক গতির সন্ধানই রাখিত না, আজ রাসবিহারীর সাবধানতা হইতে জাত ঈর্ষার ধাক্কায় তাহার রুদ্ধ উৎস মুখ খুলিয়া গেল। এতদিন যাহা সে জানে নাই, আজ তাহা জানিল, এতদিন নরেন যাহা বোঝে নাই, আজ তাহা বুঝিল। হৃদয়ের একমাত্র গোপন আকাঙ্ক্ষাটি আজ তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন,—এতদিন তাহার জানা ছিল, হৃদয় তাহার শুধু বিজ্ঞানকেই ভাল বাসিয়াছে, কিন্তু কিন্তু আজ আঘাত খাইয়া যখন ধরা পড়িল, হৃদয় তাহার তাহারই অজ্ঞাতসারে আর একটা বস্তুকে একান্ত করিয়া ভাল বাসিয়াছে, তখন সে শুধু ব্যথায় এবং বিস্ময়েই চমকিয়া গেলনা, নিজের কাছেই নিজে যেন অত্যন্ত ছোট হইয়া গেল।

নরেন্দ্রের দিক হইতে ইহা আপাত তিক্ততা বিস্বাদের ছাপ লইয়া আসিল সত্য কিন্তু বিজয়ার দিকে ইহাই প্রয়োজন ছিল। এতদিন পর্যন্ত নরেন্দ্রের হৃদয়কে সে বাহির হইতেই আঘাত করিয়াছে তাহার হৃদয়ের অত্যন্ত সন্নিকটে কখনই সে পৌঁছিতে পারে নাই। কিন্তু আজ এই প্রবল ঈর্ষার মধ্যদিয়াই সেখানে বিজয়ার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এইখানেই তাহার জয়ের সূচনা।

আমরা দেখি, এই ঈর্ষা একদিকে যেমন নরেন্দ্রের হৃদয়ের গোপন উৎসমুখ খুলিয়া দিল, অন্যদিকে আবার এই ঈর্ষাই দুইজনের মিলনের পথকে সুগম করিয়া দিল। নরেন্দ্র-বিজয়ার বিবাহের রাত্রিতে নলিনী বিবাহের কনেকে ফুল চন্দনে সাজাইয়া দিয়াছিল। ব্রাহ্ম বিবাহের পরিবর্তে হিন্দু বিবাহের পরামর্শও সেই দিয়াছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র এই জন্যই তাহাকে কলিকাতা হইতে কৃষ্ণপুর দিঘড়ায় নিয়া আসেন নাই। আমরা জানি, নলিনীর সঙ্গে নরেন্দ্রের সহজ ঘনিষ্ঠতাকে বিজয়া ঈর্ষার চোখেই দেখিয়াছিল এবং এই ঈর্ষার ইন্ধন যোগাইয়াছিল

সরল আচার্য দয়াল ধারা নিজেও। তাই বিজয়ার হৃদয় যখন একান্ত-ভাবে নরেনকেই চাহিতেছিল, সেখানে সফলতার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়াই সে আত্মবলি দিয়াই সমস্যার সমাধান করিতে যাইতেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দয়াল এবং নলিনীর চেষ্টায়ই সকল দিক রক্ষা পাইল। পরাজয়ের সমস্ত গ্লানিকে অতিক্রম করিয়া জয়ের বিপুল গৌরবের অধিকারী হইল বিজয়া। নিঃশেষে প্রমাণিত হইল সত্যের স্থান মুখের মধ্যে নয়, বুকের মধ্যে।

আরও একটা জিনিস এখানে পরিষ্কার হওয়া উচিত। এই হৃদয়ের চাওয়া যত বড়ই হউক না কেন, সমাজের দিক দিয়া ইহা আপন দুর্বলতার সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে পারিতন', যদিনা উপযুক্ত সময়ে বিজয়ার পিতার চিঠিগুলি আবিষ্কৃত হইত। এই জন্য জয়ী আজ বিজয়ার নিজের হৃদয়ই নয়, জয়ী তাহার পিতার শুভ ইচ্ছাও।

কমললতা

রাজলক্ষ্মীর মুখের পানে চাহিয়া শ্রীকান্ত একদিন মনে মনে বলিয়াছিল, "হৃদয়ের বিনিময় নরনারীর অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা, সংসারে নিত্য নিয়ত ঘটিয়া চলিয়াছে, বিরাম নাই, বিশেষত্ব নাই, আবার এই দান এবং প্রতিগ্রহই ব্যক্তি বিশেষের জীবনের অবলম্বন করিয়া কি বিচিত্র বিস্ময় ও সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, মহিমা তাহার যুগে যুগে মানুষের মনকে অভিষিক্ত করিয়াও ফুরাইতে চাহেনা। এই অক্ষয় সম্পদ, মানুষকে ইহা বৃহৎ করে, শক্তিমান করে, অভাবিত কল্যাণে নূতন সৃষ্টি করিয়া তোলে।"

কথাটা শ্রীকান্ত সম্ভবতঃ রাজলক্ষ্মী এবং তাহার নিজের জীবন সম্পর্কেই সেদিন বলিয়াছিল। জীবন তাহাদের আর দশজনের মতো নিবিড় মিলনে পৌঁছিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু পরস্পরকে তাহারা যেভাবে পাইয়াছিল, তাহাতেই দুইজনেই নিজ নিজ জীবনকে ধন্য মনে করিয়াছিল ইহা আমরা বুঝি। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের এই প্রেমের নিকট জগতের কোন অন্যায়, কোন অবিচার, কোন অকল্যাণ পৌঁছিতে পারে না, ইহা বুঝিতে আমাদের বিলম্ব হয় না।

কিন্তু শ্রীকান্তের জীবন সম্পর্কে এই উক্তি কেবল যে রাজলক্ষ্মী সম্পর্কে সত্য তাহা নয়। আর একজন নারীও তাহার ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবনের বেসুরো তারে সুর যোজনা করিতে সাহায্য করিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধেও এই উক্তি সমান ভাবেই সত্য।

কমললতার সঙ্গে শ্রীকান্তের প্রথম সাক্ষাৎ মুরারীপুর আখড়ায়। শ্রীকান্তকে তাহার পরিচয় দিয়াছিল নবীন—কমললতা দেখিতে ভাল, গান গাহে ভাল, তাহার কথা শুনিলে লোক মুগ্ধ হইয়া যায়। তারপরে এক ব্যক্তি কণ্ঠী বদল-করা স্বামীর দাবী লইয়া হঠাৎ একদিন আসিয়া

উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার নিকট আমরা শুনিয়াছিলাম, আসল নাম তাহার কমললতা নয়। নাম ছিল তাহার উষাঙ্গিনী, বাড়ী তাহার শ্রীহট্ট জিলায়।

কমললতা নিজেই তাহার জীবন ইতিহাসের পিছনের পাতা কয়টি শ্রীকান্তকে উল্টাইয়া দেখাইয়াছিল। আমরা দেখি, পাতাগুলি কলঙ্ক কালিমালিপ্ত, গাঢ় মসীরাশি ভেদ করিয়া একটি অক্ষরও পড়িবার সাধ্য কাহারও নাই। তবুও ইহাই কমললতার সত্য পরিচয় নয়। তাহার প্রকৃত পরিচয় শ্রীকান্ত তাহার নিজের মুখেই দিয়াছে—"ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিচিত্তের অশ্রুজলের গান। ওর ছন্দের মিল নাই, ব্যাকরণে ভুল আছে, ভাষার ত্রুটী অনেক। কিন্তু ওর বিচার সেদিক দিয়া নয়। ও যেন তাদের দেওয়া কীর্তনের সুর, মর্মে যাহার পশে সেই শুধু তার খবর পায়। ও যেন গোধূলি আকাশের লাল রঙের ছবি। ওর নাম নাই, সংজ্ঞা নাই, কলাশাস্ত্রের সূত্র মিলাইয়া ওর পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।"

মুরারিপুর আখড়ায় কমললতা কি এবং আখড়া জীবনের কতখানি তাহার অস্তিত্ব, তাহা আমরা জানি। শ্রীকান্তের মুখে আমরা শুনি— সকলের আড়ালে থাকিয়া মঠের সমস্ত গুরুভারই কমললতা একাকী বহন করে। তাহার কর্তৃত্ব সকল ব্যবস্থায়, সকলের পরেই। কিন্তু স্নেহে, সৌজন্যে এবং সর্বোপরি সাধনা কর্মকুশলতায় এই কর্তৃত্ব এমন সহজ শৃঙ্খলায় প্রবহমান যে কোথাও ঈর্ষা বিদ্বেষের এতটুকু আবর্জনা জমিতে পারে না।

আমরা দেখি, আশ্রমের প্রাণ এবং আশ্রম-প্রাণা এই নারী আপনার স্নেহ প্রেমে সকলকেই সঞ্জীবিত রাখে, দুঃখের সামান্য কাঁটাটি সকলের মঙ্গলের পথ হইতে দূরে রাখে, বিমর্ষতায় সামান্য বাষ্পটুকুও তাহার নিশ্বাসে যেন দূর হইয়া যায়। অপরের মঙ্গলের জন্য, অপরকে সকল রকম দুঃখ হইতে বাঁচাইতে, সমস্ত দুঃখের বোঝা সে নিজের মাথায় লইতে পারে, ইহা আমরা বুঝি। কমললতা বুঝিয়াছিল, গহর তাহাকে ভালবাসে এবং সে ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া তাহার পক্ষে

সম্ভব নয়। তাই নিরীহ নির্বিরোধ এই তরুণের অনন্ত দুঃখের কারণ হওয়া অপেক্ষা আশ্রম ত্যাগ করাই সে শ্রেয় মনে করিয়াছিল। কিন্তু ইহা দ্বারা সে কতবড় দুঃখ এবং কতখানি শাস্তি সে আপনার উপর টানিয়া আনিয়াছিল, তাহা সে নিজে ভিন্ন অন্য কেহই বোধহয় সেদিন বুঝিতে পারে নাই। হয়ত কতকটা বুঝিয়াছিল শ্রীকান্ত। কারণ, এই শ্রীকান্তকেই কমললতা তাহার একান্ত ব্যথিত জীবনের গোপন অশ্রুর অংশ দিতে চাহিয়াছিল। মুরারিপুর আশ্রম হইতে আসন্ন বিচ্ছেদের পূর্ব মুহূর্তে শ্রীকান্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কমললতা, তোমার কষ্ট হয় না? কমললতা উত্তর করিয়াছিল, জানোই তো সব, আবার জিজ্ঞেস করচ কেন?

আমরা জানি, মুরারিপুর আশ্রমের সঙ্গে কমললতার গ্রন্থি কেবলমাত্র একটি ছিল না। গ্রন্থি ছিল তাহার আশ্রমের অধিকারী দ্বারিকদাসের সঙ্গে, গ্রন্থি ছিল পদ্মার সঙ্গে, গ্রন্থি ছিল আশ্রমের বৃক্ষলতার সঙ্গে, গ্রন্থি ছিল আশ্রমের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে। এই সকল গ্রন্থি হইতে নিজেকে ছিন্ন করিয়া লইয়া কমললতা সেদিন মৃত্যুকেই বরণ করিতে চাহিয়াছিল। 'গ্রন্থিহীন, মূল্যহীন লতা ইহার পর শুকাইয়া মরিবে, ইহা বুঝিতে আমাদের বিলম্ব হয় না। কিন্তু তবুও জানি আমরা, এই কমল শ্রেণীর লতার স্বভাবই এই। আপন চলার পথে ইহারা যাহাকে পায় তাহাকেই জড়াইয়া লয়, আপন দেহ হইতে স্নেহ রস নিঙরাইয়া দিয়া ইহারা তাহাকে সঞ্জীবিত, সংবর্ধিত করে কিন্তু নিজের বাঁচিবার জন্য কোন দাবীই রাখে না কাহারও উপর। অন্য সকলের চলার গতিতে সে যখন দলিত মথিত হয়, তখনও সে সমানভাবেই সকলকে স্নেহধারা বর্ষণ করে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, কি পায় ইহারা আপনাকে এমন ভাবে নিঙরাইয়া দিয়া? জীবনে কিসের আনন্দে তাহার এমন করিয়া নিজেকে নিঙরাইয়া দেয়? বাঁচিবার জন্য ইহাদের সামান্য অধিকারটুকুও নাই কেন?

শরৎচন্দ্রের প্রতি এ ব্যাপারে আমরা অভিযোগ না করিয়া পারি না। মনে হয়, কমললতার প্রতি তিনি অবিচার করিয়াছেন। যে নারী

তাহার হৃদয়ের শেষ রসবিন্দুটিও অন্যের মঙ্গলের জন্য বিলাইয়া দিয়া গেল, শ্রীকান্তকে যে দেখাইল সত্যিকার প্রেম এবং যথার্থ ভালবাসার পথ, রাজলক্ষ্মীর অপূর্ণ প্রেমকে যে দিল পরিপূর্ণতায় শান্তি, কোন পাথেয় নিয়া শেষ দিন সে সংসারের পথে পাড়ি দিল? শরৎচন্দ্র নিজেও যে ইহা অনুভব না করিয়াছেন তাহা নয়। শেষ পর্যন্ত তিনি কোনক্রমে অবস্থা বাঁচাইয়াছেন। আমরা দেখি, মুরারিপুর আখড়া হইতে কমললতা নিজেই তাহার স্বাতন্ত্র্য ভিক্ষা করিয়া লইল, আপনাকে সে গোবিন্দজীর চরণের দাসী করিল। কিন্তু ইহাই কি তাহার হৃদয়ের কথা? এ পথ তো তাহার নিকট আগেও খোলা ছিল। যেদিন ইচ্ছা সে এ পথে পদার্পণ করিতে পারিত। এজন্য তাহার জীবনে শ্রীকান্তের কি প্রয়োজন ছিল?

মনে পড়ে, একদিন সে শ্রীকান্তকে লইয়াই বৃন্দাবনের পথে বাহির হইতে চাহিয়াছিল। শ্রীকান্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এই ঠাকুর পূজা, এই দেবদেবী এদের কি করবে? কমললতা উত্তর করিয়াছিল—তোমাকে নিয়ে এরা হবে আমায় আরও সার্থক আরও মহিমান্বিত। কমললতার এই সামান্য ইচ্ছাটুকু পূর্ণ হইল না কেন? কেন সে তাহার এই সার্থকতার পথ খুঁজিয়া পাইল না? আমরা জানি, এখানেও শরৎচন্দ্র কমললতার প্রতি অবিচার করিয়াছেন। আসলে কমললতার জীবন সার্থকতায় পৌঁছিবে শরৎচন্দ্রের নিজেরই এ ইচ্ছা ছিল না। ঔপন্যাসিক আগাগোড়াই ছিলেন রাজলক্ষ্মীর উমেদার। পাটনায় পিয়ারী বাঈজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতে সেই যে উমেদারীর বোঝা তাঁহার কাঁধে চাপিল, কোনদিনই আর তাহা নামিল না, ইহাই আমরা দেখি। তাই রাজলক্ষ্মীর প্রেমকে পরিপূর্ণ করিতে, সার্থক করিতে যদি কমললতার মত দুই একটি নিরাশ্রয় লতা দলিত মথিত হয়, তাহাতে দুঃখ করিবার কি আছে? বোধহয় ইহাই ছিল শরৎচন্দ্রের কথা।

কমললতা শ্রীকান্তকে ভাল বাসিয়াছিল। সে ভালবাসার মধ্যে আবিলতা ছিল না, কোন কালিমা ছিল না। গত জীবনের সমস্ত

আবর্জনা সমস্ত ময়লা ধুইয়া গিয়াছিল যতীনের জন্য তাহার অশ্রুজলে। যতীনই আপনার জীবন দিয়া তাহাকে কালিমামুক্ত করিয়াছিল। তাই আমরা দেখি, নিঃসঙ্কোচেই আজ কমললতা শ্রীকান্তর নিকট প্রণয় নিবেদন করিতে পারে। শ্রীকান্তের দুর্ভেদ্য উদাসীনতাকে সে দেখে ন'ই তাহা নয়। তাহার এই প্রণয় নিবেদনের ব্যর্থতা সে যে বুঝিতে নাই তাহাও নয়। কিন্তু ইহাই ছিল তাহার সার্থকতার পথ। শ্রীকান্তকে সে ভালবাসে, ভালবাসার পাত্রকে ইহা জানাইয়া দিয়া এই সামান্য পাথেয়টুকু লইয়াই সে বাকী জীবনটুকু চলিতে পারিবে, ইহাই আমরা বুঝি। বেশ পরিষ্কার ভাষায়ই কমললতা সেদিন শ্রীকান্তকে কহিয়াছিল—"সবে কাল সন্ধ্যায় তো তুমি এসেছো কিন্তু আজ আমার চেয়ে বেশী তোমাকে কেউ ভালবাসে না।" শ্রীকান্ত সেদিন মনে করিয়াছিল, দৈবাৎ তাহার নামের মিলটাই এই বিপত্তি সৃষ্টি করিয়াছে এবং এইজন্যই কল্পনা তাহার গত জনমের স্বপ্নসাগরে ডুব দিয়া সংসারের সকল বাস্তবতায় সে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছিল। কিন্তু ইহাকেই কি আমরা একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইব? কল্পনাকে নানা রঙে রঞ্জিত করিয়া এক সুদৃশ্য চিত্র সে সৃষ্টি করিল কিন্তু বাস্তবকে একবারও সে দেখিতে পাইল না কেন? আর স্বপ্নই যদি শ্রীকান্তের পক্ষে একমাত্র সত্য হয়, তবে মুরারিপুর আশ্রমের দশটামাত্র দিন তাহার জীবকে অমন করিয়া আলোড়িত করিল কেন? কেন সে সমস্ত কিছু ত্যাগ করিয়া মুরারিপুর আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছিল? আমরা জানি, আশ্রমে শ্রীকান্তের আকর্ষণ দ্বারিকদাস নয়, আকর্ষণ তাহার পদ্মা নয়, এখানে আকর্ষণ তাহার নিকট একমাত্র কমললতা। গাড়ীর মধ্যে কমললতা নিজ হাতেই তাহার জন্য শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইহাও কি স্বপ্ন, ইহাও কি মিথ্যার মোহ? আর কমললতা যদি তাহাদের নামের মিলটাকেই ভালবাসিয়া থাকে তবে সে-ই বা শ্রীকান্তের অহঙ্কারী দাম্ভিক মনের সন্ধান পাইল কিরূপে? আমরা জানি, কমললতা একান্তভাবেই শ্রীকান্তকে ভালবাসিয়াছিল কিন্তু তবুও যে প্রতিদানে কিছুই চাহে নাই,

কোন কিছুই সে শ্রীকান্তর নিকট দাবী করে নাই। ইহা সত্য যে শ্রীকান্ত মুরারিপুর আশ্রমেই কমললতায় আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল। আশ্রমে কোথায় তাহার আকর্ষণ ইহাও সে জানিত তবুও কমললতার এই ভালবাসা এবং তাহার জন্য নিঃস্বার্থ আত্মনিগ্রহকে শ্রীকান্ত সেদিন বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহার নির্লিপ্ত উদাসীনতার অন্তরালে কমললতাই ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল। রাজলক্ষ্মীর সচেতন সতর্কতা অঙ্কুরেই ইহাকে বিনাশ না করিলে লতা একদিন হয়ত বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইতেও পারিত, এক সময়ে হয়ত তাহারই সঙ্গে শ্রীকান্তকে দাবী করিত। এ সম্ভাবনার কথা শ্রীকান্ত সেদিন বুঝিতে পারে নাই কিন্তু রাজলক্ষ্মী বুঝিয়াছিল। শ্রীকান্তের মুখেই সে কমললতার গল্প শুনিয়াছিল। শরৎচন্দ্র আমাদের জানাইয়াছেন, সমস্ত শুনিয়া হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাসই তাহার অন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল এবং এই বোষ্টম বৈরাগীর কমললতা হইতে তাহার কোন ভয় নাই ইহাই সে জোর করিয়া মুখে বলিয়াছিল। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর এই নিঃসংশয় নির্ভরতার মধ্যেও আমরা ভয় এবং ভাবনার চিহ্ন বেশী দেখি। এইজন্যই সে শ্রীকান্তকে 'বদলে, ভেঙ্গে, গড়ে তুলতে' চাহিয়াছিল, কমললতা দিদি আর যেন কোনদিন তাহার শ্রীকান্তকে দাবী করিতে না পারে তাহার পথে বিপথে বেড়াবার সঙ্গী বলে। কিন্তু রাজলক্ষ্মী সেদিন কমললতাকে বুঝিতে পারে নাই। বোষ্টম বৈরাগী তাহার শ্রীকান্তকে ভালবাসিয়াছিল কিন্তু সেজন্য তাহার কোন দাবী ছিল না, সে প্রতিদান চাহে নাই। কমললতা অন্যের দাবী মিটাইয়া থাকে, নিজে সে কোন দাবী করে না। তবুও সম্ভাব্য দাবী হইতে আপনার দ্রব্যটিকে রক্ষা করিবার জন্যই রাজলক্ষ্মী সেদিন মুরারিপুর আশ্রমে ছুটিয়া গিয়াছিল। রাজলক্ষ্মী বুদ্ধিমতী, প্রখর বুদ্ধি বলেই সে কমললতা ও শ্রীকান্তর মধ্যে এক ব্যবধান সৃষ্টি করিল এবং অতি সহজেই সেই ব্যবধানের মধ্যে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। মুরারিপুর আশ্রমে রাজলক্ষ্মী কমললতায় ছোট বোন সাজিয়া ছিল। কিন্তু আমরা কমললতার এই বোনের মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় পাইলেও প্রাণের

পরিচয় পাই না। কমললতার নিকট হইতে ছোট বোনের অধিকারে শ্রীকান্তকে সে স্নেহাশীর্বাদ রূপেই মাগিয়া লইল। কিন্তু এই আশীর্বাদ দিতে আর একজনের বুকে সেদিন কতখানি বাজিয়াছিল, তাহা সে দেখিল না কেন? কমললতা জানিত, শ্রীকান্ত-রূপী বৃক্ষতলে তাহার আশ্রয় মিলিবে না, সে বৃক্ষ সংলগ্ন হইবার সৌভাগ্য তাহার নাই। তবুও সে দূর হইতেই রস সংগ্রহ করিয়া বাঁচিতে চাহিয়াছিল। কমললতার এই ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা রাজলক্ষ্মী যে বুঝিতে পারে নাই তাহা নয়। তবুও নিজ স্বার্থের প্রতি চাহিয়াই সে সেদিন চুপ করিয়াছিল। একচক্ষুর দৃষ্টি তাহার ছিল নিজের দিকে, অন্য চক্ষু ছিল শ্রীকান্তর দিকে অপর দিকে সে তাকাইবে কেমন করিয়া?

রাজলক্ষ্মীর পরিপূর্ণতার যে চিত্র আমরা শেষ দিকে দেখি, সেখানে সে সত্যই কল্যাণী। শ্রীকান্তের নিকট আমরা শুনি,— "দিশেহারা মন সান্ত্বনার আশায় ফিরিয়া চাহে রাজলক্ষ্মীর পানে। সকলের সফল শুভ চিন্তায় অবিশ্রাম কর্মে নিযুক্ত—কল্যাণ যেন দুই হাতের দশ অঙ্গুলি দিয়া অজস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে, সুপ্রসন্ন মুখে শান্তি পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধছায়া।" কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই শান্তি ও পরিতৃপ্তি রাজলক্ষ্মী কোথায় পাইল? আমরা জানি ইহা সে মুরারিপুরে কমললতার নিকটেই পাইয়াছিল। রাজলক্ষ্মীর জীবনে এতদিন ইহারই একান্ত অভাব ছিল। এই জন্যই তাহার সর্বক্ষণের সন্তর্পণ সতর্ক দৃষ্টি শ্রীকান্তকে এতদিন ধরিয়া শুধু আকর্ষণই করিয়াছে কিন্তু বাঁধিতে পারে নাই। যাহাকে হাতের মধ্যে পাইয়াছিল, তাহাকে হারাই-হারাই ভাব তাহার কোন দিনই ঘুচে নাই। মুরারিপুর আশ্রম হইতে ফিরিবার পথে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে কমললতার তুলনা করিয়া দেখিয়াছিল। শ্রীকান্ত তাহার আপন স্বভাবের প্রতিচ্ছবি কমললতার মধ্যে দেখিয়াছিল। শ্রীকান্ত বলিয়াছিল— 'ওর কাছে আমার মুক্তি, আছে আমার মর্যাদা, আছে আমার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ।' আমরা দেখি, শ্রীকান্ত শৈশবের লক্ষ্মী সেদিন তাহাকে ছাড়িয়া বহু দূরে সরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু ইহার কারণ

কি ? কমললতা তাহাকে এমন কি দিয়াছে যাহা সে রাজলক্ষ্মীর নিকট পায় নাই ? আমরা জানি, রাজলক্ষ্মীর নিকট শ্রীকান্ত সমস্ত কিছুই পাইয়াছিল কিন্তু পায় নাই একটা সহজ নির্বিকার ভাব। এই জন্যই রাজলক্ষ্মীর নিকট তাহার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। রাজলক্ষ্মী তাহাকে সমস্ত দিয়াও নিজের স্বাতন্ত্র্য দিতে পারে নাই। পিয়ারী বাঈজীর জীবন শ্রীকান্তর নিকট কখনও উদঘাটিত হয় নাই, রাজলক্ষ্মী তাহার সেই কালিমালিপ্ত-জীবন শ্রীকান্তর নিকট গোপনই রাখিয়া ছিল। সে চাহিয়াছিল, অতীতের কলঙ্ক অতীতেই চাপা পড়িয়া থাক, বর্তমানের যাহা কিছু মঙ্গল, যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু মহৎ তা দিয়াই ভালবাসার দেবতার পূজা হউক। এই জন্যই সে ভাল মন্দ নির্বিশেষে সব শ্রীকান্তর নিকট অর্পণ করতে পারে নাই এবং এই জন্যই যাত্রাপথে তাহাদের গতি কখনও স্বচ্ছ সাবলীল এবং সহজ হইয়া উঠে নাই। রাজলক্ষ্মীর সেবা, রাজলক্ষ্মীর ভালবাসা শ্রীকান্তকে সর্বদা আকর্ষণ করিত, এইজন্য সে রাজলক্ষ্মীর নিকট ছুটিয়া যাইত। কিন্তু কিছুদিন পরেই খুঁজিত মুক্তির পথ। আর রাজলক্ষ্মী নিজেও ভালবাসার দেবতার সঙ্গে মিলনের সহজ পথটি খুঁজিয়া না পাইয়া আপনাকে ডুবাইয়া দিত গঙ্গা স্নান, দেবদেবী পূজা এবং ব্রত পার্বণের মধ্যে। পবিত্রতা দিয়াই সে দেবতার পূজা করিতে যাইতেছিল। কিন্তু ভালবাসা এবং পবিত্রতা এক নয় এ শিক্ষা রাজলক্ষ্মী কমললতার নিকটই পাইয়াছিল। রাজলক্ষ্মীর পবিত্রতার বেড়া ডিঙ্গাইয়া শ্রীকান্ত তাহার নিকট পৌঁছাইতে পারিতেছিল না। কিন্তু কমললতার নিকটই রাজলক্ষ্মী সেদিন বুঝিয়াছিল, প্রেমের দেবতার পূজায় আপন মঙ্গল অমঙ্গল সকল প্রকার অর্ঘ্য সমর্পণ করিলে তবেই সে পূজা সিদ্ধ হয়। আমরা জানি, রাজলক্ষ্মীকে এই শিক্ষা দেওয়াই ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্যই শ্রীহট্ট হইতে উষাঙ্গিনী আসিল নবদ্বীপে এবং তারপরে সে কমললতা হইয়া আসিল মুরারীপুর আশ্রমে। এই কর্তব্য শেষ করিয়া শ্রীকান্তর জীবনের নিকট বিদায় লইয়া কোন সুদূর বৃন্দাবনে পাড়ি দিল। রেলগাড়ীর ঘর্ঘরশব্দে তাহার বুক ফাটা ক্রন্দন চাপা পড়িয়া গেল।

কমল ও শেষ প্রশ্ন

শরৎ-সাহিত্যে সর্বত্রই আমরা দেখিয়াছি, নারীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে সমাজের জয়। জ্ঞানদার অরক্ষণীয়া জীবনের অসহ্য বেদনায়, সাবিত্রীস্বরূপা অন্নদা দিদির ব্যথিত জীবনের দুঃসহ ব্যর্থতায়, কোথাও ইহার ব্যতিক্রম নাই। পিয়ারী বাঈজীই হউক বা রাজলক্ষ্মীই হউক, দেবদাসের পারুই হউক অথবা হাতীপোতা গ্রামের বড় গিন্নীই হউক, সমাজের চোখ রাঙানিকে কেহই উপেক্ষা করিতে পারে নাই। সরযুকে আমরা কাশীতে কৈলাস খুড়োর গৃহেই দেখি বা পল্লী জমিদার চন্দ্রনাথ বা মণিশঙ্করের গৃহেই দেখি, সমাজের শাসনে তাহার সর্বদাই ভয়। এমন কি, নির্বিরোধ পল্লীরমণী কুসুম তাহার পক্ষেও সমাজের অবাধ্য হইবার জো নাই।

এজন্য শরৎ-সাহিত্যের সর্বত্র আমরা সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেখিতে পাই। অন্যত্র যে অভিযোগ কতকটা প্রচ্ছন্ন হইলেও রমা এবং রমেশের জীবনকে উপলক্ষ্য করিয়া শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ অত্যন্ত দৃঢ় ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। অভিযোগ অন্যত্র আছে কিন্তু এই অভিযোগের অন্তর্নিহিত সুর কোথাও বিদ্রোহের সুর নয়। সমাজের অত্যাচারে অত্যাচারিত এবং লাঞ্ছিত নরনারীর প্রতি শরৎ-সাহিত্য সহানুভূতিশীল হইলেও নর-নারীর অসহ্য ব্যথাবেদনার মধ্যদিয়া শরৎ-সাহিত্য যে ইঙ্গিত বহন করে তাহাতে মনে হয় সমাজ মঙ্গলেরই আধার। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও যে নাই তাহা নহে—যেমন, অভয়া ও কিরণময়ী। আমরা দেখি, বিদ্রোহ তাহারা করিয়াছিল কিন্তু সে সমাজের বাহিরে গিয়া সুদূর সাগরের ওপারে। সমাজ সেখানে তাহাদের নাগাল পাইবে না। তারপরে বিদ্রোহী নারী একদিন সমাজের বুকে ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু আপনাকে সে আর ফিরিয়া পাইল না। শরৎ-সাহিত্য কিরণময়ীকে উন্মাদিনী সাজাইয়া শেষ পর্যন্ত সমাজের মুখ রক্ষা করিল।

কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে সমাজের এই সর্বত্র সুনিয়ন্ত্রিত জয়যাত্রার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছে একমাত্র কমল। তাহার পরিচয় দিয়াছেন আশুবাবু,—"জীবনের অর্থ ওর কাছে স্বতন্ত্র, আমাদের সঙ্গে তার কোথাও মিল নেই। অদৃষ্ট ও মানে না, অতীতের স্মৃতি ওর সম্মুখের পথ রোধ করে না, ওর অনাগত তাই আজও এসে পৌঁছায় নি। তাই ওর আশাও যেমনি দুর্বার, আনন্দও তেমনি অপরাজেয়।" আমরা জানি, আশুবাবুর এই উক্তির একবর্ণও অতিরঞ্জিত নয়। অবশ্য একথাও অস্বীকার করা চলে না যে শরৎচন্দ্র কমলকে বাংলার দীঘি-পুকুরে সৃষ্টি করেননি, বাংলার সমাজের সঙ্গে কমলের কোন যোগ নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে, জগতে কমলের মিল কোথাও নাই, কোথাও থাকিতেও পারে না। বাংলার সাধারণ সমাজ হইতে বহুদূরে কমলকে শরৎচন্দ্র আগ্রায় প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যেই সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ হয়ত বলিবেন, কেন আগ্রার বাঙ্গালীরাও তো একটা দল গঠন করিয়া চলিত, সে সমাজেরও তো শাসন ছিল এবং সে শাসন তাহাদের মানিয়া চলিতে হইত। কিন্তু একথা অস্বীকার করা চলে না যে এদের মূল কোথাও কাহারও সঙ্গেই ছিল না। কমল একক এবং একাকী থাকিবে, সে থাকিবে আপন শক্তিতে ভরপুর, বোধহয় শরৎচন্দ্রের ইহাই ছিল ইচ্ছা এবং এইজন্যই তিনি হয়ত আগ্রার যমুনার জলে কমল ভাসাইয়া ছিলেন। কিন্তু এখানেও তিনি কমলের জন্য মৃণাল সৃষ্টি করিতে পারেন নাই এবং আর কাহারও সঙ্গে গ্রন্থি যোজনা করিতে পারেন নাই।

আমরা দেখি, আগ্রায় এই প্রবাসী সমাজও কমলকে অবাধভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। আশুবাবু, হরেন্দ্র, অক্ষয়, নীলিমা, মনোরমা এবং বেলা—ইহাদের সমাজে কমল ছিল একটা ধূমকেতু। তাহাকে লইয়া সর্বত্র একটা আলোচনা চলিত কিন্তু নিবিড় মিলনে এবং অচ্ছেদ্য

বন্ধনে কমল এই সমাজের অঙ্গীভূত হইতে পারে নাই। প্রবাসী সমাজে অক্ষয়ের রূঢ় ব্যবহার কেহই পছন্দ করে না তবুও সে ছিল এই সমাজেরই অঙ্গ, এই সমাজের একজন। প্রবাসী আগ্রা সমাজে সে অচল নয়। কিন্তু কমলের কথাবার্তা, এবং আচরণ ব্যবহার সেই তুলনায় মনোজ্ঞ। তবুও কেহই যেন তাহাকে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। আগ্রা-সমাজে কমল ছিল সকলের নিকট হইতে আলাদা অথচ তাহার ধূমকেতুর পুচ্ছ তাড়নে সকলেই বিব্রত এবং বিচলিত বোধ করিতেছিল।

ইহার কারণ, কমল ছিল বিদ্রোহী। দীর্ঘকাল প্রচলনে যে সকল সামাজিক রীতিনীতি এই প্রবাসী সমাজেও অলঙ্ঘ্য মর্যাদা পাইয়া আসিতেছিল, কমল তাহার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছিল, বিদ্রোহ করিয়াছিল। এই জন্যই কমলকে তাহারা সহ্য করিতে পারে নাই। তাহারা বিদ্রোহ অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু বিদ্রোহীর শক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। এই জন্যই সভাসমিতিতে, নিমন্ত্রণ মজলিসে কমলকে তাহারা স্থান না দিয়া পারেন নাই, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তাহাকে গ্রহণ করিতেও পারেন নাই। কমলের বিদ্রোহের বাণী সকলকে অভিভূত করিয়াছে, ব্যথা দিয়াছে কিন্তু তবুও বিদ্রোহীর অপরিসীম শক্তিকে ঝাড়িয়া দূরে ঠেলিয়া দিতে পারে নাই। আঘাত খাইয়া বিরুদ্ধ যুক্তি পুঞ্জীভূত হইয়া কমলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু সে যুক্তি কোথাও আশ্রয় পায় নাই, কোথাও নির্ভরতা পায় নাই। আগ্রা-সমাজ কমলের যুক্তি গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহারা চিরাচরিত অজানাকেই আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইতে চাহিয়াছিল। এই জন্যই কমলকে তাহারা না পারিয়াছিল ত্যাগ করিতে, না পারিয়াছিল গ্রহণ করিতে।

বিদ্রোহী নারীকে প্রথম আমরা দেখি, অনন্ত ঐশ্বর্যময় বিশ্ববিখ্যাত তাজের সিংহদ্বারে। কমলের রূপের পরিচয় দিয়াছেন শরৎচন্দ্র নিজে— "যে জীবন্ত বিস্ময় এই অপরিমিত রমণীর সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া অকস্মাৎ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে ইহারই সম্মুখে ওই অদূরস্থিত মর্মরের অব্যক্ত বিস্ময়

যেন এক মুহূর্তেই ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।" কিন্তু আমরা জানি, এই রূপই কমলের একমাত্র পরিচয় নয়। ইহাই কমলের জীবনে একমাত্র বিস্ময় নয়। সকল বিস্ময়কে ছাড়াইয়া যায় তাহার অন্তরের বিদ্রোহী-নারী। সমস্ত পুরাতনকেই সে নির্মম কঠিন আঘাতে চূর্ণ করিতে চায়। অতীতের সব কিছু তাহার নিকট মিথ্যা, যদি সে বর্তমানের পরীক্ষায় টিকিতে না পারে। তাই সে সমস্ত কিছুকেই যাচাই করিয়া লইতে চায় বর্তমানের মাপকাঠিতে। বিদ্রোহী অন্তর কল্পনার সৌন্দর্য গড়ে না, পুরাতনের ব্যর্থ আড়ম্বরে কোন বস্তুই সেখানে মহৎ হইয়া উঠে না।

নরনারীর প্রেমের আবরণ দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সমাধি সৌধকে মহিমাময় এবং গৌরবময় করিয়া রাখিয়াছে, সেই তাজমহলকে আমরা জানি। স্বপ্ন দিয়া, কল্পনার মাধুরী দিয়া বিশ্বের বিরহী নরনারীর দল মোহন রঙে ইহাকে সাজাইয়াছিল। ইহাদের নিকট তাজমহল সম্রাট শাহজাহানের একনিষ্ঠ পত্নী প্রেমের মর্মরায়িত রূপ। আগ্রায় রমণী সমাজও তাজের এই একটিমাত্র রূপই দেখিয়াছিল, তাজের এই একটি-মাত্র পরিচয়ই তাহারা জানিত। সেইজন্য বৃদ্ধ আশুবাবু তাজমহলের মধ্যে সম্রাট শাহজাহানকেই দেখিতেছিলেন, দেখিতেছিলেন তার অপরিসীম ব্যথা যেন পাথরের অঙ্গে অঙ্গে মাখানো, অতুলনীয় পত্নী-প্রেম যেন এই বিরাট সৌধের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে। আশুবাবুর মতো আর দশ জনেও সেদিন বুঝিয়াছিল,—এই মর্মর-কাব্যের ভিতর দিয়া শাহজাহানের পত্নীপ্রেমই বিশ্বের নিকট অমরতা পাইয়াছে।

কিন্তু সেই তাজমহলের নীচে দাঁড়াইয়া আগ্রার সমগ্র বাঙ্গালী সমাজের সম্মুখে তাজের নূতন অর্থ করিল কমল। মুহূর্ত মধ্যে এক প্রবল ভূমিকম্পে সকলেরই স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া গেল, কল্পনা অন্তর্হিত হইল। চমকিত হইয়া সকলে শুনিল—তাজমহল শাহজাহান বাদশার স্বকীয় আনন্দলোকের অক্ষয় দান। একনিষ্ঠ প্রেম ইহার কোথাও নাই। এই বিরাট সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠায় মমতাজ একটি আকস্মিক উপলক্ষ্য মাত্র। তাজমহলের মধ্যে মমতাজ নাই, তবুও ইহার মূল্য কমলের নিকট একবিন্দু কমে নাই। বিশ্বের সৌন্দর্যের ইতিহাসে

অজেয় পরিচয় মমতাজকে আশ্রয় করিয়া না দাঁড়াইলেও সৌন্দর্যের দিক হইতে তাহার মূল্য তেমনই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এক মুহূর্তে আমরা কমলের যথার্থ পরিচয় পাইলাম। আমরা বুঝি, কল্পনা দিয়া সে কাব্য গড়ে না, তাহার সৌন্দর্যের ভাবরাজ্যে মরীচিকা নাই। মানুষের সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু এবং কর্ণ মাত্র সৌন্দর্য বিচারে সাক্ষী, কমল ইহাই মাত্র জানে।

অন্য সকলের মত আগ্রার বাঙ্গালী সমাজও দীর্ঘদিন ধরিয়া তাজকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার পশ্চাতে এক কল্পনার সৌন্দর্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। মনের গোপন রঙে সমাধি-সৌধকে তাহারা দেবতার মন্দির করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু কমল এক মুহূর্তেই অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহাদের জানাইল, এ মন্দিরে দেবতার আসন নাই, আর দশটা সৌধের মতই ইটের উপর ইট, পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া ইহাই তৈরী হইয়াছে। সমবেত সকলে সেদিন কমলের এ যুক্তিকে খণ্ডন করিতে পারে নাই, কিন্তু প্রাণ দিয়া তাহারা কথাগুলিকে মানিয়া লইতেও পারে নাই। দীর্ঘদিন ধরিয়া যে কল্পনাকে তাহারা অতি যত্নে পালন করিয়া আসিতেছেন, তাহাকে প্রাণহীন জানিয়াও আজ তাহারা ত্যাগ করিবেন কেমন করিয়া? তাই তাহাদের প্রথম চেষ্টা হইল—কল্পনাকেই সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে।

নরনারীর প্রেমের ব্যাপারে মানুষ বহুদিন ধরিয়া একনিষ্ঠ আদর্শকেই সর্বোচ্চ আসন দিয়া আসিতেছে। এইজন্য আগ্রায় বাঙ্গালী সমাজে আশুবাবু ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। কারণ মৃতা স্ত্রীর আসনে কোন দিনই তিনি আর কাহাকেও আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। কিন্তু কমলের নিকট আশুবাবুর এই পরিচয়—তাঁহার হৃদয়ের অচল, অনড় জড় ধর্মেরই পরিচয়। তাহার মতে ইহা সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়। দেহমনে যাহার যৌবন আছে, যাহার মনের প্রাণ আছে, একদিন সে যাহাকে ভালবাসিয়াছে, কোন দিনই কোন কারণে কেন যে তাহার পরিবর্তন ঘটিতে পারিবে না, কমল তাহা বুঝিতে পারে না। নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে একনিষ্ঠতাকে কমল বড় বলিয়াও মানে না, আদর্শ বলিয়াও মানে না।

আমরা জানি, কমলের এই উক্তি তাহার দম্ভ নয়, তাহার জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতাও নয়। অনুষ্ঠান তাহা যে ধরনেরই হউক না কেন, কমল তাহাকে মানিতে পারে না। আবার শৈব বিবাহ, আর দশজনের নিকট যত ফাঁকি বলিয়া মনে হউক না কেন, কমলের নিকট ইহা ফাঁকি নয়। সংযম তাহার নিকট অর্থহীন, ইহা শুধু নিষ্ফলের আত্মপীড়ন। অবস্থা বিশেষে সংযম একটা ফাঁকা আওয়াজের বেশী নয়, একথা শুধু সে বিশ্বাস করে না, ইহা প্রচার করিতেও তাহার বাধে না, ভয়ও হয় না। আমরা দেখি, ক্ষণিকের মুহূর্তগুলি লইয়াই কমল জীবনের আনন্দলোক সৃষ্টি করে। ক্ষণিক তাহার নিকট অর্থহীন নয়। এক মুহূর্তের আনন্দও তাহার নিকট মিথ্যা নয়। জীবনের বিগত সুখের শিশির বিন্দুগুলি লইয়া যে বাঁচিয়া থাকিতে চায় না, কিন্তু তাহা যত অল্প, যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, পরিমাণ তাহার যত তুচ্ছ বলিয়াই সংসারে গণ্য হউক না কেন, কমল তাহাকে কোন দিনই অস্বীকার করিবে না। এই কথাই সে অজিতকে বলিয়াছিল,—এ জীবনে সুখ-দুঃখের কোনটাই সত্যি নয় অজিতবাবু, সত্যি শুধু তার চঞ্চল মুহূর্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু। বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়া একে পাওয়াই ত সত্যিকার পাওয়া। অন্য একদিনও কমল অজিতকে ইহাই জানাইয়াছিল—"হোক মোহ ক্ষণিকের কিন্তু ক্ষণও তো মিথ্যা নয়। ক্ষণকালের আনন্দ নিয়েই সে বার বার ফিরে আসে।" এইজন্যে শিবনাথের সঙ্গে মিলন তাহার ক্ষণস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনাকেও সে এতদিন অন্তর দিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল। একদিনের জন্যও সন্দেহের কৃষ্ণমেঘ আসিয়া মিলনের নির্মল আকাশের নিবিড় আনন্দকে আচ্ছন্ন করে নাই। আবার যখন সেই একান্ত অভিপ্রেত আনন্দলোক হইতে যখন সে অপসৃত হইল, মিলনের হাল্কা লঘু মেঘ যখন সূর্যালোকে অদৃশ্য হইল, কমল ইহার জন্য একটি বারও কাহারও নিকট অভিযোগ করে নাই। অজিতের দেওয়া বিবাহের অধিকারও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এইজন্যই। মিলনের অবাধ আনন্দকে সে স্থায়িত্বের শক্ত বাঁধনে বাঁধিতে চাহে নাই। অজিতকে সে ইহাই বলিয়াছিল—"কোন আনন্দেরই স্থায়িত্ব

নাই। আছে শুধু তার ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি। সেই তো মানব জীবনের চরম সঞ্চয়। তাকে বাঁধতে গেলেই সে মরে।")

(এইজন্যই প্রচলিত সমাজের গণ্ডীর মধ্যে কমলের স্থান নাই।) নরনারীর ভালবাসাকে সমাজ বিবাহের মধ্যদিয়া স্থায়ী রূপ দেয়। সমাজ এই ভালবাসাকেই গ্রহণ করিতে পারে। (ক্ষণিকের মিলনকে সে কোন মূল্য দিবে না। সমাজের নিকট ইহা উচ্ছৃঙ্খলতা, সংযমহীনতা। কিন্তু কমলকে আমরা দেখি—সে সমাজের এই কঠোর শাসনকে শুধু অস্বীকার করিতেছে না, যুক্তি দিয়া এই উচ্ছৃঙ্খলতাকেই সমর্থন করিতেছে।) পাথরের নোড়ার স্থায়িত্ব আছে বলিয়া তাহা সত্য হইবে কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী বলিয়া তাহা সত্য হইবে না, কমল ইহা কোন মতেই মানিয়া লইতে পারে না। ফুল নিত্যকালের নয়, আয়ু তাহার একবেলার বেশী নয়, কিন্তু তাই বলিয়া কমল তাহার একবেলার জীবনকে অস্বীকার করিবে কেন? গাছের পাতা চিরস্থায়ী নয়, তাহার ঝরিয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে, কিন্তু সেজন্য তাহার সেই ক্ষণিকের অস্তিত্বও কমলের নিকট মিথ্যা নয়। শুকনা পাতা ঝরিয়া পড়ে, তাহার স্থানে নূতন পাতা গজায়, গাছ সেই নূতন পাতাকেই প্রাণ দিয়া গ্রহণ করে, জীবন্ত বৃক্ষ শুকনা পাতাগুলিকে আঁকড়াইয়া থাকিবে, কমল ইহার মধ্যে কোন মহত্বই দেখিতে পায় না (কমলের নিকট বিবাহটা সংসারের অনেক ঘটনার মতো একটা ঘটনা মাত্র, ইহার বেশী কিছু নয়। নারীর সর্বস্ব বলিয়া কমল কোনমতেই ইহাকে মনে করিতে পারে না। অতীতে নরনারীর জীবনে বিবাহের প্রয়োজন হয়ত ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া আজ ইহার প্রয়োজন যদি ফুরাইয়া গিয়া থাকে, তবুও পরিবর্তন হবে না কেন—কমল হয়ত ইহাই বলিতে চাহিয়াছিল। আশুবাবু তাহাকে বলিয়াছিলেন, "কমল, আমরা জন্মান্তর মানি, প্রতীক্ষা করবার সময় আমাদের অনন্ত, উপুড় হইয়া শুয়ে থাবার প্রয়োজনই হয় না।" কমল শান্তকণ্ঠে উত্তর করিয়াছিল—"একথা মানি কাকাবাবু, কিন্তু তাই বলে তো আপনার সংস্কারকে যুক্তি বলেও মেনে নিতে পারবো না। আকাশ-কুসুমের আশায় বিধাতার দোরে হাত পেতে

জন্মান্তরকাল প্রতীক্ষা করবারও আমার ধৈর্য থাকবে না। যে জীবনকে সবার মাঝখানে সহজ বুদ্ধিতে পাই, এই আমার সত্য, এই আমার মহৎ।")

কমল ফুলে ফলে, শোভার সম্পদে তাহার বর্তমানকেই পূর্ণ দেখিতে চায়। পরকালের বৃহত্তর লাভের আশায় ইহকালের সামান্য সম্পদকে সে অবহেলায় অপমান করে না। (আমরা জানি, এই জীবন তাহার শুধু বৎসর গণনা করিয়া হয় না। আদর্শ কত দিন স্থায়ী হইল, তাহা দ্বারা কমল তাহার মূল্য ধার্য করে না। অচল, অনড় ভুলে ভরা সমাজের সহস্র বৎসর ও অনাগত দশটা বছরের গতিবেগে ভাসিয়া যাইতে পারে—কমল এই কথাই মনে প্রাণে একান্তভাবে বিশ্বাস করে। এই কারণেই শুধুমাত্র প্রাচীন বলিয়া কোন কিছু তাহার নিকট পূজ্য হইয়া উঠে না। কালধর্মে কোন বস্তু অতীত হইলেই তাহা মহৎ হইয়া উঠে না, তাহার গৌরব বৃদ্ধি পায় না। কমল এই সত্য জানে এবং এই সত্যকেই সে প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। এইজন্যই হরেন্দ্র, অক্ষয় এবং অজিতের দলের ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাহার বিরাগের অন্ত নাই। তাহার সর্বপ্রকার অশ্রদ্ধা এবং পরিহাসের মূলে ইহাই। হরেন্দ্রের আশ্রমের সতীশ তাহাকে একদিন কহিয়াছিল—"ভারতের জ্ঞান, ভারতের প্রাচীনতত্ত্ব এই ভারতেরই বিশেষত্ব ও প্রাণ। সেই ভাব, সেই তত্ত্ব বিসর্জন দিয়া দেশকে যদি স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয় তবে সে স্বাধীনতার তো ভারতের জয় হবে না, জয় হবে শুধু পাশ্চাত্য নীতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার। সে পরাজয়ের নামান্তর। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।" হরেন্দ্রের আন্তরিক বেদনা অনুভব করিয়া সেদিন সকলেই নিরুত্তর মৌন রহিয়াছিল, কিন্তু কমল উত্তর না করিয়া পারে নাই। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, সংযত, শান্ত এবং মৃদু কণ্ঠে সে সতীশকে বলিল—"সতীশবাবু, নিজের জীবনে যেমন নিজেকে বিসর্জন দিয়াছেন, সংস্কারের দিক দিয়েও যদি তাকে এমনি পরিত্যাগ করতে পারতেন, একথা উপলব্ধি করা কঠিন হোত না যে, ভাবের জন্য, বিশেষত্বের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই তার সমাদর। মানুষের জন্যই তার দাম।"

আমরা জানি, ইহাই কমলের মত। প্রচলিত সমাজে সর্বত্র ইহার অনুমোদন নাই কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিও আগ্রার সমাজে মিলে না।)

(আগ্রার সমবেত বাঙ্গালী-সমাজকে কমল শুনাইয়াছে দুনিয়ার বয়স হইতে হাজার দুই বছর মুছিয়া ফেলিলেই মানুষের পক্ষে স্বর্ণযুগ নামিয়া আসিবে না। আশুবাবুকে একদিন সে কহিয়াছিল—"রামায়ণ মহাভারতে যত কথাই লেখা থাক, তার শ্লোক হাতড়ে সাধারণ মানুষের দেখাও মিলবে না এবং মাতৃজঠর যত নিরাপদই হোক না কেন, তাতে ফিরে যাওয়াও যাবে না।" কমলের বাক্যের নিঃসংশয় নির্ভরতায় সেদিন সকলকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহার দৃঢ়তা দেখিয়া সকলে বিস্ময় মানিয়াছিল। ইহার সঙ্গে একমত না হইলেও ইহাকে উপেক্ষা করিবার সাধ্যও তাহাদের ছিল না। বৃদ্ধ আশুবাবু ইহা স্বীকার করিয়াই বলিয়াছিলেন—"তর্কে যাই কেন বলি না কমল, তোমার অনেক কথাই স্বীকার করি।"

নরনারীর কোন আদর্শকেই কমল শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়া পূজা করিতে পারে নাই। চিরন্তন সত্য বলিয়া কিছুই তাহার নিকট নাই। অতীতে একদিন যে বস্তু সত্য ছিল, জগতের এবং সৃষ্টির কল্যাণের জন্যই সেদিন হয়ত তাহার প্রয়োজন ছিল কিন্তু আজ দীর্ঘদিন পরেও তাহার সেই কল্যাণ আদর্শ তেমনি অক্ষয়, তেমনি অটুট হইয়া আছে, ইহা বিশ্বাস করা কমলের ধর্ম নয়। তাই অকপট শ্রদ্ধা বলিয়া কোন কথা কমলের অভিধানে নাই। এর জন্যই আশুবাবুর একনিষ্ঠ প্রেমকে সে অবহেলা করে, নীলিমার নিঃস্বার্থ গৃহিণীপনাকে সে উপহাস করে এবং হরেন্দ্রের আশ্রমের অকৃত্রিম ভারতীয়তাকে সে বিদ্রূপ করে। অপরে যেখানে আত্মসংযমের অপূর্ব আদর্শ দেখিরা মাথা নত করে, কমল সেখানে নিষ্ফল আত্মনিগ্রহই দেখিতে পায়।)

অবিনাশবাবুর গৃহে নীলিমা নিঃস্বার্থ গৃহিণীপনায় রত হইয়াছিল, হরেন্দ্র-অক্ষয়ের দল ইহার মধ্যে দেখিয়াছিল তাহার পরহিতার্থে অপূর্ব আত্মদান। আত্মত্যাগের এই মহান আদর্শের নিকট তাহারা মাথা নত

করিয়াছিল। শুধু ইহাই নয়, হরেন্দ্র অক্ষয়ের দল সদম্ভে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছিল—নারীত্বের এতবড় আদর্শ শুধু ভারতেই সম্ভব। এমন আদর্শ, এতবড় মহিমা তাহারা দুনিয়ায় অন্য কোথাও দেখে নাই, অন্য কোন দেশে ইহা মিলিবে না। কিন্তু কমলের মুখে তাহারা এক নূতন কথা শুনিল। (কমল তাহাদের জানাইল—বাক্যের ছটায়, বিশেষণের চাতুর্যে লোক ইহাকে যত গৌরবান্বিত করিয়াই তুলুক না কেন, গৃহিণীপনার এই মিথ্যা অভিনয়ে না আছে গৌরব, না আছে আনন্দ। নারীর জীবনে ইহা সার্থকতার পথ নয়, ইহা ত্যাগ করাই তাহার মঙ্গল।) আগ্রা সমাজকে কমল জানাইয়াছিল, পুরুষের বাহবার কড়া মদ খাইয়াই নারী এই পথে আপনাকে ভুলাইয়া রাখে। এই কর্মভোগের নেশার ব্যর্থতার ভিতর দিয়া তাহার সমস্ত জীবনটা অতিবাহিত হইয়া যায়। নীলিমা নিজেও একথা জানিত না কিন্তু সত্য তাহার নিকট একদিন সুপরিস্ফুটভাবেই ব্যক্ত হইয়াছিল। (একদিন সে সত্যসত্যই বুঝিয়াছিল—বিধবার জীবনে সত্যিকার আশ্রয় কোথাও নাই, আশুবাবু গৃহেও না, অবিনাশবাবুর গৃহেও না, আশ্রয় তাহার হরেন্দ্রের আশ্রমেও নাই।)

আমরা দেখি, প্রচলিত সমস্ত নীতি এবং প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সত্যকে কমল যেন অবজ্ঞায় পূর্ণ করিয়াই চলিতে চায়। যাহা কিছু প্রাচীন, যাহা কিছু অতীত, তাহাকে নাড়া দিয়া ভাঙিয়া ফেলাই যেন তাহার প্যাসন, (মেয়েদের আত্মোৎসর্গ তাহার নিকট অর্থহীন। কমলের কথা—"ও প্রবৃত্তি তাদের পূর্ণতা থেকে আসে না, আসে শূন্যতা থেকে ওঠে বুক খালি করে দিয়ে। ও তাদের স্বভাব নয়, অভাব।" এই অভাবের আত্মোৎসর্গে তাহার কানাকড়ি বিশ্বাস নাই, একথা কমল দম্ভ সহকারেই প্রকাশ করে। আশুবাবুকে একদিন কমল ইহাই বলিয়াছিল—"সার্থকতার যে আইডিয়া শিশুকাল থেকে মেয়েদের মাথায় ঢুকিয়ে এসেছেন, সেই মুখস্থ বুলিই তো তারা সদর্পে আবৃত্তি কোরে ভাবে এই বুঝি সত্যি? আপনারও ঠকেন, আত্মপ্রসারের ব্যর্থ অভিমানে তারা নিজেরাও মরে।" হরেন্দ্র-অক্ষয়ের দল এই যুক্তির বিরুদ্ধে

কোন উত্তর খুঁজিয়া পায় নাই। চিরন্তন সংস্কার অন্তরে থাকিয়া গুমরিয়া মরিয়াছে, কমলকে উপেক্ষা করিয়াই উত্তর দিতে গিয়াছে, কিন্তু ব্যর্থ আঘাত করিয়াই সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।) আশুবাবু একথা স্বীকার করিয়াই বলিয়াছেন—"মন সায় দিতে চায় না, চির-দিনের সংস্কার ভয়ে কাঠ হয়ে উঠে, তবু কথা খুঁজে মেলে না, পরাভব মানতে হয়।" (আমাদের নিকট ইহাই কমলের পরিচয়।) (হিন্দু সভ্যতার গৌরবময় মহিমার সঙ্গে তাহার পরিচয় নাই, ত্যাগ ও বিসর্জনের দীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যাহারা সফলতা অর্জন করিয়াছে, কমল তাহাদের জানে না, নিঃশেষে দান করিয়া, আপনাকে বিলাইয়া দিয়াই যাহারা নিজেদের পাইয়াছে, দুঃখবরণের মধ্যে যথার্থ আত্ম-প্রতিষ্ঠা যাহাদের, কমল তাহাদের চেনে না। তাই জীবনের মূলমন্ত্র তাহার কেবল ভোগের মন্ত্র, যুক্তিতর্ক তাহার কেবল ভোগের ওকালতিতেই পূর্ণ। আমরা দেখি, কমলের সমস্ত প্রকার যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে এই বিশ্বাসই ছিল আগ্রার বাঙ্গালী সমাজের আশ্রয়, এই সান্ত্বনার মধ্যেই তাহারা কমলের সমস্ত কথা ও কার্যের বিরুদ্ধে যুক্তি খুঁজিয়া ফিরিত। তবুও মন তাহাদের মানিত না, মনে হইত কোথায় যেন ফাঁক আছে। তাহারা বুঝিত না—যেখানে তাহারা দাঁড়াইয়া আছে সেই ভিত্তি অটল নহে। তাই কমলকে তাহারা মুখে উপেক্ষা করিতে চাহিলেও মন তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিত না।

(আত্মোৎসর্গের মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যই হরেন্দ্র আশ্রম স্থাপন করিয়াছিল।) ইউরোপীয় সংস্পর্শের বাহিরে আপনাদের সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পথেই তাহারা সমাজ সংস্কার করিতে চাহিয়াছিল। অতীত ভারতের দানে, পুণ্যে এবং তপস্যার মধ্যে যে আদর্শ ছিল তাহারই জোরে আবার নির্জীব ভারতকে বাঁচাইতে চাহিয়াছিল। (আগ্রা সমাজের আশুবাবু, অবিনাশবাবু এবং অক্ষয় সকলেরই অনুমোদন ইহার পশ্চাতে ছিল।) ফলে ঘরছাড়া কতকগুলি ছেলে জুটাইয়া অল্প দিনের মধ্যেই কমলের ভাষায় 'ত্যাগের গ্রাজুয়েট' করিয়া তুলিতেছিল। গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতা নেই, পরণের বস্ত্র জীর্ণ, মাথার কেশ তাহাদের

রুক্ষ। সমস্ত জীবন ভরিয়া তাহারা কেবল অস্বীকারকেই পাইয়া আসিয়াছে.—ইহাই ছিল হরেন্দ্রের আশ্রমের ভবিষ্যৎ ভারতের উজ্জ্বল আদর্শ। ইহারা বুঝিয়াছিল—অপরের দুঃখের বোঝাকেই তাহারা মাথা পাতিয়া লইয়াছে, সংযম ও ত্যাগের শিক্ষার ভিতর দিয়া অনধিকার ও প্রবঞ্চিতের ক্ষুধাকেই জীবনে তাহারা একমাত্র সম্বল করিয়াছে এবং এই পথেই ভবিষ্যৎ ভারতকে বাঁচিবার পথ দেখাইবার কঠোর কর্তব্য তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। (আশ্রমের এই মহৎ আদর্শ আগ্রা-সমাজের সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে কিন্তু কমলের নিকট ইহা আত্মনিগ্রহ মাত্র।)

(কমল জানিত, এই আত্মনিগ্রহের মধ্যে আপনাকেই ইহারা কোন দিন চিনিতে পারিবে না।) মিথ্যা আড়ম্বরের পশ্চাতে আদর্শ আপনি অন্তর্ধান করিবে, নিজেদের বাক্যের ছটায় নিজেরাই ভুলিয়া থাকিবে। কমলের নিকট হরেন্দ্র কহিয়াছিল,—ইহারা দেশের মুক্তি আনিবে। কমল তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"কার থেকে মুক্তি, হরেনবাবু?" উপস্থিত হরেন কিংবা সতীশ কেহই কোন উত্তর দেয় নাই। তাই পথের আদর্শ কমল নিজেই দেখাইয়াছিল। হরেন্দ্রকে কমল কহিয়াছিল, তাই বলুন, এ আমাদের কাম্য নয়, বলুন আমাদের আদর্শ স্বতন্ত্র। বলুন, সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্য সাধনা আমাদের নয়, আমাদের সাধনা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা।" কমল আরও একদিন হরেন্দ্রকে এই কথাই জানাইয়াছিল,—"দৈন্য এবং অভাব ইচ্ছাতে আসুক, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আসুক, ও নিয়ে দর্প করার কিছু নেই।" আগ্রার এই সমাজকে কমল বুঝাইয়াছিল, দৈন্যের মাঝে আছে শূন্যতা, দৈন্যের মাঝে আছে দুর্বলতা।) (অভাব এবং দৈন্য মানুষকে কত হীন, কত ক্ষুদ্র করিতে পারে ইহার প্রমাণ কমল মুচিপাড়ায় গিয়েই দেখিয়া আসিয়াছিল।)

(মনোরমা ও শিবনাথ তাহাদের বিবাহ স্থির করিবার ব্যাপারে আশুবাবুর মতামত নেয় নাই। বরং আশুবাবুর মত তাহারা অগ্রাহ্যই করিয়াছিল। আর আশুবাবু কন্যাবৎসল হওয়া সত্ত্বেও এ বিবাহে আশীর্বাদ করিতে পারেন নাই বরং বাধা দিবেন বলিয়াই সংকল্প

করিয়াছিলেন। এ কার্যে সহায়তার জন্য তিনি কমলকে ডাকিয়াছিলেন। বিশ্বাস ছিল তাহার নিজের জন্য না হউক, অন্ততঃ শিবনাথের জন্য কমল তাহাকে সাহায্য করিবে। কিন্তু আমরা দেখি,—বৃদ্ধের কথা শুনিয়া কমল বেশ দৃঢ় স্বরেই তাহাকে জানাইয়াছিল, এ বিষয়ে কোন সাহায্যই তাহার দ্বারা হইবে না। কথা শুনিয়া আশুবাবু বিস্মিত হইয়াছিলেন। কোন মতেই কমলের নিকট তিনি ইহা আশা করিতে পারেন নাই। আমরা দেখি, পীড়িতের ভাণ করিয়া শিবনাথ আশুবাবুর বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছিল। আশুবাবু কমলকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন,"তোমার জিনিষ তুমি ঘরে নিয়ে যাও; চিকিৎসার খরচের জন্য ভয় কোর না, সে ভার আমি নিলাম।" আশুবাবু বুঝিয়াছিলেন, শিবনাথ স্বামী, কমল স্ত্রী, নিজেদের ঘরকন্যার বোঝাপড়ায় ব্যাঘাত যদি মুহূর্তের জন্য ইহাদের হইয়াই থাকে, ক্ষণিকের জন্য ভুল যদি একজন করিয়াই থাকে, তবুও সম্বন্ধ তাহাদের মুছিয়া ফেলিবার নয়। এইজন্যই তিনি এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, দুঃখের দিনে কমল যাহাতে অন্তরের সেবা দিয়া শিবনাথকে ফিরিয়া আনিতে পারে। কিন্তু আমরা জানি, আশুবাবু ভুল বুঝিয়াছিলেন। কমলের বিপ্লবী অন্তর স্বামী-স্ত্রীর ধরাবাঁধা চিরন্তন গণ্ডীর মধ্য দিয়া চলে না। তাই পরিষ্কার ভাবেই বৃদ্ধকে সে জানাইয়াছিল, "ফিরে পেতে ওঁকে আমি চাইনে। সেবা করেও নয়, সেবা না করেও নয়, সম্বন্ধ আমাদের ছিঁড়ে গেছে, তাকে জোড়া দিতে আমি পারব না।")

(কথা শুনিয়া আশুবাবু স্তব্ধ হইয়াছিলেন, কারণ তাহার দীর্ঘজীবনে এরূপ পরিস্থিতিতে এ যুক্তি তিনি কোন নারীর মুখেই শুনেন নাই। কিন্তু কমল তাহার কথা অক্ষরে অক্ষরেই পালন করিয়াছিল। ইহা তাহার অভিমানের জ্বালা নয়, মিথ্যা দর্পও সে করে নাই। শিবনাথ শিবাণীর ভালবাসা একদিন কি মধুরভাবেই না বৃদ্ধের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু শিবাণীর সেই অকৃত্রিম ভালবাসাকে শিবনাথ যখন সত্য সত্যই অস্বীকার করিল, কমল ঘাড় ধরিয়া আর একবার তাহাকে দিয়া ভালবাসার খত লিখাইয়া লইতে চাহিল না।) আশুবাবু, হরেন্দ্র,

অজিত ইহাদের সকলেরই রায় কমলের অনুকূলে, শিবনাথকে তাহারা আবার জোর করিয়াই কমলের সঙ্গে বাঁধিয়া দিতে চাহিতেছে। কিন্তু কমল কোনমতেই এ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই। কমল ইহার মধ্যে দেখিতেছিল তাহার হৃদয়ের দৈন্য এবং নারীত্বের অপমান। (যে ভালবাসাকে আশ্রয় করিয়া দুইটি নরনারীর হৃদয় পরস্পরের মিলনের মধ্য দিয়া চলিতেছিল, তাহাই যদি ফুরাইয়া গিয়া থাকে, তবে লতার মতো শুষ্ক বৃক্ষকে সে আঁকড়াইয়া থাকিবে কেন? কোন সার্থকতা আছে তাহার ইহাতে? হৃদয় যদি শুকাইয়া গিয়া থাকে, তবে বাহিরের খোলসটাকে আশ্রয় করিয়া তাহার ফল কি? এইখানেই আধুনিকা বেলাদের সঙ্গে কমলের পার্থক্য।)

আশুবাবুকে সে কহিয়াছিল "সত্য যখন যথার্থই ডুবিয়া গেল তখন অনুষ্ঠানের দড়ি দিয়া তাহাকে বাধিয়া রাখিয়া লাভ কি? ইহা ভিন্ন প্রতিকারের যে উপায় আশুবাবু স্থির করিয়াছিলেন, কমলের সমর্থন তাহাতেও ছিল না। বৃদ্ধকে সে মনোরমা সম্বন্ধে জানাইয়াছিল— উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করার ভয় দেখালে সে ভয় পাবে কিনা জানিনে, যদি পায় তখন এই কথাই বলব যে, খাইয়ে পরিয়ে, ইস্কুল কলেজে বই মুখস্থ করিয়ে মেয়েকে বড়ই করেছেন কিন্তু মানুষ করতে পারেননি। কমল বুঝিয়াছিল, এই মনোরমা শিবনাথের ভালবাসাও শিবাণী শিবনাথের ভালবাসার মত একদিন ভাঙ্গিবেই। মনোরমা ইহার জন্য একদিন দুঃখ হয়ত পাইবে, তবুও ইহাতে লজ্জা পাইবার কি আছে? এ ভালবাসা তাহাদের চিরস্থায়ী না হইতে পারে কিন্তু তাহার জন্য ইহার মূল্য কমিবে কেন?) কমল জানিত মনোরমা তাহার হৃদয়কেই অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল, যে পথে সে পা দিয়াছে, বুদ্ধির যাচাই, হিতাহিত বোধ, ভালমন্দ সুখদুঃখের হিসাব সেখানে পৌঁছিতে পারে না। আশুবাবুকে কমল ইহাই বলিয়াছিল —"কিন্তু মনি তো মঙ্গলের হিসাব করতে বসেনি, সে চেয়েছে ভালবাসা। একটার হিসাব গুরুজনের সুযুক্তি দিয়ে মেলে কিন্তু অন্যটার হিসাব হৃদয়ের দেবতা ছাড়া আর কেউ জানেনা"। কমল বুঝিয়াছিল, অনভিজ্ঞ যৌবনের

ক্ষ্যাপামি হিসেব নিকেশের ধার ধারে না, কমলের নিকট ইহা স্বপ্নেরই মূলধন, তাই যাচাই বাছাই করা জিনিষের সঙ্গে ইহা মিলিবে না। আগ্রার সমাজের নিকট কমলের এ উক্তি ভোগেরই উক্তি, যুক্তি-তর্কে ইহাকে চূর্ণ করিতে তাহারা সর্বদাই তৎপর। তাহারা জানে ইহাই কমলের মত, আর জানে বলিয়াই কমলের বিরুদ্ধে তাহাদের যত অভিযোগ, তাহাকে উপেক্ষা করিতে গিয়াও ব্যর্থ হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসে। আমরা জানি নরনারীর পরস্পর মিলনে একমাত্র এই ভালবাসাকেই বিশ্বাস করে। এ ভালবাসা ক্ষণিকের হইলেও তাহার কাছে অমূল্য। অন্যে ইহাকে মোহ বলে বলুক, ভুল ব'লে ক্ষতি নাই তবুও হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলনের নিমেষ কয়টি ত মিথ্যা নয়। এই জন্যই আশুবাবুকে সে কহিয়াছিল—কেবল ভুলই ভাঙ্গে না, ভালবাসাও ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। আর অধিকাংশ ভালবাসার বিবাহও এই জন্যই তাহার মতে ক্ষণস্থায়ী।

কমলের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র কহিয়াছিলেন, "সে যেন বর্ষার বন্যলতা। পরের প্রয়োজনে নয়, আপন প্রয়োজনেই আত্মরক্ষার সকল সঞ্চয় লইয়া যেন মাটি ফুঁড়িয়া উর্ধ্বে মাথা তুলিয়াছে। পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধতার ভয় নাই—যেন কাঁটার বেড়া দিয়া বাঁচানোর প্রশ্নই বাহুল্য।" আমরা জানি ইহাই কমলের সত্য পরিচয়। তাহার ভাবনায় অপরের কোন স্থান নাই। জীবনে সমস্ত প্রয়োজন তাহার নিজের জন্যই। সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে তাহার আপনার প্রয়োজনের কোন মিল নাই, এই জন্যেই মানুষের কর্তব্যবুদ্ধির মধ্যে সে আনন্দের ছলনাই দেখে, তাহাকে দুঃখেরই নামান্তর মনে করে।) আনন্দের সুধাপাত্র তাহার অপব্যয়ের অন্যায়েই পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এজন্য তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষোভও নাই, (আর ইহা প্রকাশ করিতে তাহার কিছুমাত্র লজ্জাও আমরা দেখিনা।)

(আমরা দেখি এই বিপ্লবী মন লইয়াই কমল আগ্রার সমাজে ঘুরিয়া বেড়ায়।) সর্বত্র অব্যাহত এবং অবাধ তাহার গতি। আশুবাবু, অবিনাশবাবু, অজিত, হরেন্দ্র, অক্ষয়—ইহাদের সকলের মতামতকেই

সে স্পর্ধাভরে উপেক্ষা করিয়া চলে। (শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, তাহার ধারণা ছিল সে অতি শিক্ষিতা, অতি সুন্দরী এবং প্রখর বুদ্ধিশালিনী। সে পুরুষের কামনার ধন, দৃপ্ত তেজ তাহার অপরাজেয়। ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস। সংসারের নরনারী কেহ হয়ত তাহাকে ভালবাসে, কেহ ভয় করে এবং কেহ বা ঘৃণা করে কিন্তু কেহই তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না, ইহাই কমল জানিত।

কিন্তু আমরা জানি, কমলের এই দাম্ভিক অহঙ্কারী মন আগ্রায় সমাজেও সর্বত্র তাহার অপরাজেয় গতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই। বিপ্লবপন্থী রাজেনের সঙ্গে কমল অক্ষয় বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে গিয়াছিল। কিন্তু রাজেন তাহার এই অক্ষয় বন্ধুত্বকে শুধু অপ্রয়োজনীয় মনে করিল না, বন্ধুত্ব জিনিসটা সংসারে সুলভ কিংবা দুর্লভ, আর কমলের বন্ধুত্ব ইহা অপেক্ষাও দুর্লভ কিনা রাজেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতেই পারিল না।) অপমানের বোঝা মাথায় লইয়া কমল সেদিন সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। (আগ্রার সমাজে কমল এই প্রথম দিন আঘাত পাইল। শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, "আজ এই লোকটির কাছে সে যেন তুচ্ছতায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। শিবনাথ তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, কিন্তু এমন দীনতার চীরবস্ত্র তাহার অঙ্গে জড়াইয়া দেয় নাই।) কমলের অপরূপ সৌন্দর্য এবং অসামান্য বুদ্ধি যা শুধু রাজেনের নিকট উপেক্ষিত তাহা নয়, তাহার মতামতেরও কোন মূল্য এই লোকটির নিকট নাই। রাজেনকে কমল বুঝাইতে চাহিয়াছিল, মত ও কাজ দুইই বাইরের জিনিস; মনটাই একমাত্র সত্য। কিন্তু রাজেন তাহাকে কহিয়াছিল,—"মনের মিলনটাকে আমি তুচ্ছ করিনে, কিন্তু ওকেই অদ্বিতীয় বলে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করাও হয়েছে আজকালকার একটা উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। এতে ঔদার্য ও মহত্ত্ব দুইই প্রকাশ পায় কিন্তু সত্য প্রকাশ পায় না।" এই রাজেনের নিকটই কমল প্রথম দিন শুনিল, সর্বপ্রকার মতকে শ্রদ্ধা করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নয়। যার নিজের কোন মত নাই সে-ই শুধু ইহা পারে। রাজেনের নিকট কমল প্রথম দিন জানিল, সংসারে এমন লোকও আছে

যাহারা কমলের নীতিকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করে না। মিথ্যাকে ব্যর্থ শ্রদ্ধা না দিয়া আঘাতেই খোলস তাহার তাহারা ভাঙ্গিয়া দেয়। মতের ঐক্য এবং কাজের ঐক্যই জীবনে ইহাদের নিকট বড়। মনের মিলের ভাব-বিলাসের কোন মূল্যই ইহাদের নিকট নাই।

আমরা জানি, এতখানি শক্তি কমল আগ্রার সমাজে অন্য কাহারও মধ্যে পায় নাই। রাজেনের প্রতি কমলের সমস্ত আকর্ষণের মূলেও ছিল ইহাই। নারীর রূপ যৌবনের প্রতি এমন নীরব উদাসীনতা সে অন্য কাহারও মধ্যে দেখে নাই। কমলের এই আকর্ষণের মধ্যে ভালবাসা কতটা ছিল আমরা জানি না কিন্তু কমল সেদিকেই যেন আঘাত করিতেছিল। তাই আঘাত তাহার যতই ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, আকাঙ্ক্ষা তাহার ততই দুর্নিবার বেগে সেই দিকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছিল।) একাধিবার কমল নিজেই একথা স্বীকার করিয়াছে। শিবনাথ কমলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"তোমরা দুজন কি এখন এক বাড়ীতে থাক?" কমল উত্তর করিয়াছিল,—"সেই চেষ্টাই তো করছি। যদি থাকেন, আমার ভাগ্য।" আমরা বুঝি, রাজেনকে কমল ভালবাসিতেই গিয়াছিল। হরেন্দ্রকে কমল কহিয়াছিল,—"রাজেনকে যে ভুলতে পারিনে এ সবচেয়ে বেশী টের পাই আপনি এলে। আশ্রমে তার স্থান হল্ না, কিন্তু গাছতলায় থাকলেও তার চলে যেত, শুধু আমিই থাকতে দিইনি, আদর করে ডেকে এনেছিলাম। ঘরে এলো, কিন্তু মন কোথাও বাধা পেল না। হাওয়া আলোর মতোই সব দিক খালি পড়ে রইল, পুরুষের যেন একটা নূতন পরিচয় পেলাম।" শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগত ভাবে অনেক বিপ্লবীরই সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন, রাজেনের মধ্য দিয়া তিনি তাহাদের চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। (শুধু নারীর রূপ যৌবন কেন, সংসারে কোন কিছুর প্রতিই ইহাদের আকর্ষণ ছিল না। আদর্শগত প্রাণ, যেন আদর্শের মধ্যেই বাঁচিয়াছিল।)

নীলিমা কমলকে শ্রদ্ধা করিত। নারীর অন্তরের এই দুর্নিবার শক্তির নিকট মাথা আপনিই নত হইয়া আসিত কিন্তু তবুও কমলকে

সেও নির্বিরোধ ভাবে মানিয়া লইতে পারে নাই। মনোরমা শিবনাথকে বিবাহ করিবে স্থির করিয়াছিল। কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশুবাবুর দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। মনোরমার পিতৃদ্রোহিতার মধ্যে তিনি কন্যার আশু অমঙ্গলই দেখিতেছিলেন। কিন্তু কমলের যুক্তি-তর্ক বৃদ্ধের মনকে অন্য দিকে ঠেলিতেছিল, ইহাই আমরা দেখি। আশুবাবুকে কমল বলিয়াছিল,—মণি বিদ্রোহ করিতে পারে কিন্তু পিতার অভিশাপের মধ্যে তো সন্তানের মুক্তি থাকে না থাকে তার অকুণ্ঠ আশীর্বাদের মধ্যে। কন্যাবৎসল বৃদ্ধের হৃদয় এই যুক্তির মধ্যেই যেন আশ্রয় লইতে চাহিতেছিল তখন উত্তর করিয়াছিল নীলিমা—"সত্যি কি শুধু কমলের চিন্তাতেই আছে আর পিতার শুভবুদ্ধিতে নেই?" নীলিমার নিকট কমল শুনিয়াছিল সূর্যের আলোটাই তার সবখানি নয়, তার চলে যাওয়াটাও এমনই বড়। নীলিমা কমলকে শিখাইয়াছিল,—রূপ যৌবনের আকর্ষণই কেবলমাত্র ভালবাসা নয় আর এই জন্যই কন্যার জন্য পিতার যত দুশ্চিন্তা। কমলকে সে কহিয়াছিল,—"আমি বই পড়িনি, জ্ঞান-বুদ্ধি কম, তর্ক করে তোমাকে বোঝাতে পারবো না কিন্তু মনে হয় আসল জিনিসটির সন্ধান তুমি আজও পাওনি ভাই। শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, বিশ্বাস কাড়াকাড়ি করে এদের পাওয়া যায় না, অনেক দুঃখে অনেক বিলম্বে এরা দেখা দেয় তখন রূপ যৌবনের প্রশ্নটা কোথায় মুখ লুকিয়ে থাকে, কমল,—খোঁজ পাওয়াই দায়।" শরৎচন্দ্র আমাদের জানাইয়াছেন, কমল সেদিন ইচ্ছা করিয়াই নীলিমার এই উক্তির কোন উত্তর দেয় নাই। কিন্তু আমরা জানি এই সহজ সরল উক্তির কোন উত্তর কমলের যুক্তিতর্কের ঝুলিতে ছিল কিনা সন্দেহ।

আগ্রার সমাজে কমলের একটি মাত্র স্থান ছিল, একটিমাত্র আশ্রয় ছিল—সে আশুবাবুর গৃহ। আশুবাবু জানিতেন, আগ্রায় কমলের সঙ্গী সাথী নাই। কেহ তাহাকে চাহে না, কাহারও বাড়ীতেই তাহার যাইবার অধিকার নাই। তাই তিনি নিজ বাড়ীতে তাহার স্বচ্ছন্দ অধিকার দিয়াছিলেন। এইজন্য অজিত একদিন আশুবাবুকে কহিয়াছিল,

আশ্চর্য এই যে আপনার মতের সঙ্গেই তার সবচেয়ে বিরোধ অথচ আপনারই স্নেহ পেয়েছেন তিনি সবচেয়ে বেশী। আমরা জানি, আশুবাবুর জীবনটাই ছিল কমলের মতামতের প্রতিবাদ, যেখানে আপোষ রফার বিন্দুমাত্র স্থান ছিল না কোথাও। বোধহয় এইজন্যই কমলকে সস্নেহ আশীর্বাদ তিনিই করিতে পারিয়া ছিলেন। এই কথাই তিনি একদিন হরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"আর একজন কেউ ওর জীবনকে ফাঁকি দিবে তাতে ও কোন মতেই সম্মত নয়। সত্যিই তো, জীবনটা সত্যিই তো আর ছেলেখেলা নয়। ভগবানের এতবড় দান তো আর সেজন্য আসেনি। আর একজন কেউ আর একজনের জীবন বিফল হল বলে সেই শূন্যতারই চিরজীবন জয় ঘোষণা করতে হবে, এমন কথাই বা তাকে বলব কি কোরে?" কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা দেখি—কমলকে আশুবাবু ঘৃণা করেন নাই, অথবা বাধা দেন নাই সত্য কিন্তু কমলের চলার পথে তিনি তাহাকে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ করিতেও পারেন নাই।

বৃদ্ধের স্নেহময় অন্তরের কথা কমলেরও অজানা ছিল না। তাই আপনার একান্ত অভাবের মধ্যেও সে আশুবাবুর নিকটই হাত পাতিতে পারিয়াছিল। দৈন্যের মধ্যে মণি চাহিয়াছিল তাহাকে অর্থ সাহায্য করিতে কিন্তু কমল তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল কিন্তু আশুবাবুর নিকট দৈন্য প্রকাশ করিতে কোন লজ্জাই তাহার হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বৃদ্ধের মতের প্রতি তাহার কোন সহানুভূতি ছিলনা। আমরা জানি মৃত স্ত্রীর পবিত্র স্মৃতিকে এই বৃদ্ধ হৃদয়ের এক কোণে অতি সংগোপনে দীর্ঘকাল পোষণ করিয়া আসিতেছেন। এই একান্ত নিষ্ঠার প্রতি চারিদিক হইতেই সশ্রদ্ধ অভিবাদনরাশি বর্ষিত হইত। বৃদ্ধের নিজেরও এজন্য গর্ব কম ছিলনা। কোনদিক হইতে কখনও বিরুদ্ধ মতামত ব্যক্ত হইতে পারে ইহার কল্পনাও তাহার মনে উদয় হয় নাই। তাই প্রথম যেদিন কমলের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত আঘাত আসিল, বৃদ্ধ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। তাহার এতদিনের অসীম ত্যাগ স্বীকারকে কমল বার্ধক্যের জড়তার লক্ষণ বলিয়াই উড়াইয়া দিতে

চাহিল বৃদ্ধ ব্যথিত হইলেন।) আশুবাবুকে কমল কহিয়াছিল—"আপনার নিজের জীবনের যে আদর্শ, যে ত্যাগ লোকের মনে আজ বিস্ময়ের কারণ হয়ে আছে, একদিন সে হয়ত অনুকম্পার কারণ হবে। এই নিষ্ফল আত্মনিগ্রহের বাড়াবাড়িকে লোকে হয়ত উপহাস করে চলে যাবে।" শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন—এই নির্মমতায় পলকের জন্য আশুবাবুর মুখ বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল। (কমলের বাক্যের উগ্রতায় অবিনাশবাবু, অজিত, অক্ষয়ের দল সেদিন তাহাকে হীন প্রত্যাঘাত করিয়াই চলিয়া গিয়াছিল। তখন একমাত্র—আশুবাবুই তাহাকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন "কমল আমাকে তুমি সবচেয়ে বেশী আঘাত করেছ কিন্তু আমিই তোমাকে আজ যেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি। আমার মনের চেয়ে যেন তুমি কোন অংশেই খাটো নও মা। উত্তরে কমল কহিয়াছিল, "তার কারণ আপনি যে সত্যিকার বড় মানুষ। কাকাবাবু আপনি তো এদের মত মিথ্যে নয়।" আশুবাবু এবং কমল দুজনেরই সম্বন্ধে ইহাই পরিচয়। এই পরস্পর প্রতিবাদ যেন হাত বাড়াইয়া দূর হইতে একে অপরকে অভিবাদন জানাইতেছে। আবার কাছে আসিয়া হৃদয়ের অপার স্নেহরাশি পরস্পরের জন্য ঢালিয়া দিতেছে। (আমরা দেখি আশুবাবু ও কমল দুই পরস্পর বিপরীত ধর্ম। আশুবাবু শান্ত, কমল উগ্র, আশুবাবু ধর্মশীল, আর ক্ষমা কাহাকে বলে কমল জানেনা। কমল আশুবাবুকে আঘাত করে, কিন্তু স্নেহশীল ক্ষমাশীল হৃদয় নীরবেই সে আঘাত সহ্য করে। আমরা দেখি বিদ্রোহধর্মী কমল আশুবাবুর প্রিয় কারণ একমাত্র এই বৃদ্ধই বুঝিতে পারেন কমলের দেওয়া এই আঘাতের মধ্যে ঈর্ষা নাই, দ্বেষ নাই, ইহা তাহার বিদ্রোহী মনেরই ধর্ম।)

শিবনাথকে কমল ভালবাসিয়াই বিবাহ করিয়াছিল। শৈব বিবাহকে সেদিন সে ফাঁকির চোখে দেখিতে পারে নাই। তাই অপরের সন্দেহ তাহার মনকে বিন্দুমাত্র দোলা দিতে পারে নাই। যাহাকে স্বামী বলিয়া বরণ করিয়াছে তাহাকে বাইরে গ্রন্থির পাক দিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে নাই। তাহার নিজের কথায়, মুক্তির আগল

সে আলগাই রাখিয়াছিল। রাজেনকে সে একদিন বলিয়াছিল "মনই যদি দেউলে হয়, পুরুতের মন্ত্রকে মহাজন খাড়া করে সুদটা আদায় হ'তে পারে, কিন্তু আসল তো ডুবলো।" কমল জানিত, মন একদিন সত্যই দেউলিয়া হইতে পারে কিন্তু তবুও শিবের সঙ্গে শৈব-বিবাহকে সে একান্ত মনেই গ্রহণ করিয়াছিল। অবিনাশবাবু সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তাহাকে জানাইয়াছিলেন শিবনাথ হয়ত একদিন তাহার এই শৈব-বিবাহকে হাসির ব্যাপার করিয়াই উড়াইয়া দিবে, কিন্তু কমল সেজন্য বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন হয় নাই। শিবনাথকেই সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হাঁগা করবে নাকি তুমি এই রকম কোনদিন?" নারী হৃদয়ের কি সরল, সহজ নির্ভরতাই ইহা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে! কিন্তু তবুও মনের কোণে তাহার কোন উদ্বেগের ছায়া পড়ে নাই। কারণ এ মিলন চিরস্থায়ী নাও হইতে পারে। ইহা সে জানিত। কিন্তু তবুও বিশ্বাস তাহার ছিল, সত্য কোনদিন ডুবিবে না; তাই অনুষ্ঠানের দড়ি দিয়া তাহাকে বাঁধিবার জন্য সে ব্যস্ত হয় নাই। কমলের এই কথা সেদিন কেহ বিশ্বাস করে নাই। ইহাকে অহঙ্কারী মনের অসম্ভব দাম্ভিক উক্তিই সকলে সেদিন মনে করিয়াছিল! কিন্তু আশ্চর্য হইল তাহারা, সত্য যখন যথার্থই ডুবিয়া গেল। শৈব-বিবাহকে সত্য সত্যই শিবনাথ একদিন কিছু না বলিয়াই উড়াইয়া দিল। তারপরে মনোরমার সঙ্গে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে যখন পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল, আশুবাবু, হরেন্দ্র প্রমুখ কমলের হিতাকাঙ্ক্ষীদল সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল, শিবনাথকে তাহার অনাচারের জন্য যথোচিত শাস্তি দিয়া কমলকে আবার তাহারই সঙ্গে জুড়িয়া দিবে। ইহারই মধ্যে দেখিয়াছিল তাহারা শিবনাথের এই অন্যায়ের প্রতিকার। কিন্তু কমল বলিয়াছিল, এই পথে শিবনাথের অন্যায়ের শাস্তি হয়ত হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে তাহার নিজের মুক্তি নাই। বরং ইহার মধ্যে আছে নারীত্বের চরম অপমান, তাহার নিজের হৃদয়ের পতন! তাই সে আগ্রা সমাজের এই ব্যবস্থাকে কোন মতেই মানিয়া লইতে পারে নাই। (আশুবাবুকে একদিন সে ইহা সুস্পষ্ট

ভাবেই কহিয়াছিল,—"সম্বন্ধ আমাদের ছিঁড়ে গেছে, তাকে জোড়া দিতে আমি পারবো না।" হীরেন্দ্রকে সে কহিয়াছিল, আশুবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বলবেন, আমার ভালো করবার বাসনায় আর যেন আমার ক্ষতি না করেন। কারণ সে বুঝিয়াছিল, জোর জবরদস্তিতে বাহিরের দিক দিয়া শিবনাথ শিবানীর সম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে হয়ত পারে, কিন্তু এই পথে তাহাদের হৃদয়ের পরিপূর্ণতা কিছুতেই আসিবে না। শিব শিবানী হৃদয়ে যেদিন পারস্পরিক মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, সেদিনই গড়িয়া উঠিয়াছিল এ মিলন। কিন্তু হৃদয় যখন ভাঙিয়া পড়িল, প্রাণ যখন শুকাইয়া গেল, কি হইবে বাহিরের এক প্রাণহীন কাঠামোকে সাজাইয়া রাখিয়া? আমরা জানি, শিবনাথকে কমল ঠিকই বুঝিয়াছিল—কোন মেয়েকেই ইহারা ভালবাসিতে পারেনা। ইহারা শুধু নিজেকেই ভালবাসে। এইজন্যে শিবনাথের ব্যবহারের জন্য কমলের কোন অভিযোগ ছিলনা, কোন ক্ষোভ ছিলনা। কিন্তু যতটুকু সে পাইয়াছে, তাহাতেই সে ধন্য মনে করিয়াছে। সেদিন যে তাদের মধ্যে ফাঁকি ছিলনা, এ বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ ছিলনা। এই জন্য অস্থায়ী মিলনকে সে ব্যর্থ মনে করে নাই।

আমরা দেখি, শৈব-বিবাহের শিবানীর মোহ শিবনাথের যখন কাটিয়া গেল, ভবিষ্যতে মনোরমার সঙ্গে তাহার জীবনকে মিলাইয়া দিবে—ইহাই সে স্থির করিয়া ফেলিল। কমলও এক মুহূর্তেই পুরাতনকে যেন ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। বাস্তবতার সংসারে ইহা কতটা সত্য আমরা জানিনা। মনে হয়, ইহার মধ্যে শরৎচন্দ্রের মানসিক কল্পনার অবসর অনেকখানিই ছিল। শরৎচন্দ্র হয়ত সংঘাত-হীন এক আদর্শ সমাজেরই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তাহা না হইলে প্রেমের ব্যাপারে হৃদয়ের প্রসারণ সঙ্কোচন যদি এতই সহজ হয়, তবে সংসারের অনর্থ সৃষ্টি হয় কেন? যাহা হউক, এই প্রচেষ্টা কমলের মনের সজীবতারই পরিচায়ক। কমলের প্রেমের আকাশ হইতে শিবনাথরূপ ভাস্কর যেদিন অস্তমিত

হইল, কমলও সে আকাশ শূন্য রাখিল না। প্রথমেই তাহার দৃষ্টি পড়িল রাজেনের দিকে। এদিক দিয়া শরৎচন্দ্রের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট নয়, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু রাজেনকে কমল শুধু যে পথ হইতে ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহাই সত্য নয়। রাজেনকে সে চিরসাথী করিবে, এই আভাসও আমরা ইহার মধ্যে অন্তর্নিহিত দেখি। রাজেন যদি উদাসীন ভাবে কমলের বন্ধুত্বকে উপেক্ষা না করিত, এবং তাহার দেওয়া 'তুমি' ডাকার অধিকারকে আগ্রহ সহকার গ্রহণ করিতে পারিত, তবে অজিতের ভাগ্য হয়ত এত শীঘ্র সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিত না। কমলের মত এবং মনকে আমরা জানি। শিবনাথের শূন্য আসনে কাহাকেও তাহার একান্ত ভাবেই চাই। তাই রাজেন না হইলে অজিতেই সে আসন পূর্ণ করে। কমলের জীবনের এই গতি তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার ইতিহাস নয়, ইহা তাহার সংযত হৃদয়েরই পরিচয়। কমল তাহার রূপ যৌবন দিয়া রাজেনকে বা অজিতকে প্রলুব্ধ বা মুগ্ধ করে নাই। বরং যেখানে তাহার সবচেয়ে বেশী কালিমা, সবচেয়ে বেশী মলিনতা, সেই জন্মের ইতিহাসটুকু ব্যক্ত করিতে তাহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা আমরা দেখি না। অজিতের নিকট অনায়াসেই সে প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার মায়ের রূপ ছিল কিন্তু রুচি ছিল না। এই রুচি না থাকার অর্থ কি তাহাও কমল সেদিন প্রকাশ করিয়াই বহিয়াছিল। কমল জানিত ইহা দ্বারা অজিতের নিকট তাহার আপনার আসন কোথায় নামিয়া আসিবে। তবুও সে কিছুই গোপন করে নাই। সে যাহা নয় তাহার মুখোস পরিধান করিয়া অজিতের নিকট উপস্থিত হয় নাই। মুহূর্তপূর্বে এই অজিতই তাহাকে দেবীর আসনে বসাইয়াছিল, উচ্ছ্বসিত আবেগে অনেককেই তাহার পাদস্পর্শের অযোগ্য মনে করিয়াছিল। তবুও কমল সেদিন সত্যকেই অকুণ্ঠ মর্যাদা দিয়াছিল। অজিত সেদিন আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—বিপুল আড়ম্বরে আপনার কলঙ্ক কালিমাকে বিশ্বের সকলের সম্মুখে ধরিবার তাহার প্রয়োজন ছিল কি? ইহা গোপন করিলে তাহার ক্ষতি কি ছিল? কিন্তু প্রয়োজন যে কি ছিল তাহা হয়ত নিজেই একদিন বুঝিতে পারিয়াছিল জীবনযাত্রা

যেদিন কমলের সঙ্গে একত্র একপথে পরিচালিত হইল। আমরা জানি আপনার অব্যক্ত জীবন ইতিহাসের অত্যন্ত গোপনীয়, এবং কালিমা-লিপ্ত পাতা কয়টিই কমল সেদিন অজিতের নিকট খুলিয়া ধরে নাই, তাহার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থও সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এই জন্যই। কারণ কমল বুঝিয়াছিল,—যে অধিকারবোধ নরনারীর পরস্পর মিলনে অকুণ্ঠ চিত্তে অর্থ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাদের মধ্যে সে অধিকারবোধ তখনও জন্মে নাই।) অজিতের সহানুভূতি সে পাইয়াছে, ফলে-ফুলে সঞ্জীবিত হইয়া একদিন তাহা প্রেমের আসন গ্রহণ করিতে পারে, তাই অসময়ে দান গ্রহণ করিয়া তাহাকে টুঁটি চাপিয়া মারে নাই। কমল নিজেই একদিন অজিতকে বলিয়াছিল—"না, দান আমি কারও নিই নে, এমন কি আপনারও না। কিন্তু দান করা ছাড়া দেবার কি সংসারে আর কোন পথ খোলা নেই? কেন এসে জোর করে বললেন না, "না, কমল, একাজ আমি তোমাকে করতে দেব না? আমি কি তার জবাব দিতাম?" (লালাদের অভিনয়ের ব্যাপারের মধ্য দিয়াই কমল বুঝিয়াছিল, অজিতের অন্তরে কেবলমাত্র তাহার দৈন্যে সহানুভূতিই নাই, সেখানে তাহার জন্য সম্ভ্রমবোধ আছে, মর্যাদার আসন আছে।) তাই প্রকাশ্য ভাবে অজিত তাহাকে সাহায্য করিতে পারে নাই। অথচ হৃদয় তাহার কি করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে? সেইজন্য অজিতের নিকটও কমল তাহার হৃদয়কে অমন অকপটে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিল। কমল ভুল বুঝে নাই। অজিত সেদিন যাহাকে সহানুভূতি দেখাইতে বা অর্থ সাহায্য করিতেই আসে নাই? সমস্ত মান সম্মান, ভালমন্দ, নিন্দা গ্লানি তুচ্ছ করিয়া সে কমলকে পরিপূর্ণ ভাবেই গ্রহণ করিতে আসিয়াছিল। সেই জন্যই সে প্রস্তুত হইতেছিল। আশুবাবুর বিদায় উপলক্ষে নিমন্ত্রণ সভায় আমরা ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। নিন্দার ভয়ে প্রথমে সে কমলের সঙ্গী হইতে পারে নাই কিন্তু কমলকে একা ছাড়িয়া দিয়াও সে নিশ্চিন্ত একাকী গৃহে বসিয়া থাকিতে পারে নাই। তাহার সমস্ত নিন্দার, সমস্ত গ্লানির অংশ নিতে বিলম্ব হইলেও তাহাকে ছুটিয়া যাইতে

হইয়াছিল তাহারই পাশে। সমবেত সকলের সম্মুখে তাহাদের মিলনের কথাটিও এইজন্যই সে অকুণ্ঠ ভাবেই প্রকাশ করিতে পারিয়াছিল।

অজিতের বিবাহের প্রস্তাব কমল অস্বীকার করিয়াছিল। নিরেট, নিশ্ছিদ্র করিয়া সে বাড়ী গাঁথিতে চাহে নাই। শিবনাথ তাহাকে ফাঁকি দিয়াছিল কিন্তু সেজন্য এখানেও ফাঁকির সমস্ত পথকে সে বন্ধ করিতে চাহে নাই। কমল চাহিয়াছিল, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন হৃদয়ের প্রয়োজনে। এই প্রয়োজন স্থায়ী হইলে ইহা তাহাকে চির আনন্দই দিবে আমরা জানি কিন্তু কোন কারণে প্রয়োজন মিটিয়া গেলেও ইহাকে সে আঁকড়াইয়া থাকিবে না। কমল চায় হৃদয় ভালবাসিবে হৃদয়কে, মিলন হইবে তাহারই প্রতীক। কিন্তু ভালবাসার নদী শুকাইয়া গেলেও সেই শুষ্ক চরায় কেহ ডুবিয়া মরে, ইহা সে চাহে নাই। তাই সে চাহিয়াছিল, হৃদয়ের এই মিলনে থাকিবে মুক্তির অবকাশ, থাকিবে নিশ্বাস ফেলিবার অবসর। সেইজন্যই স্থায়িত্বের লৌহনিগড়ে সে ইহাকে শক্ত বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিতে চাহে নাই। কমল বুঝিয়াছিল, এই শক্ত বাঁধনে ভালবাসায় প্রাণসঞ্চার হয় না, মিলনে ইহা আনন্দের বিঘ্ন। তাই সে অজিতকে কহিয়াছিল,—"ভগবান তো মানিনে, নইলে প্রার্থনা করতাম, দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আড়াল রেখে একদিন যেন মরতে পারি" উত্তরে আশুবাবু কহিয়াছিলেন,—"তোমার ভগবান মেনেও কাজ নেই, কমল। এই আত্মসমর্পণই একদিন তোমাকে তার কাছে সগৌরবে পৌঁছে দিবে।" কমল হাসিয়া কহিয়াছিল,—"সে হবে আমার উপরি পাওনা। ন্যায্য পাওনার চেয়ে তার মান বেশী।"

কমলকে আমরা দেখিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম, ইহা বলা যায় না। শরৎ-সাহিত্যের নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার সঙ্গে কমলের মিল নাই। অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, পার্বতী যে শ্রেণীর নারী, কমল তাহা হইতে স্বতন্ত্র। অন্নদাদিদি, সাবিত্রী, প্রভৃতিকে দেখিয়া মনে হয় ইহাদিগকে আমরা

পূর্ব হইতেই চিনি, জীবনে কতবার কতদিন ইহাদিগকে দেখিয়াছি। কিন্তু কমল আমাদের কাছে অচেনা—কল্পনার সৃষ্টি, বাকচাতুর্য দিয়া গড়া। শরৎ-সাহিত্যে যে সমস্ত নারীকে আমরা ইহার আগে দেখিয়াছি, ঘটনাপরম্পরা আসিয়া জীবনে তাহাদের সুখদুঃখের দৃশ্যপট সৃষ্টি করিতেছিল, তাহারই অন্তরালে হৃদয় তাহাদের বিকাশলাভ করিতেছিল। কিন্তু কমলের জীবনে ঘটনার অবকাশ নাই, কমলের সমগ্র জীবন যেন বাকচাতুর্যের খেলা। কথার সঙ্গে কথা বাঁধিয়া, অলঙ্কারের উপর অলঙ্কার সাজাইয়া প্রকাশভঙ্গী কত বড় কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারে, কমলের সমগ্র জীবন যেন তাহারই একটা প্রবল প্রতিযোগিতা।

রাজলক্ষ্মী

শৈশবে একদিন ফুলের বদলে বৈঁচিমালা দিয়াই যাহাকে বরণ করিয়াছিল. তারপরে নিরুদ্দেশ জীবনের অজানার মাঝখানে কোথায় তাহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, ছন্নছাড়া জীবনের বিপরীত আবর্তনে স্রোতে-ভাসা ফুলের মতো রাজলক্ষ্মী আবার তাহাকে কুড়াইয়া পাইল।

পাটনার কুমার সাহেবের বিলাস মন্দিরে সেদিন বসিয়াছিল পিয়ারী বাইজী। তাহার অন্তরের রাজলক্ষ্মী তখন মৃত। শ্রীকান্তের হঠাৎ আবির্ভাব সেই মৃত রাজলক্ষ্মীকেই ডাকিয়া আনিল। উদ্দাম লালসার মধ্যে, অপার ঐশ্বর্যের ভিতরে থাকিয়াও পিয়ারী সেদিন দীনহীনা রাজলক্ষ্মীকে বিদায় দিতে পারিল না বরং পরম আদরে বরণ করিয়া লইল।

পিয়ারী বাইজীর জীবনে সুরু হইল এক নূতন অধ্যায়। আমরা দেখি, পিয়ারী বাইজী নূতন করিয়া রাজলক্ষ্মী সাজিয়া বসিল, শ্রীকান্তের সমস্ত ভালমন্দ, সকল মঙ্গল অমঙ্গল সে নিজ হাতে তুলিয়া লইল। তারপরে সুরু হইল এক দেনাপাওনার ইতিহাস, সুরু হইল টানা-পোড়েনের হিসাব। শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মী-জীবনের এই অংশটুকুই আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন।

মনসাপণ্ডিতের পাঠশালায় রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় নাই। মনসাপণ্ডিতের পাঠশালায় সরস্বতীর আরাধনায় অথবা অন্য কোন সাধনায় রত কোন বালিকাকে আমরা দেখি না। সরদারপোড়ো শ্রীকান্তকে বৈঁচিমালা যোগানোও আমাদের স্মৃতির মধ্যে তেমন আলোড়ন উপস্থিত করে না। তারপরে স্বামী পরিত্যক্তা মাতার দুই কন্যা সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী যেদিন একই সঙ্গে বিরিঞ্চি দত্তের পাচক ভঙ্গকুলীনের সন্তানের নিকট মাত্র পঞ্চাশ টাকায় পাত্রস্থ হইল, সেদিনও আমাদের বিশেষ মনে পড়ে না। আবার

রাজলক্ষ্মী যেদিন কাশীতে মরিয়া শিবত্ব লাভ করিল, সেদিনের সংবাদও আমরা রাখিনা।

পাটনায় পিয়ারী বাইজীর জীবনে যখন হঠাৎ একদিন শ্রীকান্তর আবির্ভাব হইল, ভাঙ্গা মেঘের মধ্য দিয়া যখন চন্দ্ররশ্মি দেখা দিল, রাজলক্ষ্মী চাহিল সেই মুগ্ধ সৌন্দর্যের মধ্যে নিঃশেষে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে। যাহাকে একদিন সে হারাইয়াছিল, তাহাকেই আবার সে ফিরাইয়া পাইল, সর্বস্ব দিয়া এবারে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিল। কিন্তু বিরোধী হইল সমাজ। স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, সমাজ হইতে একদিন যে বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, ফিরিবার রাস্তা তাহার নিকট প্রায়ই উন্মুক্ত থাকে না। রাজলক্ষ্মী সমাজকে উপেক্ষা করিয়াছিল, তাই সমাজের নির্মম দণ্ড তাহাকে বিনাপ্রতিবাদেই সহ্য করিতে হইবে। রাজলক্ষ্মী স্বেচ্ছায় একদিন সমাজ ত্যাগ করিয়াছিল, তাই সমাজে প্রবেশের সমস্ত দ্বার তখন রুদ্ধ, কিন্তু প্রিয়তমকে সমাজ তাহার সম্মানের আসন, সার্থকতার আসন এবং মর্যাদার আসন হইতে নামাইয়া আনিবে, চারিদিকে দশজনের নিকট তাহাকে হেয় করিয়া দিবে, ইহাও সে সহ্য করিতে পারিল না। তাই মিলনের একান্ত কামনা সত্ত্বেও রাজলক্ষ্মী সেদিন শ্রীকান্তের সঙ্গে মিলিতে পারিল না।

রাজলক্ষ্মী অভয়া নয়, কিরণময়ীও নয়, তাই সে সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারিল না, সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারিল না। অভয়া এবং কিরণময়ী সমাজের মধ্যে থাকিয়াও যাহা পারিয়াছিল, সমাজের বাহিরে থাকিয়াও রাজলক্ষ্মীর দ্বারা তাহা সম্ভব হয় নাই। অভয়াকে সে দূর হইতে শতকোটি নমস্কার জানাইয়াছে, কিন্তু কখনও অভয়া হইবার প্রয়োজন তাহার হয় নাই। অভয়া সম্পর্কে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে লিখিয়াছিল,—"তিনি বয়সে আমার ছোট কি বড়, জানি না, জানার আবশ্যকতাও নাই। তিনি শুধুমাত্র তাহার তেজের দ্বারাই আমাদের মত সামান্য রমণীর প্রণম্য।" এই প্রসঙ্গে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে জানাইয়াছিল,—শ্রীকান্ত যদি তাহার কথা সম্পূর্ণ বুঝিতে

নাও পারে, তবুও এইটুকু যেন বোঝে যে যাহাদের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে আর যাহাদের মধ্যে ছাই জমা হয়ে আছে, তাহাদের কাজের ওজন যেন এক তুলাদণ্ডে না করে।

আমরা দেখি, বিদ্রোহী নারীর অকুণ্ঠ তেজের প্রতি অযাচিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়াই রাজলক্ষ্মী নীরবে সেখান হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অভয়ার মতো সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার কল্পনা একদিনের জন্যও সে করিতে পারে নাই। সে নিজেই সমাজ হইতে বাহিরে আসিয়া যে অপরাধ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল। তাই প্রেম তাহার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। রাজলক্ষ্মী বুঝিয়াছিল, সমাজ যতদিন থাকিবে শ্রীকান্তের সঙ্গে মিলন তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা জানি, মিলন তাহার পক্ষে যে কোন মুহূর্তে সম্ভব ছিল কিন্তু তাহাতে তাহার আরাধ্য দেবতা শ্রীকান্তের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিবেনা, ইহাও সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল। এজন্য সমাজের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ ছিল, ক্ষোভ ছিল কিন্তু সে ক্ষোভ বা অভিযোগ কখনও বিদ্রোহের আকার গ্রহণ করে নাই। ইহাই সে একদিন শ্রীকান্তকে কহিয়াছিল—"দেখ, আমি অবোধ নই, আমার পাপের গুরুদণ্ড আমাকে ভুগতে হবে জানি ; কিন্তু তবু বলছি, আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দয়। একেও একদিন এর শাস্তি পেতে হবে। ভগবান এর সাজা দেবেনই দেবেন।"

সমাজের দেওয়া অবিচার অত্যাচার অতি তীব্র হইয়াই সেদিন রাজলক্ষ্মীকে আঘাত করিয়াছিল। যাহাকে সে একান্তভাবেই ভালবাসে, হৃদয়ের তৃপ্তি, জীবনের সার্থকতা যাহার নিকট, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার কোন উপায় নাই। তাই বিদায়ের ক্ষণে রাজলক্ষ্মী আত্মসংযম রক্ষা করিতে পারে নাই। তীব্র অভিশাপের মধ্য দিয়াই তাহার বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজের নিকট রাজলক্ষ্মী আত্মসমর্পণই করিয়াছিল। ইহাতে সে তাহার কল্যাণের পথ দেখিয়াছিল। কারণ রাজলক্ষ্মী বুঝিয়াছিল, সমাজ অন্যায় অত্যাচার করে কিন্তু কল্যাণও যে না করে তাহা নয়।

নারী-পুরুষের সার্থকতার পথ রাজলক্ষ্মী সমাজের মধ্যেই দেখিতে পাইয়াছিল। শ্রীকান্তকে একদিন সে সমাজের এই রূপটিই দেখাইতে চাহিয়াছিল, "বাড়ীর গিন্নী সকলের চেয়ে কম, সকলের চেয়ে খারাপ খায়। অনেক সময়ে চাকরের চেয়েও। অনেক সময়ে চাকরের চেয়ে বেশী খাটতে হয়। কিন্তু তার দুঃখে আকুল হয়ে কেঁদে না বেড়িয়ে আমাদের বরঞ্চ অমনি দাসীর মতই থাকতে দাও। অন্য দেশের রাণী করে তোলবার চেষ্টা কোর না।"

শ্রীকান্তকে সে কহিয়াছিল, "তোমাদের মত লোকই সমাজের বেশী নিন্দে করে বেড়ায় যারা সমাজের কোন ধারই ধারে না। তোমরা না জানো ভালো করে পরের সমাজ, না জানো ভালো করে নিজেদের সমাজ।

আমরা দেখি, সমাজের বাহিরে থাকিয়াও রাজলক্ষ্মী সমাজকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। সে ছিল বংকুর মা, তাছাড়া অসংখ্য নর-নারীর মঙ্গলামঙ্গলের দায়িত্ব সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মাতৃত্বের আসনে আপনাকে বসাইয়া সে এই পথেই আপনার সার্থকতা খুঁজিতেছিল। জীবন মধ্যাহ্নে যদি হঠাৎ শ্রীকান্তের আবির্ভাব না হইত, জীবন হয়ত তাহার এমনিই সমাপ্ত হইত।

শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী মিলিতে পারে নাই, ইহার কারণ শ্রীকান্ত নিজেও রাজলক্ষ্মীকে জানিত, তাহাকেই ভালবাসিতে চাহিয়াছিল। আর জানিত এক সেবাপরায়ণা নারীকে, যে আপনার সমস্ত মঙ্গলা-মঙ্গল তুচ্ছ করিয়া শ্রীকান্তের সুখ দুঃখকে একান্তভাবেই আপনার করিয়া লইয়াছিল, শাসনে, সংযমে চতুর্দিক হইতে তাহাকে স্নেহের কঠোর বন্ধনে বাঁধিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকান্ত কোনদিনই তাহার ভালবাসার দুইটি রূপকে এক করিয়া দেখিতে পারে নাই। তাছাড়া রাজলক্ষ্মীর পিয়ারী জীবন ছিল তাহার নিকট ছিল অবোধ্য। রাজলক্ষ্মী কেমন করিয়া পিয়ারী হইল, বাইজী জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে শৈশবের বৈঁচিমালা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিল তারপরে কেমন করিয়া একদিন হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া একেবারে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, পিয়ারী

বাইজী কেমন করিয়া তাহার নিকট 'লক্ষ্মী' হইয়া উঠিল, শ্রীকান্ত ভাবিয়া পাইত না। শ্রীকান্ত যখনই তাহার 'লক্ষ্মীকে' আকর্ষণ করিতে চাহিত, অকস্মাৎ কোথা হইতে পিয়ারী বাইজী আসিয়া ক্রমাগতই তাহাকে দূরে ঠেলিতে থাকিত, সেও অন্তরালে গিয়া আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিত।

এই পরিবর্তনকে শ্রীকান্ত একেবারেই বুঝিতে পারে নাই তাহা নহে। এই অদ্ভুত মানুষটির ব্যক্ত অব্যক্ত জীবনের ধারা দুটি যেখানে একান্ত প্রতিকূলে বহিয়া চলিয়াছিল, শ্রীকান্তের দৃষ্টি সেইখানেই পড়িয়াছিল। ইহার উত্তরও সে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল। আমরা তাহাকে বলিতে শুনি—একদিন অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া ভাবিয়াছিলাম, শৈশবে রাজলক্ষ্মী যাহাকে ভালবাসিয়াছিল তাহাকেই পিয়ারী তাহার উন্মত্ত যৌবনের কোন অতৃপ্ত লালসার পঙ্ক হইতে এমন করিয়া অতি সহজে সহস্রদল বিকশিত পদ্মের মত নিমেষে বাহির করিয়া দিল। মনে হইল সে তো পিয়ারী নয়—সে রাজলক্ষ্মীই বটে। রাজলক্ষ্মী ও পিয়ারী এই দুটি নামের মধ্যে সে তাহার নারী জীবনের কতবড় ইঙ্গিত গোপন ছিল, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই বলিয়া মাঝে মাঝে সংশয়ে ভাবিয়াছিল একের মধ্যে আর একজন এতকাল কেমন করিয়া বাঁচিয়াছিল। কিন্তু মানুষ যে এমনিই! তাই সে মানুষ।

শ্রীকান্ত ঠিকই বুঝিয়াছিল ভাল-মন্দ লইয়াই মানুষ। কিন্তু তবুও সে পিয়ারী বাঈজীকে বাদ দিয়াই তাহার লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল এবং এইখানেই ভুল করিয়াছিল। শ্রীকান্ত বুঝিয়াছিল দেব ও দানবে অনুক্ষণ কাঁধ মিলাইয়া মানুষকে কোথায় কোন ঠিকানায় লইয়া চলিয়াছে, এই দেব এবং দানব লইয়াই মানুষের সম্পূর্ণতা, ইহার একজনকে বাদ দিয়া আর একজনকে লইতে গেলেই সম্পূর্ণকে হারাইতে হয়। কিন্তু এই জানা সত্ত্বেও শ্রীকান্ত পিয়ারী বাঈজীকে মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার লক্ষ্মী যেমন একদিকে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল, পিয়ারী তেমনই তাহাকে দূরে ঠেলিতেছিল। শ্রীকান্তের নিজের মুখেও আমরা এই কথাই শুনি—মানুষ ত কেবল তাহার দেহটাই নয়। পিয়ারী নাই, সে মরিয়াছে। কিন্তু একদিন

যদি সে তার ওই দেহটার গায়ে কিছু কালি দিয়াই থাকে ত সেইটুকুই কি কেবল বড় করিয়া দেখিব, আর যে-রাজলক্ষ্মী তাহার অপরিমিত দুঃখের অগ্নিপরীক্ষায় পার হইয়া আজ অকলঙ্ক শুভ্রতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তাহাকে মুখ ফিরাইয়া বিদায় দিব? মানুষের মধ্যে যে পশু আছে কেবল তাহারই অন্যায়, তাহারই ভুল ভ্রান্তি দিয়া মানুষের বিচার করিব, আর যে দেবতা সকল দুঃখ, সকল ব্যথা সকল অপমান, নিঃশব্দে বহন করিয়াও আজ সস্মিত মুখে তাহারই মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাহাকে বসিবার আসন কোথাও পাতিয়া দিবনা। সেই কি মানুষের সত্যকার বিচার হইবে? আমার মনে যেন সকল শক্তি দিয়া বলিতে লাগিল, না না এ কখনই না, এমন হইতেই পারে না।

শ্রীকান্ত বলিয়াছে, নিজেকে দুর্বল শ্রান্ত ও পরাজিত মনে করিয়া যেদিন রাজলক্ষ্মীর হাতে আপনাকে সে সমর্পণ করিয়াছিল সেই দিন তাহার মধ্যে দীনতা ছিল। কিন্তু আজ সে স্থির করিয়াছে, যে পিয়ারীকে সে জানিত না, সে তাহার জানার বাইরেই পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু যে রাজলক্ষ্মী একদিন তাহারই ছিল, তাহাকেই সে সকল চিত্ত দিয়া গ্রহণ করিবে। কিন্তু আমরা জানি শ্রীকান্তের পক্ষে এই দুইই ভুল। রাজলক্ষ্মীকে পিয়ারী জানিয়া পরাজিত মনোভাব লইয়া তাহার নিকট আত্মসমর্পণও যেমন ভুল, পিয়ারীকে বাদ দিয়া রাজলক্ষ্মীকে গ্রহণ করাও তেমনি ভুল, ইহা তাহার আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। যুক্তির পশ্চাতেই শ্রীকান্ত সেদিন আত্মগোপন করিতে চাহিয়াছিল, আসল বস্তুকে সে দেখিতে পায় নাই। তাই যতবার সে রাজলক্ষ্মীর নিকট গিয়াছে অপরের নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা এবং নিরঙ্কুশ মঙ্গলকামনা সত্ত্বেও বারবার তাহাকে ব্যর্থ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে।

আরা হইতে যাহাকে অসুস্থ অবস্থায় লইয়া আসিয়াছিল আপন হাতে সেবাশুশ্রূষা করিয়া যাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিয়াছিল, সেই শ্রীকান্তকে সম্পূর্ণ সুস্থ না হইতেই যেদিন রাজলক্ষ্মী পাটনার বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিল একাজ একা রাজলক্ষ্মীই পারিত না, শ্রীকান্ত

নিজেও এই ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছিল। শ্রীকান্ত কহিয়াছিল, সে তাহার বিগত জীবনের কালি অনেকখানি পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। আজ তাহার চারপাশে ছেলেমেয়েরা মা বলিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রীতি ও ভক্তির আনন্দধাম হইতে তাহাকে অসম্মানিত করিয়া ছিনাইয়া বাহির করিয়া আনিব এত বড় প্রেমের এই সার্থকতা কি অবশেষে আমার জীবন-অধ্যায়েই চিরদিনের মত লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে?

আমরা দেখি রাজলক্ষ্মীও যেমন 'বঙ্কুর মা' হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, শ্রীকান্তও 'বঙ্কুর মা'কে দূর হইতেই নমস্কার করিয়া বিদায় লইয়াছিল। শ্রীকান্তর 'লক্ষ্মী' সেদিন সলজ্জ সঙ্কোচে দূরে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে আসন পাতিবার সাহস তাহার হয় নাই। শ্রীকান্ত ইহাকে বড় প্রেম বলিয়া পাঠ করিয়াছিল। তাহাকে আমরা বলিতে শুনি—বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, ইহা দূরে ঠেলিয়া দেয়। ছোটখাটো প্রেমের সাধ্যও ছিল না এই সুখৈশ্বর্য পরিপূর্ণ স্নেহস্বর্গ হইতে মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য আপনাকে আজ একপাও নড়াইতে পারে।

কিন্তু আমরা জানি ইহা তাহার আত্মবঞ্চনা মাত্র। নরনারীর হৃদয় যেখানে পরস্পর মিলনে একত্র হয় নাই, বিচ্ছেদ সেখানে আসিবেই। রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তর মধ্যে সেদিন পর্যন্ত যে সম্পর্ক আমরা দেখি তাহা সেবার সম্পর্ক ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। একজন সেবা করিয়া ধন্য হইবে, আর একজন সেই সেবা গ্রহণ করিয়া ধন্য করিবে। ইহার মধ্যে পরস্পর হৃদয়ের মিলনের সুযোগ কোথায়? তাই শ্রীকান্তকে একদিন বিদায় নিতেই হইত, রাজলক্ষ্মীর কোন সেবাই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। ইহাই আমরা অনেকবার দেখিয়াছি।

কিন্তু এই বিদায়ের পালা একদিন সমাপ্ত হইল—শ্রীকান্ত যেদিন যথার্থ পথের সন্ধান পাইল, ভালমন্দ লইয়া রাজলক্ষ্মীকে সেই দিনই গ্রহণ করিল। কোন সঙ্কোচ, কোন দ্বিধা আসিয়াই তাহার পথ রোধ করিতে পারিল না। রাজলক্ষ্মী বা পিয়ারী বাইজী কাহারও বিচার না করিয়াই শ্রীকান্ত সেদিন আত্মনিবেদন করিয়াছিল।

মুরারিপুরে বৈষ্ণবের আশ্রমে কমললতার সান্নিধ্যে এই সত্যটাই শ্রীকান্তের মনে প্রথম ধরা পড়িয়াছিল। রাজলক্ষ্মীকে সে কহিয়াছিল আজ মনে হচ্ছে, তোমার আমি যোগ্য নই। রূপে, গুণে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, স্নেহে সৌজন্যে পরিপূর্ণ যে ধন আমি অযাচিত পেয়েছি, সংসারে তার তুলনা নেই, নিজের অযোগ্যতায় লজ্জা পাই, লক্ষ্মী তোমার কাছে সত্যিই আমি বড় কৃতজ্ঞ।

আমরা জানি শ্রীকান্তের হৃদয়ের এই কথা একান্ত সত্য কথা। সমস্ত বিচার, তর্কযুক্তি এখানে আসিয়া হার মানিয়াছিল। তাই মিলনের পথে পিয়ারী বাইজী আর কোন বাধাই সেদিন সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর মিলনে একমাত্র শ্রীকান্ত সে বাধা ছিল তাহা নহে। বড় বাধা ছিল রাজলক্ষ্মী নিজেই। পাটনায় কুমার সাহেবের মোসাহেবী হইতে সে শ্রীকান্তকে টানিয়া আনিয়াছিল তাহার মঙ্গলের জন্যই, ব্যগ্র ব্যাকুল মিনতিতে তাহার শ্মশানযাত্রা নিবারণ করিতে চাহিয়াছিল, তীব্র অভিমানে যখন কহিয়াছিল—যাবে বললেই তোমাকে যেতে দেবো নাকি? কই যাও তো দেখি। এই বিদেশে বিপদ ঘটলে দেখবে কে? ওরা না আমি? আমরা জানি ইহাও রাজলক্ষ্মীর হৃদয়েরই কথা। শ্রীকান্তকে প্রথম দিন হইতেই সে যে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এক মুহূর্তের জন্যও সেখান হইতে সে সরিয়া দাঁড়ায় নাই। তাহার নিজের মঙ্গল অমঙ্গলের কথা ভাবিতে দেয় নাই। তাই শ্রান্তিতে ব্যাকুলতায় শ্রীকান্ত আসিয়া এক একবার তাহার আশ্রয় লইয়াছে, কিন্তু স্নেহের নাগপাশে চারিদিকের স্বাধীন বায়ু যখন উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, শ্রীকান্ত পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়াছে।

পিয়ারীর অন্তরে রাজলক্ষ্মী ছিল, শ্রীকান্তকে একান্তভাবে সে-ই আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকান্ত যেমন পিয়ারীকে গ্রহণ করিতে পারে নাই, পিয়ারীও তেমন আপনার কালিমাময় জীবন লইয়া শ্রীকান্তের নিকট সমর্পণ করিতে পারে নাই। তাই সে প্রথমে চাহিল বঙ্কুর মা মধ্যে আত্মগোপন করিতে। পিয়ারী জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতায়

মধ্যে সে কোন দিনই আপনাকে ডুবাইয়া দেয় নাই। সমস্ত আবিলতার মধ্যে থাকিয়াও আত্মরক্ষা করা ছিল তাহার নিরন্তর চেষ্টা। কিন্তু তবুও পিয়ারীকে কোন দিনই সে আপনার অন্তর হইতে একেবারে দূর করিয়া দেয় নাই, সে চেষ্টাও সে কোনদিন করে নাই। কিন্তু শ্রীকান্তের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই আরম্ভ হইল তাহার কৃচ্ছ্র সাধনার পালা। পরিপূর্ণ সাহায্যের মাঝখানে বসিয়া সে দিনের পর দিন গোপনে নিঃশব্দে আপনাকে বঞ্চিত করিতে লাগিল। সর্বপ্রকার ভোগ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কলুষ ও আবিলতার কেন্দ্র হইতে আপনাকে সরাইয়া লইয়া সে তপস্যার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আমরা দেখি বাইজী জীবনকে রাজলক্ষ্মী কোন দিনই চাহে নাই; কিন্তু সেজন্য সে কোনদিন লজ্জা অনুভবও করে নাই। বরং ইহার মধ্যেই ছিল তাহার অর্থ, প্রভুত্ব, ক্ষমতা ও পরোপকারের অবকাশ। কিন্তু সেদিন তাহার জীবনে শ্রীকান্তের পুনরাবির্ভাব হইল; রাজলক্ষ্মী সত্যই তাহার এই জীবনের জন্য লজ্জিত হইল। তাহার বঙ্কুর মার মধ্যে এই আত্মগোপনের ইহাই কারণ। কিন্তু যে শ্রীকান্তের জন্য সে এই পথ অবলম্বন করিয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহারই সঙ্গে গভীর ব্যবধানের সৃষ্টি হইবে ইহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। বঙ্কুর মা তাহার পিয়ারী জীবনকে মুছিয়া ফেলিতে পারে, আপনাকেও এ পবিত্রতায় মণ্ডিত করিতে পারে কিন্তু শ্রীকান্তের সঙ্গে মিলনে ইহা তাহাকে সার্থকতা আনিয়া দিতে পারিল না। সেই যে কৃচ্ছ্রসাধনার পালা সুরু হইল, ক্রমেই সুর ছাড়াইয়া একেবারে "নাক চুল কাটিয়া সঙ সাজিতেও" সে আর লজ্জা অনুভব করিল না।

শরৎচন্দ্র কহিয়াছেন—সমস্ত রমণীর অন্তরেই নারী বাস ক'রে কিনা জোর করিয়া বলা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। কিন্তু নারীর চরম সার্থকতা যে মাতৃত্বে একথা বোধ করি গলা বড় করিয়া প্রচার করা যায়।

রাজলক্ষ্মীর জীবনে যে এই সার্থকতার সম্ভাবনা নাই, ইহা সে শ্রীকান্তকে দেখিয়াই প্রথমে টের পাইয়াছিল। অধীর জীবনের সমস্ত আক্ষেপ লইয়া তাই তাহার অন্তরের পিয়ারী আপনাকে প্রতি মুহূর্তেই

নিঃশেষ করিতেছিল। সর্বস্ব দিয়া সংসার উপভোগ করিবার উত্তপ্ত আবেগ তাহার মধ্য হইতে লোপ পাইয়াছিল। জীবনের সমস্ত কামনা বাসনা তাহার মধ্যে এমনি ডুব মারিয়াছিল যে তাহাদের বিন্দুমাত্র অস্তিত্বেও সে আপনাকে লজ্জিত অনুভব করিতেছিল। রাজলক্ষ্মীর জীবনের এই দিকটা শ্রীকান্ত ঠিকই দেখিয়াছিল। আজ এই তাহার পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃত্ব সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, সদ্য নিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত তাহার বিরাট ক্ষুধার আহার মিলিবে কোথায়? তাহার নিজের সন্তান থাকিলে যাহা সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিত তাহারই অভাবে সমস্যা এমন জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা জানি এই জটিলতার জন্যই রাজলক্ষ্মী তাহার যথার্থ মঙ্গলের পথ দেখিতে পায় নাই। পরের ছেলেকে ছেলে কল্পনা করিয়া যেমন তাহার বুকের তৃষ্ণা মিটে নাই। সংসারের যত ছেলে আছে সবার সুখ সবার দুঃখকে নিজের সঙ্গে জড়াইয়াও সে শান্তি পায় নাই। ব্যর্থ মাতৃত্বের নিষ্ফল প্রয়াসে সে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছে কিন্তু ইহা তাহাকে শান্তি দিতে পারে নাই। তাই এই মাতৃত্বের আসন হইতে একদিন সে নামিয়া আসিল জপ, তপ, পূজা ধ্যানের মধ্যে। গঙ্গামাটিতে আসিয়া সুনন্দার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। এ জগতের শ্রীকান্তকে ভুলিয়া পরপারের আর এক শ্রীকান্তকে সে চিনাইযা দিল। আর শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর কেউ নয়। এ জগতের সকল সম্বন্ধ মিথ্যা। সুনন্দার বইয়ে পাওয়া কর্তব্যজ্ঞান, যার সঙ্গে সত্যিকার মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ পাপপুণ্য লোভ মোহের কোন সামঞ্জস্য ছিল না তাহাতেই রাজলক্ষ্মী ভুলিল। ইষ্টমন্ত্র ঠাকুর দেবতা জপ তপের মধ্যে সে আপনাকে নিঃশেষে ডুবাইয়া দিল। চুল কাটিয়া, গহনা খুলিয়া রাজলক্ষ্মী একেবারে তপস্যা জুড়িয়া দিল। রাজলক্ষ্মী আত্মপ্রবঞ্চনাকেই জীবনের একমাত্র সম্বল করিয়া লইল।

আমরা দেখি, এই গর্বিতা নারীর প্রখর বুদ্ধিই তাহাকে আসল পথ দেখিতে দেয় নাই। বুদ্ধির গর্ব তাহাকে প্রভুত্বেরই পথ দেখাইয়াছে—

শ্রীকান্তকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু আত্মসমর্পণে প্রিয়তমের মর্যাদা দেয় নাই, তাহাকে স্বাধীনভাবে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিতে দেয় নাই। তাই তাহার সমস্ত জপ, তপ, পুজা ধ্যান নিষ্ফল করিয়া নিয়তি তাহাকে প্রচণ্ড আলোড়নে ক্রমান্বয়েই ঘুরাইয়া মারিতেছিল। তবুও এই পথ যে যথার্থ পথ নয় ইহা একদিনের জন্তও সে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু ইহা বুঝিবার অবকাশ দিয়াছিল পুঁটু। গর্বিতা নারী—প্রত্যক্ষভাবে না হউক পরোক্ষভাবে পুঁটুর নিকট পরাজয় স্বীকার করিল, যদি কখনো অসুখে পড়ো দেখবে কে? পুঁটু? আর আমি ফিরে আসবো তোমার বাড়ীর বাইরে থেকে চাকরের মুখে খবর নিয়ে? তার পরেও বেঁচে থাকতে বলো নাকি?

রাজলক্ষ্মী এতদিন নিজেকে জোর করিয়া বুঝাইতেছিল। শ্রীকান্ত তাহার কেউ নয়। কিন্তু যেদিন সেই শ্রীকান্তকেই পুঁটুর নিকট সমর্পণ করিবার সম্ভাবনা উদয় হইল, তার আশঙ্কায় সে শ্রীকান্তকে কঠোর বন্ধনে বাঁধিতে চাহিল—"ভেবেছো বুঝি হঠাৎ তোমাকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম? কুড়িয়ে তোমাকে পাইনি, পেয়েছিলুম অনেক তপস্যায়, অনেক আরাধনায়। তাই বিদায় দেবার কর্তা তুমি নও, আমাকে ত্যাগ করায় মালিকানা স্বত্বাধিকার তোমার হাতে নাই।" আমারা জানি, দুইদিন আগেও রাজলক্ষ্মী এই কথা কহিতে পারে নাই। বৈঁচিমালা শ্রীকান্তই যে ভুলিয়াছিল তাহা নয়, এ মালা সবচেয়ে বেশী ভুলিয়াছিল রাজলক্ষ্মী নিজে, রাঙা মালার রাঙা রং রাজলক্ষ্মীই চিনিতে পারে নাই। শ্রীকান্তকে রাজলক্ষ্মী লিখিয়াছিল, "তুমি ভাবো গুরুদেব দিয়েছেন আমাকে মুক্তির মন্ত্র, শাস্ত্র দিয়েছে পথের সন্ধান, সুনন্দা দিয়েছে ধর্মের প্রবৃত্তি আর তুমি দিয়েছো শুধু ভার বোঝা। এমনই অন্ধ তোমরা।" কিন্তু এজন্য তাহার নিজের দায়িত্বও যে কম নয়, ইহা তাহার নিজের কথা হইতেই আমরা বুঝি। "আশা ছিল একদিন আমার পাপ ক্ষয় হবে, আমি নিষ্পাপ হবো। এ লোভ কেন জানো? স্বর্গের জন্য নয় সে আমি চাইনে।

আমার কামনা মরণের পরে যেন আবার এসে জন্মাতে পারি। বুঝতে পারো তার মানে কি?"

"ভেবেছিলুম, জলের ধারা গেছে কাদায় ঘুলিয়ে, তাকে নির্মল আমাকে করতেই হবে। কিন্তু আজ তার উৎসই যদি যায় শুকিয়েও থাক না আমার, জপ, তপ, পূজা, অর্চনা। থাকলো সুনন্দা, থাকলো গুরুদেব" আমরা জানি এই মনোভাবই তাহাকে একদিন সত্যের সন্ধান দিয়াছিল। পত্র লিখিয়াই সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। শ্রীকান্তকে লইবার জন্য আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এবারে সে নূতন চোখে শ্রীকান্তকে দেখিতে পাইল—"ও যে এত সুন্দর এর আগে কেন চোখে পড়েনি? এতদিন কানা হ'য়ে ছিলুম কি? ভাবলুম এ যদি পাপ তবে পুণ্যে আমার কাজ নেই। এ যদি অধর্ম তবে থাকলো আমার ধর্মচর্চা। জীবনে এই যদি মিথ্যা হয় তবে জ্ঞান না হতে বরণ করেছিলুম এঁকে কার কথায়?"

রাজলক্ষ্মী নিজেই সেদিন বলিয়াছে, শ্রীকান্তকে বিদায় দিয়া তাহার চোখের জল আর কিছুতেই থামে নাই। তাহার ইষ্টমন্ত্র ভুল হইয়া গিয়াছিল; ঠাকুর দেবতা অন্তর্ধান করিয়াছিল। তারপরে একদিন আবার সে শ্রীকান্তকে পাইল—"বাড়ী এসে আহ্নিকে বসলুম, দেখতে পেলুম তুমি কেবল একাই ফিরে আসোনি, সঙ্গে ফিরে এসেছে আমার পূজার মন্ত্র। এসেছেন আমার ইষ্ট দেবতা, গুরুদেব—এসেছে আমার শ্রাবণের মেঘ। আজও চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো কিন্তু সে আমার রক্ত নেঙরানো অশ্রু নয়, আমার আনন্দের উপচে ওঠা ঝরণার ধারা—আমার সকল দিক ভিজিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে বয়ে গেল।"

আমরা দেখি,—রাজলক্ষ্মী তাহার জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইল। ইহার পর কমললতার নিকট যেদিন শিক্ষা করিল, কেবলমাত্র বাছা ফুলে প্রিয় পূজা চলে না, রাজলক্ষ্মী পরিপূর্ণভাবেই শ্রীকান্তের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। অকুণ্ঠিতচিত্তে সে পিয়ারী বাইজীকেও সেদিন তাহার প্রিয়তমের নিকটই নিবেদন করিল। মুহূর্ত মধ্যে তাহার সমস্ত গ্লানি, সমস্ত বেদনা দূর হইল, রাজলক্ষ্মী বাঁচিল।